পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতা ৺রামময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পবিত্র নামে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি-পূর্ণ-হৃদয়ে
উৎসর্গ করা হইল।

উৎসর্গ পত্র।

পিতাধর্ম্ম পিতাস্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

—:০:—

পিতৃদেব!

আপনার ঋণ সহস্রাংশের এক অংশ ইহজীবনে শুধিতে পারিব না। ইহজীবনে কেন? কোটি কোটী জন্মেও আপনার ঋণমুক্ত হইতে পারিব কি? আজ আপনি দ্যুনিবাসী। আর আপনার এই অধম সন্তান নশ্বর জগতে অবস্থান করিয়া সংসার-সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইতেছে। কিন্তু দেব, যখন রোগ, শোক, অভাবে কাতর হইয়া আপনার এই অধম সন্তান অপনার অপার স্নেহের কথা স্মরণ কর্ব্বে, তখনই হৃদয় আনন্দ আবেগে অধীর হইয়া উঠে। এই জ্বালাময় পৃথিবীর বুকে আবার শান্তিলাভ করে। জানি না দেব! আপনি স্বর্গধামে দেবাসনে বসিয়াও অধম সন্তানকে ভুলিতে পারিয়াছেন কি না!

উৎসর্গ-পত্র।

মনে হয় পিতা জগতে যে পিতৃহারা, তাহার বুঝি সান্ত্বনার আর কিছুই নাই! মনে হয় পিতৃদেব! জগতে যে পিতৃস্নেহ হারাইয়াছে তাহার বুঝি সুখ শান্তি এই মর জগতে আর মিলিবে না!

পিতা! মনে পড়ে সেই বাল্যকালের কথা! যখন প্রবল জ্বরে শয্যাগত হইতাম, আপনি দেবগৃহে পূজা করিয়া শুষ্ক জিহ্বায় চরণামৃত দিয়া—সচন্দন তুলসী গন্ধ পরিপূরিত দেবহস্ত অধমের মস্তকে অর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। সর্ব্বদা মনে হয় সেই নিষ্পলক নেত্রে, নিরাহারে, আমার শিয়রে বসিয়া বিনিদ্র অবস্থায় সমস্ত রাত্রি যাপন। দেব জগতে অনেক দেখিলাম কিন্তু, এই পিতৃস্নেহের সঙ্গে কিছুরই তুলনা করিতে পারিলাম না! বুঝি স্বর্গ ব্যতীত পার্থিবজগতে কিছুরই সহিত অপার পিতৃস্নেহের তুলনা হয় না। দেব! কোথায় তুমি আজ? প্রাণে সেই স্বর্গীয় নিঃস্বার্থ স্নেহ ও অকপট ভালবাসা;—যাহা আজ কল্পনাতেও হৃদয়ে স্বর্গের মন্দাকিনীধারা বহাইয়া দিতেছে। জানি না দেব! আজ আপনাকে সম্মুখে পাইলে কি করিতাম! একবার সেই মহিমাময় দিব্য কান্তি দেবদেহ লইয়া সম্মুখে দাঁড়াও পিতা! আপনাকে কোটী কোটী নমস্কার করি! দাঁড়াও পিতা একবার—আপনার চরণ-ধূলা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া সংসার-সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত দেহ শীতল করি!

উৎসর্গ-পত্র।

তখন জানিতাম না—বুঝিতাম না পিতা! যে এত স্নেহ—এত করুণা—এত দয়া এই অধম সন্তানের জন্য আপনার হৃদয়ে সঞ্চিত রহিয়াছে! শৈশবে বাল্য-বুদ্ধিতে জানিতাম না, বুঝিতাম না, ভাবিতাম না—তাই পিতঃ তখন আপনার শ্রীপাদপদ্ম দিবস রজনী পূজা করি নাই। সেই অনুতাপে পিতা আজ হৃদয় দগ্ধ হইতেছে! দগ্ধ হৃদয়ে আজ যদি আপনার পবিত্র চরণ দুখানি হৃদয়ে চাপিয়া ধরিতে পারিতাম, তবে বুঝি এত যন্ত্রণা অনুভব করিতাম না।

পিতঃ! আজ এই যে সংসার-সংগ্রামে যুদ্ধ করিতেছি সে কেবল তোমারই অসীম করুণা বলে! আজ এই যে লেখনী ধরিয়া মনের আবেগ—দুঃখ প্রকাশ করিতেছি সে কেবলই তোমার স্নেহ গুণে! তোমার স্নেহ, তোমার করুণা, তোমার ভালবাসা এখনও আমাকে সংসারে জীবিত রাখিয়াছে। পিতা! তোমার প্রদত্ত শিক্ষা, দীক্ষা ও জ্ঞান ধর্ম্মে আমাকে এই ভীষণ সংগ্রামে সতত রক্ষা করিতেছে। পিতৃদেব! তোমার আত্মজকে সংসার-সংগ্রামে রক্ষা করিবার জন্য তোমার সেই আকুল চেষ্টা, ঐকান্তিক ইচ্ছা—অমূল্য উপদেশ—জ্ঞানগর্ভ শিক্ষা দীক্ষার সুযোগ প্রদান সর্ব্বক্ষণ স্মৃতি পথে জাগরুক রহিয়াছে—এখন ঐ স্মৃতিই আমার জীবন—উহা ভুলিলে আমারও জীবন শেষ হইবে।

উৎসর্গ-পত্র।

পিতৃদেব! সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ যে কত গভীর এবং এই স্নেহ মন্দাকিনী কত গভীরতম প্রদেশে সঞ্চিত থাকে তাহা তোমার পৌত্র "মণির" * জন্মগ্রহণ হইতে কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি! তাই পিতা! 'মণির জন্মগ্রহণ হইতে আপনার জন্য আমার প্রাণ অধিকতর ব্যাকুল হইতেছে। কবে স্বর্গরাজ্যে আপনার চরণতলে বসিয়া সংসার দাব-দগ্ধবক্ষপঞ্জরগুলি আপনাকে দেখাইব দেব?

পিতৃদেব! ইহজীবনে বড়ই দুঃখ ও ব্যথা হৃদয়ে থাকিল! এ দুঃখ শ্মশান অগ্নির সহিত নির্ব্বাণ হইবে কি না—জানি না। আমার এই প্রাণের দুঃখ—হৃদয়ের যন্ত্রণা জানি না দেব, আপনি স্বর্গধাম হইতে দেখিতেছেন কি না! যদি দেব আত্মজের দুঃখ যন্ত্রণা স্বর্গধামে থাকিয়া হৃদয়ঙ্গম হওয়া সম্ভব হয় তবে বলুন পিতা কি করিলে আমার হৃদয়ের এই দারুণ দাবানল নির্ব্বাপিত হইবে? আমার প্রাণের দুঃখাগ্নি এই জন্য অহরহঃ জ্বলিতেছে, যে, প্রাণ ভরিয়া আপনার চরণ সেবা করিতে পারি নাই। ভীষণ হৃদয় যন্ত্রণায় এইজন্য অহরহঃ দগ্ধ হইতেছি—যে আত্মজের উপার্জ্জিত অর্থে পিতৃদেবের চরণে অর্ঘ্য-প্রদান

* এই শিশু পুত্রটি গ্রন্থকারকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অকালে পরলোকাশ্রয় করিয়াছে।

উৎসর্গ-পত্র।

করিতে পারি নাই। পিতৃদেব! আপনার দয়া, স্নেহ, করুণা স্মরণ করিয়া তাপিত প্রাণে পবিত্র ভক্তিভরে এই জীবন-সংগ্রাম" খানি আপনার চরণে উৎসর্গ করিতেছি! এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র পুষ্পাঞ্জলি চরণে স্থান দিয়া সন্তানকে কৃতকৃতার্থ করুন ও তাহার ক্ষুদ্র উপহারকে পবিত্র ও পুন্যময় করিয়া দিন।

চিরদিনের আশা পিতা! যে আপনার পবিত্র নামে এমন স্থানে এক স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিব—যে স্থান পবিত্র বেদগানে ও ওঁকার ধ্বনিতে মুখরিত হইবে! আপনার পবিত্র নামে দীনদুঃখী ও অসহায় সকলে আশ্রয় পাইবে—যথায় ধর্ম্মহারা ভ্রান্ত জীব ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া মুক্তি-পথের পথিক হইবে। আশীর্ব্বাদ কর দেব, যেন আপনার পবিত্রনামে ইহজীবনে এই সাধনা পূর্ণ করিয়া আপনার আত্মার তৃপ্তি করিতে পারি। যথায় আপনি ত্রিসন্ধ্যা দেবপূজা ও ভগবৎ আরাধনা করিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিয়াছেন—আমরা সেই প্রিয় জন্মভূমিতে যেন আপনার পবিত্রস্মৃতি রাখিয়া পার্থিব জগৎ হইতে বিদায় লইতে পারি! আপনার আশীর্ব্বাদে আমার যেন এই মহৎ ব্রত সুসম্পন্ন হয়।

এই ক্ষুদ্র "জীবন—সংগ্রামের" বিক্রোত অর্থ আপনার পবিত্র স্মৃতির জন্য ভক্তিভরে পদসেবায় অর্পণ করিলাম।

উৎসর্গ-পত্র।

এই পুস্তকের যাবতীয় আয় আপনার পবিত্র নামে দান সেবায় ব্যয়িত হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য—পাঠক যদি এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া ইহার সত্যতা ও উপকারিতা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন—যদি এই পুস্তক পাঠে গভীরচিন্তা দ্বারা জীবনের কর্ত্তব্যপথে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সংসার—সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারেন--যদি এই পুস্তকখানি এক জনেরও জীবন—সংগ্রামের পথে সহায়তা করিতে পারে—যদি এই পুস্তক পাঠে একজনও পরোপকারের মহাপুণ্যসঞ্চয় করিতে পারেন—তবে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

গ্রন্থকার।

"মানব চিত্র" প্রণেতা

শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জীবন-সংগ্রাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ।

ভগবানের ইচ্ছায় ও তাঁহার আদেশে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল সঙ্গে লইয়া আমরা এই ভগবানের রাজ্যে আসিয়াছি। এই সংসার আমাদের কর্ম্ম-ক্ষেত্র,—সংগ্রাম-স্থল। মানব-দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-কৌশল যাঁহারা স্থিরচিত্তে অভিনিবেশ সহকারে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা গঠনকর্ত্তার আশ্চর্য্য কৌশলে মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মানব-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি ও যন্ত্রাদির ক্রিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য ও মোহিত হইতে হয়! মানবের সুক্ষ্মবুদ্ধি এই আশ্চর্য্য কৌশলের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। ধন্য সেই সর্ব্বশক্তিমানের আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ-শক্তি! ভগবানের গঠিত এই মানব-দেহের ভিতর অবিরাম যুদ্ধ চলিতেছে। অল্পবুদ্ধি মানব যেরূপ

অত্যাচারপরায়ণ,—মানব যেরূপ পদে পদে ভগবানের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে অগ্রসর,—আহারে বিহারে শয়নে মানব যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেয়—পশুরাজ্যেও এরূপ অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হয় না। সর্ব্বনিয়ন্তার অপার সৃষ্টি-নৈপুণ্যে তাঁহার গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সর্ব্বদাই সুস্থ থাকিতে চায়। এই জন্য অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলি প্রকৃতিস্থ থাকিতে অহরহঃ রোগাদির সহিত যুদ্ধ করিতেছে। মানবের অনিয়ম ও অত্যাচারবশে করাল ব্যাধি দেহ আক্রমণ করিতে যাইতেছে—অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলি প্রকৃতি-বশে উহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে—কিছুতেই দেহকে আক্রমণ করিতে দিবে না—এই ভীষণ সংগ্রাম অবিরাম চলিতেছে।

ভগবানের সৃজিত মানব-দেহের যন্ত্রগুলির প্রতি স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া দেখুন, তাহাদের ক্রিয়া সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করুন বুঝিতে পারিবেন, মানবের ভিতরে বাহিরে কি ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে। ভগবানের ইচ্ছা ইহাতেই স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, কেবল কার্য্য করিবার জন্যই মানব সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সংসার আমাদের কর্ম্মস্থল এবং জগৎ আমাদের সংগ্রামস্থল ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাঁহারা এই সংসার-ক্ষেত্রে বাধা-বিঘ্ন অতি-ক্রম করিয়া দৃঢ়চিত্তে সংগ্রাম করিতে পারেন, তাঁহারাই

জয়ী হইয়া সংসারে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যান;—আর যাঁহারা ভীরুর ন্যায় বাধা বিঘ্নে ম্রিয়মান হইয়া পড়েন, তাঁহারা জগতে কর্ত্তব্য কার্য্য কিছুই করিতে পারেন না। নিত্য এই বিশাল জগতে কত লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে—দুইদিন পরে আবার বৃষ্টি সম্পাতোদ্ভূত জল-বিম্বের ন্যায় কালের অনন্ত স্রোতে মিশিয়া যাইতেছে; কিন্তু কয়জন লোক তাহাদের কর্ত্তব্যকার্য্যের চিহ্ন জগতে রাখিয়া যাইতে পারে? লক্ষ লক্ষ মানবের মধ্যে একজনও তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের চিহ্নস্বরূপ একটী রেখাও জগৎ-পৃষ্ঠে টানিয়া যাইতে পারে না। এই সমস্ত কর্ম্মহীন ব্যক্তি নীরবে জগতে জন্মগ্রহণ করে, আবার নীরবেই কোথায় ভাসিয়া যায়। ইহাদের আগমনে বা প্রত্যাগমনে জগতের ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। কি ধর্ম্ম-রাজ্যে—কি সংসার-রাজ্যে এই সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে বার বার এই কথাই বলিতে পারা যায়।

কেন এমন হয়? মানব-জীবন এতই মূল্যবান যে, ইহার সঙ্গে তুলনা করিবার জগতে কিছুই নাই। এরূপ অমূল্য জীবনের সদ্ব্যবহার করিতে লোক এত উদাসীন কেন? জীবনের মুহূর্ত্তগুলি বৃথাকার্য্যে ক্ষয় হইতেছে—আর মানব নিশ্চিন্তমনে নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছে! এই বহু-মূল্য সময়ের জন্য মানবের চিন্তা নাই,—উদ্বেগ নাই—

নিশ্চল উদ্বেগশূন্য হৃদয়ে বিলাস স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। এরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতে মানব যদি কুণ্ঠিত হইত, তাহা হইলে এই সংসার স্বর্গে পরিণত হইত তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। রোগ, শোক, দুঃখ ও দারিদ্র্য, হাহাকার ও রোদনধ্বনির এত বাহুল্য সংসারে দেখা যাইত না।

সাধারণ মানবের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, "জীবনের কয়টা দিন এইরূপে কাটিয়া গেলেই হয়।" কেহ বলেন, "এই ভারবহ দুঃখপূর্ণ জীবন না থাকিলেই বাঁচি।" অনেক ভীরুব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, "চির-জীবন দুঃখে কাটাইলাম, কখন সুখের মুখ দেখিতে পাইলাম না—জীবনটা শীঘ্র গেলেই নিষ্কৃতি পাই।" অধুনা অনেক কর্ম্মভীরু আলস্যের উপাসক যুবক বলিয়া থাকেন, "আমাদের উন্নতি ইহার অধিক আর কিছু হইবে না, এক মুঠা খাইয়া পরিয়া কোন রকমে কাটিয়া গেলেই হয়।" এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত। অধিকাংশ ব্যক্তিই যে এইরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাব লইয়া সংসারে উন্নতির প্রয়াসী, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যে সমস্ত কর্ম্মভীরু ব্যক্তি এইরূপ মত লইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের দ্বারা জগতের বা সংসারের কিরূপ উন্নতি হইবে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

জীবন খেলার জিনিষ নহে কিম্বা সুকোমল কুসুমাচ্ছাদিত বিলাস-শয্যায় নিদ্রা যাইবার জন্য ইহার সৃষ্টি হয় নাই; সংসার সংগ্রামে যুদ্ধ করিয়া আত্ম-বিসর্জ্জন ও নিঃস্বার্থ পরহিত ব্রতে জীবন ভাসাইবার জন্যই বিশ্বনিয়ন্তার এই অভিনব সৃষ্টি—মনুষ্য-জন্ম। যদি পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া বিলাস-স্রোতে ভাসিবার জন্য জীবনের সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে মানব-দেহে এরূপ সুন্দর ও সুদৃঢ় যন্ত্রগুলি অকারণ স্থান পাইত না।

অনেক লোক আবার অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিজ নিজ কাপুরুষতা ও কর্ম্মহীনতার অপবাদ ঢাকিবার চেষ্টা করে। ইহারা পরিশ্রমে কাতর, সঙ্কীর্ণ-হৃদয়, নানা অনিয়ম ও অত্যাচারে শক্তিহীন, দুর্ব্বলচিত্ত, সুতরাং কঠিন কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই সফলতার আশা ত্যাগ করে। এই শ্রেণীর ব্যক্তির মুখে বারবার অদৃষ্টের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অদৃষ্ট তাহাদের দৃষ্টির অগোচর, তত্রাচ তাহাতেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ভীরু নিষ্কর্ম্মা হইয়া জগতের দুঃখ ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিবে কিন্তু কর্ম্মের সমষ্টিই যে অদৃষ্ট—স্ব স্ব কৃত কার্য্যেই যে অদৃষ্টের উৎপত্তি য়—একথা তাহারা বিশ্বাস করিবে না। অদৃষ্টে কি ছে ইহা তাহারা দেখিতে পায় না কিন্তু কর্ম্মের সু বা কুফল তাহারা সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পায় ও বুঝিতে

পারে—তত্রাচ কর্ম্মস্রোতে গা না ভাসাইয়া—অদৃষ্ট-কূপ-পঙ্কে ডুবিয়া মরে।

অধুনা বঙ্গবাসীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় বঙ্গ-ভূমির দুরবস্থা দেখিয়া, বালক, বৃদ্ধ যুবা সকলেই দুঃখ করিতেছেন। এই আক্ষেপ স্বাভাবিক কিন্তু কেবল মুখে দুঃখের কথা কহিলে স্বদেশের দুঃখ নিবারণ হয় না। ভারত যে বিরাট ইংরাজ জাতির শাসনাধীন—সেই জাতির উৎসাহ, উদ্যম, সাহস ও কর্ম্মশক্তির প্রতি সকলেরই লক্ষ্য রাখিয়া কর্ত্তব্য পথে দৃঢ়তার সহিত দ্রুত অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালী এখন সংসার-সংগ্রামে পদে পদে পরাস্ত হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অভাব-রাক্ষসী চিরস্থায়ী আসন পাতিয়া বসিয়াছে;—কর্ম্ম-শক্তি ম্রিয়মান হইয়াছে। লক্ষ্মী ছাড়া হইলে যতকিছু উপসর্গ হয়, বাঙ্গালীর সকলগুলিই আসিয়াছে। বাঙ্গালায় প্রায় সর্ব্বত্রই এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, ঘরে তাহাদের দৈন্যদশা, স্ত্রী পুত্র আত্মীয় পরিজন কষ্টে কাল-যাপন করিতেছে—কিন্তু তাহারা কঠোর জীবন-সংগ্রামে প্রস্তুত না হইয়া—তাস, পাশা, গল্প ও বৃথা আমোদে জীবনের মূল্যবান মুহূর্ত্তগুলি অকাতরে ব্যয় করিতেছে। যদি জগতের কর্ত্তব্য কর্ম্মের জন্য এই মূল্যবান সময় ব্যয়

করিতে দৃঢ়তার সহিত জীবন-সংগ্রামে লাগিয়া যাইত—তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা দেশ, সমাজ ও আত্মীয়-পরিজন উপকৃত হইত। কর্ম্ম-শক্তির লোপ ও দেশে ভীষণ বিলাসিতা-স্রোত প্রবাহিত হওয়াতেই কেরানী ও চাকুরীজীবীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে। বঙ্গদেশবাসী যুবকগণ লেখা-পড়া শিখিয়া কেবল চাকুরীর জন্য উমেদারী করিয়া বেড়ায়। তবে সুখের বিষয় এই যে, অধুনা অনেকের ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য জীবন-সংগ্রামে জয় লাভ করা; এই চাকুরীপ্রিয় জাতি তাহা বুঝেন না অথবা বুঝিলেও সংক্রামতা পীড়া তাহাদিগকে তদ্রূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেয় না। চাকুরী করিতে হইবে, দাসত্ব করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে, এইজন্যই তাহারা বাল্যকাল হইতে মন দিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করে এবং চাকুরী করিয়া বিলাসিতা-স্রোতে ভাসিতে হইবে—গাড়ী-ঘোড়ায় চড়িয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে, এই জন্যই তাহাদের পিতা-মাতা, অভিভাবকগণ বিদ্যা শিক্ষা করাই-বার জন্য যত্ন প্রকাশ করেন। যদি বাঙ্গালীর কর্ম্মশক্তির লোপ না হইত, যদি জীবন-সংগ্রামে দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিতে ভয় না পাইত—তবে বঙ্গসন্তানগণ এরূপ চাকুরির জন্য লালায়িত হইত না! অধুনা অধিকাংশ যুবকবৃন্দ

১০টার পর সবুট চরণ চালাইয়া ইংরাজী বুটের আশ্রয়ে হেঁটমুণ্ডে সমস্ত দিন বসিয়া কলম চালাইয়া যথাসময়ে অবসন্ন শরীরে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। তার পর হয় বৃথা আমোদে সময় অতিবাহিত করেন, না হয় নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। উচ্চ চিন্তা নাই, উদ্যোগ নাই, পরিশ্রম নাই, উন্নত জাতির ন্যায় উন্নতি শিখরে উঠিবার আকাঙ্ক্ষা নাই। আছে কেবল পরাধীন চাকরীতে ঐকান্তিক স্পৃহা, মাসিক বেতনে অতিকষ্টে দুইবেলা দুইমুঠা অন্নের সংস্থান করা, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, অম্বল ইত্যাদি ব্যাধি, অযথা অভিযোগ এবং অবশেষ নিরাশ্রয় নিঃসম্বল অবস্থায় পুত্র-কলত্রকে ভাসাইয়া অকালে পরলোকে গমন! পরিশ্রমের লাঘবত্ব এবং বিনা কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য বাঙ্গালী চাকুরী ভালবাসে। হায় বঙ্গবাসী! আমরা কি এই জন্যই প্রাতঃস্মরণীয় কর্ম্মবীরগণের দেশ এই স্বর্ণ-প্রসবিনী ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? আমাদের কি আহার বিহার, সন্তান পালন, রোগ ভোগ, অবশেষে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন উচ্চ কর্ত্তব্য নাই? একবার ভাবিয়া দেখ আমাদের ভারতভূমির পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মবীরগণের কীর্ত্তি-কাহিনী। আমরা কি তাঁহাদেরবংশধর নহি? হেলায় জীবন অতিবাহিত করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই কি এই

ধর্ম্মের দেশ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? আমাদের চক্ষের সম্মুখে স্তূপাকার কর্ম্মরাশি পড়িয়া রহিয়াছে; সংসারের স্তরে স্তরে কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সাজান আছে, যে দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি জীবন-সংগ্রামে ভয় না পায়, সেই কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিবার জন্য কর্ম্মরাশিকে আহ্লাদের সহিত আলিঙ্গন করে। সেই মহান্ হৃদয় ব্যক্তি বিনা বাধাবিঘ্নে—স্তূপাকার কর্ম্মরাশি দৃঢ়হস্তে একটির পর একটি ধরিয়া হেলায় সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

ভগবান মনুষ্যের কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি প্রত্যেকের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হয়, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্ম-রাজ্যের বীর পুরুষ। ভারত আমাদের ধর্ম্মের দেশ, ধর্ম্ম ব্যতীত আমাদের এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। আমরা যাঁহাদের সন্তান, সেই পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মাগণের কথা সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখিতে হইবে, নচেৎ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষাও পতন অবশ্যম্ভাবী! আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, আমরা সেই ধর্ম্মরাজ্যে অধুনা অধর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছি। অধুনা আমরা স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া আত্মসুখেই সুখী—কিন্তু একবার ভাবিবার অবসর পাই না যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের হৃদয় কত উচ্চ ও মহান্ ছিল

তাঁহারা জগতের নরনারীর জন্য আজীবন খাটিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন। সামান্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গও তাঁহাদের স্নেহ ও দয়া হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

মানুষ কি না করিতে পারে? ভগবান মানব-হৃদয়ে অসংখ্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন। আমরা সেই সমস্ত শক্তি আলস্য ও ঔদাস্য-বশে ব্যবহার করিতেছি না পক্ষান্তে ভগবান-প্রদত্ত মানব-শক্তির অপব্যবহার করিতেছি! আমরা যে মানব ইহা পরিচয় দিতেও যেন লজ্জা বোধ হয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আজানুলম্বিত সবল-বাহু, সুদীর্ঘ ও প্রশান্ত দেহ এবং অটুট স্বাস্থ্য লইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ জগতের কতই না উপকার করিয়াছিলেন? আর তাঁহাদেরই বংশধর আমরা আজ কি অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, ইহা কি ভাবিবার বিষয় নহে? যাঁহাদের চিন্তাশক্তি ও জ্ঞান লইয়া আজও জগতে আমরা আর্য্যজাতি বলিয়া পরিচয় এবং আর্য্যবংশধর বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করি, তাঁহাদের বংশগৌরব রক্ষা করিবার জন্য কতটুকু চেষ্টা উদ্যম ও ত্যাগ স্বীকার করা কর্ত্তব্য তাহা কি ভাবিয়া দেখিতেছি? তাঁহাদের যাহা ছিল আমাদের তাহা কিছুই নাই। নাই বলিয়াই আমরা দীনহীন কাঙ্গাল—রোগ শোকে জর্জ্জরিত। দৈন্য, অভাব, দুর্ব্বলতা আমাদের চির সহচর। কোথায়

আমাদের সেই ব্রহ্মচর্য্য? কোথায় আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষগণের সংযম ব্রত? কোথায় আমাদের সেই প্রথম জীবনে গুরুগৃহে বাস করিয়া সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার প্রয়াস? কোথায় আমাদের সেই বাল্যের চরিত্র গঠন? কোথায় আমাদের সেই অমূল্য বিদ্যা শিক্ষা—যে বিদ্যায় জগতকে আপনার করিতে শিক্ষা দিত—যে বিদ্যাপ্রভাবে জ্ঞানধর্ম্ম শিক্ষা দিত—যে বিদ্যায় ঐহিক পারত্রিকের মঙ্গল হইত, যে বিদ্যাশিক্ষায় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য হৃদয় মন উত্তেজিত হইত—যে বিদ্যায় দুঃখ যন্ত্রণা সহিবার জন্য হৃদয় সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত—যে বিদ্যার প্রভাবে বিলাসবাসনা দূরে পলাইত—যে বিদ্যার মহিমায় নিঃস্বার্থ পরোপকার-প্রবৃত্তি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইত—যে বিদ্যাগুণে স্বার্থ সুখের জন্য পরপীড়ন করিতে ভয় হইত—যে বিদ্যায় সুখ দুঃখ জ্ঞান না করিয়া কর্ত্তব্য বোধে কার্য্য করিবার জন্য সদা সর্ব্বক্ষণ আর্য্যসন্তানগণ প্রস্তুত থাকিত—যে বিদ্যায় সংসার-আশ্রম শান্তিকুঞ্জে পরিণত হইত—যে পবিত্র বিদ্যায় স্ত্রীকে ভোগবিলাসের সামগ্রী বা শয্যাসঙ্গিনী মনে না করিয়া ধর্ম্মকার্য্যের সঙ্গিনী বলিয়া গ্রহণ করিত—যে বিদ্যায় ধর্ম্ম উপার্জ্জনই মানব একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া জানিত—যে বিদ্যায় মানব বুঝিত, আমরা ভগবান্-প্রেরিত শ্রেষ্ঠ জীব, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে

আসিয়াছি! যে বিদ্যা প্রভাবে তাহারা অসত্যকে হৃদয়ে স্থান দিত না, হিংসা দ্বেষ প্রতারণা মিথ্যাভাষণ কপটতাকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিত—যে বিদ্যায় তাহারা একমাত্র ভগবানের প্রতি ভক্তি রাখিয়া তাঁহারই আজ্ঞা বোধে ফলাফলের প্রতি দৃকপাত না করিয়া কর্ত্তব্যবোধেই কার্য্য করিয়া যাইত;—হায়! কোথায় আজ সেই বিদ্যা? কোথায় আজ সেই সহিষ্ণুতা? কোথায় আজ হিন্দুর সেই জ্ঞান গৌরব? কোথায় আজ হিন্দুর হিন্দুত্ব? কোথায় আজ হিন্দুর শাস্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাস?

বড়ই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! হিন্দু-সন্তান তাহাদের পিতৃ-পিতামহের কার্য্যকলাপ ভুলিয়া অল্প বয়স হইতেই বিলাসিতা স্রোতে গা ভাসাইতেছে—অল্প বয়স হইতেই নানারূপ গর্হিত অত্যাচারে স্বাস্থ্যসুখ বিসর্জ্জন দিয়া ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে! হিন্দুসন্তানগণ আর অবনতির পথে অগ্রসর হইও না। একবার পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া চাও। তোমাদের সেই পিতৃ-পিতামহগণের সংসার আশ্রম—শান্তিকাননে প্রবেশ কর। স্থিরচিত্তে শ্রবণ করিলে এখনও শুনিতে পাইবে, তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের নাম গানের প্রতিধ্বনি! স্থিরচক্ষে দেখিলে এখনও তাঁহাদের পদাঙ্ক ভারতভূমে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে। তাঁহাদের পদধূলি মস্তকে

লইয়া এই ধর্ম্মের দেশ ভারতবর্ষে ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। ভীরুর ন্যায় জীবন-সংগ্রামে দুঃখরাশিকে আলিঙ্গন করিতে ভয় পাইও না—কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে পদে পদে বাধা বিঘ্ন দেখিয়া আর্য্যসন্তান হইয়া কাপুরুষের ন্যায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িও না। অগ্রসর হও—দৃঢ়তার সহিত বাধাবিঘ্ন পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া জগতের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন কর। যখনই আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃস্তন্য মুখে লইয়াছি, তখন হইতেই অগণিত কর্ত্তব্যরাশি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে;—তখন হইতেই আমরা জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই সংগ্রামস্থলে আমাদের বিশ্রামের স্থান নাই। সুখকারজনক বিলাসিতার ক্রোড়ে শয়ন করিবার অবসর নাই। যাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যাঁহার স্নেহ-দুগ্ধ পান করিয়া মানুষ হইয়াছি, সেই পরমারাধ্যা জননীর প্রতি কর্ত্তব্য, তাঁহার অপরিশোধনীয় ঋণের—অতুল্য স্নেহের ও উপকারের কথঞ্চিৎ মাত্রও পরিশোধার্থে প্রাণপণ চেষ্টা;—যিনি ধর্ম্ম, স্বর্গ ও দেবতা হইতেও বড়, সেই স্নেহময় প্রেমময় পিতার প্রতি কর্ত্তব্য, পিতা সদৃশ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্য—আত্মীয় বন্ধু ও প্রতিবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য, দীনদুঃখী নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় ব্যক্তির প্রতি কর্ত্তব্য—যিনি ধর্ম্মের সঙ্গিনী, সেই

অর্দ্ধাঙ্গিনীর প্রতি কর্ত্তব্য,—অভাবগ্রস্থ ব্যক্তির অভাব-মোচনের কর্ত্তব্য, রুগ্ন ও আতুর ব্যক্তির প্রতি কর্ত্তব্য, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য, এবং সর্ব্বোপরি স্বদেশ ও জন্মভূমির প্রতি কর্ত্তব্য প্রভৃতি অসংখ্য কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। জীবনের এই সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া তোমাকে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইবে। জীবনের এক মুহূর্ত্তও বৃথা ব্যয় করিবার তোমার অধিকার নাই! আরও পবিত্র, আরও মহান্ কর্ত্তব্য তোমার মস্তকোপরি রহিয়াছে! যাঁহার দয়ায় আমরা এই জগতে বাস করিতেছি, যাঁহার সৃজিত এই আকাশ, জল, বায়ু, তড়াগ, সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা,—যাঁহার করুণায় আমরা নিশ্বাসে পবিত্র বায়ু, পিপাসায় স্বচ্ছ জল, ক্ষুধায় অন্ন ও ফল পাইয়া জীবিত আছি, তাঁহাকে অহরহঃ স্মরণ মনন ও ধ্যান আমাদের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যই সেই পরমব্রহ্মে মিলিত হওয়া। তিনি দয়াময়, জীবের জীবন দাতা ও রক্ষাকর্ত্তা—তাঁহার দয়া ব্যতীত আমাদের আত্মার উন্নতির আর দ্বিতীয় উপায় নাই। করযোড়ে ভক্তিভরে ব্যাকুলপ্রাণে আমাদের আত্মার উন্নতির জন্য তাঁহার কাছে প্রার্থনা জানাইলে তিনি ভক্তের উন্নতির সুপন্থা দেখাইয়া দিবেন। গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন,—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

যাহাতে আমরা জীবন সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারি, যাহাতে আমরা জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, যাহাতে আমাদের আত্মার উন্নতি হয়, যাহাতে আমরা ভগবানের নির্দ্দিষ্ট পথে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গমন করিতে পারি, ভগবানের নিকট সর্ব্বক্ষণ এইজন্য আকুল প্রাণে প্রার্থনা জানাইতে হইবে।

কি করিলে সংসার-সংগ্রামে জয় লাভ হয়, কি করিলে ধর্ম্ম-রাজ্যের মহিমা হৃদয়ঙ্গম হয়, কিরূপে আত্মার উন্নতি হয়, আমরা এইবার সংসার-সংগ্রামে তাহাই দেখাইব।

আমরা সংসার-সংগ্রামে যে চিত্র অঙ্কিত করিতেছি, ইহা অতিরঞ্জিত বা উপন্যাস নহে—সত্য ঘটনায় পূর্ণ! পাঠক পাঠিকাগণ যদি স্থিরচিত্তে জীবন-সংগ্রামের জাজ্বল্যমান সত্য ঘটনামূলক কাহিনী পাঠ করিয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্মময় জীবনে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারেন, তবে আমাদের পরিশ্রম ও আশা সফল হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণমোহন।

হুগলি জেলার অন্তর্গত একখানি গ্রাম। এই গ্রামখানির নাম একশত বৎসরের পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। গ্রামখানির প্রকৃত নাম যাহাই হউক, আমরা উহাকে সারাবাটী বলিয়া উল্লেখ করিব। কালের স্রোতে গ্রামখানির দৃষ্ট-পদার্থগুলির অধিকাংশই ভাসিয়া গিয়াছে। এখন যাহা আছে, তাহা ক্ষীণ স্মৃতি-চিহ্ন মাত্র।

গ্রামখানি অতি বৃহৎ। এতবড় বৃহৎ গ্রাম সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। গ্রামখানির বর্ত্তমান অবস্থার কথা বলিতেছি না, বহু বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। গ্রামখানির দক্ষিণপ্রান্ত দিয়া বিখ্যাত বেনারস রোড্ গিয়াছে। হিন্দু-নরনারীগণ ও অসংখ্য পথিক প্রত্যহ এই পথ দিয়া কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থে দল বাঁধিয়া মনের আনন্দে গমন করিত। পশ্চিমসীমায় দ্বারকেশ্বর নামে একটী নদী প্রবাহিত ছিল। প্রত্যহ অসংখ্য নৌকা এই নদীতে ভাসিয়া যাইত। বড় বড় মালবোঝাই নৌকা

ঝপ্‌ঝপ্‌ শব্দে উজান বাহিয়া চলিত। এখন এই নদীর সে প্রতাপ নাই। প্রবল বর্ষার সময় ব্যতীত বিখ্যাত দ্বারকেশ্বরের চিহ্নমাত্রও উপলব্ধি হয় না। গ্রামের পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে হরিৎ বর্ণের মাঠ। আহা, কি সুন্দর দৃশ্য! সারাবাটীর পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের শ্যামল শস্যক্ষেত্র দেখিলে প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিত। প্রকৃতি যেন স্বহস্তে অতি-যত্নে সারাবাটীর এই শ্যামল-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। পল্লিগ্রামবাসীর আনন্দের দিন পৌষমাসে এই শস্য-ক্ষেত্রের শোভা যিনি দেখিতেন, তিনিই মোহিত হইতেন। বিদেশী পথিক অনিমেষ নয়নে সারাবাটীর এই শস্যভরা সোনার মাঠের দিকে চাহিয়া থাকিত। পথিকের যতদূর দৃষ্টি চলিত, চাহিয়া থাকিত—কিন্তু কত দেশ ব্যাপিয়া যে এই ধান্যক্ষেত্র রহিয়াছে, তাহার সীমা করিতে পারিত না। এই নয়নতৃপ্তিকর মাঠের যে সীমা কতদূর ব্যাপিয়া আছে, তাহা সহজে উপলব্ধি করিবার উপায় ছিল না। পৌষ মাসে যখন এই সারাবাটীর মাঠের ধান্য পাকিয়া উঠিত, যখন সারাবাটীর গৃহস্থগণ ধান কাটিতে আরম্ভ করিত, তখন এই মাঠের শোভা কিরূপ নয়নাভিরাম হইত, তাহা আজকালকার ইংরাজী শিক্ষিত যুবকগণ বোধ হয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। যাঁহারা চাঁদের আলো, আকাশের তারা, বাগানের ফুল

লইয়া মধুর কল্পনায় মোহিত থাকেন, যাঁহারা লাঙ্গল স্কন্ধে মলিন ছিন্ন বস্ত্রে অর্দ্ধাঙ্গবেষ্টিত কৃষককে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহারা পৌষমাসের সারাবাটীর মাঠের এই ধান্যক্ষেত্রের শোভা উপলব্ধি করিতে পারিবেন কি? এই শোভা বড়ই মধুর—বড়ই চিত্তাকর্ষক।

পৌষ মাসে সারাবাটী গ্রামের গৃহস্থগণের আনন্দের সীমা নাই। অল্পবয়স্ক বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, গৃহের কুলবধূ হইতে বয়স্থা গৃহিণী—চাকর, কৃষাণ সকলেই আনন্দে আত্মহারা! ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকগণ! জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সারাবাটী গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছোট ছোট কুলবধূগুলিরও আজ এত আনন্দ কিসের? চাকুরী কি চিজ্, চাকুরীর আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ, সারা-বাটীর কেহ তখন জানিত না,—মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চাটুতা, জাল, জুয়াচুরিতে যে অর্থ উপার্জ্জন হয়, কখন তাহারা শুনে নাই, তাহারা জানে, কেবল সারাবাটীর শস্যশ্যামল ধান্যক্ষেত্র—তাহারা জানে, গৃহ-সংলগ্ন ক্ষুদ্র বাগান,—গৃহ পশ্চাতে ক্ষুদ্র পুষ্করিণী।

পৌষ মাসে সারাবাটীর মাঠের ধান্য পাকিয়া উঠিয়াছে। [illegible] সকলেই আনন্দভরা হৃদয়ে ধান্য কাটিয়া [illegible] ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছে। বালক [illegible] তাহারা [illegible] ৎপর অপেক্ষা

এ বৎসরে অধিক পরিমাণে শিষ ধান্য সঞ্চয় করিবে। কুলবধূগণ আনন্দ করিতেছেন, খামারের ঝাড়া ধান্য পৃথক মরাইয়ে সঞ্চিত করিবেন,—বয়স্থা গৃহিণীগণ আনন্দ করিতেছেন, আখড়ার ধান্য সঞ্চিত করিয়া স্ব স্ব ব্রত ও দেবপূজায় ব্যয় করিয়া যাহা থাকিবে তাহাতে এ বৎসর কথকতা দিবেন। চাকর ও কৃষাণগণ আনন্দ করিতেছে, গৃহস্থের নিকট এ বৎসরে যে পারিশ্রমিক ধান্য পাইবে, তাহাতে পুত্র ও কন্যাটির বিবাহ দিয়া পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধের জন্য অবশিষ্ট সঞ্চয় করিয়া রাখিবে! সকলেই আনন্দে পুলকিত। সারাবাটীর আজ ঘরে ঘরে আনন্দরোল উঠিয়াছে। রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে চাকর কৃষাণগণ মাঠের দিকে ছুটিয়া কেহ ধান্য কর্ত্তন করিতেছে—কেহ বোঝা বাঁধিতেছে—কেহ গো-পৃষ্ঠে বোঝা চাপাইয়া ঘরের দিকে গরু তাড়াইয়া চলিয়াছে। দুঃখ, অভাব কি বস্তু, তাহা সারাবাটীর লোক জানে না।

সারাবাটী গ্রামে একটি ক্ষুদ্র পাঠশালা বা টোল আছে। দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার স্থাপয়িতা ও অধ্যাপক। সারাবাটীর ব্রাহ্মণ ছাত্রগণ কেবল এই টোলেয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট কলাপ অবধি সামান্য ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিনয়, পরোপকারিতা ও সরলতার কথা আজও

সারাবাটী গ্রামের বংশধরগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। পাঠক-পাঠিকাগণ যথাসময়ে দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গুণের পরিচয় পাইবেন।

ইহা ব্যতীত সারাবাটী গ্রামের উত্তর ও পূর্ব্ব পাড়ায় দুইটি সাধারণ প্রাথমিক পাঠশালা এবং গ্রামের প্রান্তসীমায় বেনারস্ রোডের উপর দুইটি চটি বা সরাই আছে। একটি পুরাতন চটী ও একটী নূতন চটী বলিয়া কথিত। সারাবাটীর পুরাতন চটীর নাম সেকালে জানিত না এমন লোক বিরল। পুরাতন চটীর নাম করিলে শিশু ক্রন্দন ত্যাগ করিয়া মাতৃ-ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িত, কুলবধূগণ শিহরিয়া উঠিত, বয়স্থা গৃহিণীগণ ভগবানের নাম উচ্চারণ করিত। এই পুরাতন চটীর সন্নিকটে দস্যুগণের আড্ডা ছিল। ইহারা সুযোগ পাইলেই পথিকগণের প্রাণসংহার করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইত।

সারাবাটী গ্রামের পশ্চিম দিকে শেষ সীমায় কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থ বাস করি-তেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতার নাম ৺রাম-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর কোন সহোদর ভ্রাতা ছিল কিনা তাহা আমরা জানি না, সুতরাং ৺রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায়ই এক মাত্র পুত্র বলিয়া আমরা উল্লেখ করিব।

৺রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন পরলোকগমন করেন, তখন তাঁহার সংসারে কৃষ্ণমোহন ও তৎপত্নী ব্যতীত আর কেহ ছিল না। সারাবাটী গ্রামের টোলের অধ্যাপক দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণমোহনের পিতার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে কৃষ্ণমোহনের জননী দুর্গাপ্রসন্নকে পুত্রের অধিক স্নেহ করিতেন। কৃষ্ণ-মোহন ও দুর্গাপ্রসন্ন উভয়ে প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। উভয়েই উভয়কে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং উভয়ের ভালবাসাও সহোদর অপেক্ষা অল্প ছিল না। বিপদে-সম্পদে, সুখ-দুঃখে উভয়ে উভয়ের সঙ্গী ছিল; অনেকেই মনে করিতেন, কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্ন ইহাঁরা দুই সহোদর ভ্রাতা।

কৃষ্ণমোহনের পিতার মৃত্যুর পর হইতে উভয়ের ঘনি-ষ্টতা অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কৃষ্ণমোহনের মাতাও উভয়ের মুখ দেখিয়া স্বামী-শোক বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণমোহনের পিতা মৃত্যুকালে দুর্গাপ্রসন্নকে ডাকিয়া বলিয়া যান,—"বাবা দুর্গাপ্রসন্ন! তুমিও আমার কৃষ্ণ-মোহনের ন্যায় সন্তান; উভয়ে একসঙ্গে থাকিয়া কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইও। ধর্ম্ম ও উপরে ভগবান আছেন, ইহা যেন কখন ভুলিও না। সংসার বড়ই কঠিন স্থান, পদে পদে বাধা বিঘ্ন পাইলেও ভীত হইও না, কর্ত্তব্য বোধে

ভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া কার্য্য করিয়া যাইবে। আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিলাম।" পিতার এই অন্তিম কথা শুনিয়া দুই ভ্রাতায় গলা জড়াইয়া রোদন করিতে লাগিল। সেই হইতে কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্নকে প্রায় সর্ব্বদাই একসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যাইত।

কৃষ্ণমোহন যদিও অষ্টাদশ বৎসরে পিতৃহারা হইলেন, কিন্তু এই বয়সেই তিনি পিতার নিকট শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং পিতার পবিত্র চরিত্রে তাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। পিতা থাকিতে কৃষ্ণমোহন কেবল অধ্যয়ন ও পিতার কোন কোন কার্য্যে সাহায্য করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের সকল কার্য্যের ভার কৃষ্ণমোহনের উপর পড়িল। যে সন্তান উপযুক্ত পিতার চরণতলে বসিয়া চরিত্র গঠিত করিয়াছে, তাহার সংসার উত্তাল তরঙ্গে কিসের ভয়? কৃষ্ণমোহনের পিতার সারাবাটীর মাঠে প্রায় ৮০ বিঘা জমিতে ধান চাষ হইত, ইহা ব্যতীত সরিষা, কলাই, আলু ইত্যাদির চাষ ছিল। গৃহে ৺রামচন্দ্র, শালগ্রাম শিলা, ৯।১০টি দুগ্ধবতী গাভী, ৮টি লাঙ্গলের গরু, ৬ জন কৃষাণ, শেথা ও থোপা নামে ২টী কুকুর এবং আরও ২।৪টি জীবের ভার কৃষ্ণমোহনের উপর পড়িল। শেথা ও থোপা নামে কুকুর দুইটি কৃষ্ণমোহনের পিতার বড়ই আদরের সামগ্রী ছিল। মৃত্যুর ২।৪ দিন

পূর্ব্বে তিনি গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিয়া যান, যেন শেখা ও ধোপার কোন কষ্ট না হয়। গৃহিণীও কর্ত্তার মৃত্যুর পর অগ্রে শেখা ও ধোপাকে আহার দিয়া তবে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। শেখা ও ধোপা কেন কৃষ্ণমোহনের পিতার সংসারে আসিয়া ঢুকিল, এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিয়াছি, তাহা নিয়ে বিবৃত করিলাম।

একদিন বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় কৃষ্ণ-মোহনের পিতা দেবপূজা ও আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া আহারে বসিয়াছেন; গৃহিণী অন্ন ব্যঞ্জনাদি দিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় গ্রামের শশী ধোপা—"দাদা-ঠাকুর বাটীতে আছেন"—বলিয়া গৃহ সম্মুখে উপস্থিত হইল। শশীর স্ত্রী কয়েকদিবস পূর্ব্বে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়, সেই জ্বর কল্য হইতে বিকারে পরিণত হইয়াছে, প্রাতে দাদাঠাকুর গিয়া রোগীর যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন, কেবল পূজা আহ্নিক ও একমুঠা আহারের জন্য গৃহে আসিয়াছেন মাত্র। তাঁহার গৃহে আসিবারও ইচ্ছা ছিল না। যে ঔষধের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে রোগীর অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, ইহা দেখিয়া তিনি অপরাহু সময়ে একবার বাটীতে আসিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহিণী মুখে জলবিন্দু দিবেন না, কৃষ্ণমোহনও হয়ত আহার

করিবে না, এই জন্ত বাটীতে আসিলেন। তিনি অন্ন স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র, এমন সময়ে শশী ধোপা আসিয়া উপস্থিত হইল। দাদা ঠাকুর আহার করিতে বসিয়াছিলেন দেখিয়াও শশী নিজের কাতরতা গোপন করিতে পারিল না। একদিকে তাহার প্রাণের প্রাণ সতী স্ত্রী তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়াছে, অন্ত দিকে গ্রামপূজ্য পিতার ন্যায় উপকারী, মাথার মণি দাদাঠাকুর আহারে বসিয়াছেন। বেলা তৃতীয় প্রহর হইতে যায়, এখনও জলবিন্দু মুখে দেন নাই, তাহার স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেই দাদা-ঠাকুরের পূজা ও আহারের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। শশী কাঁদিয়া উঠিল, ক্রন্দনধ্বনিতে কর্ত্তা ও গৃহিণী চমকাইয়া উঠিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে শশী রোদন করিতেছে। আমাদের রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর আহার করিতে পারিলেন না—মুখের অন্ন ফেলিয়া একবারে শশীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গৃহিণী ক্ষুণ্ণমনে সেই স্থলে উপস্থিত হইল।

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন শশীর মুখে শুনিলেন যে, তাহার স্ত্রী রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া আসিয়াছে, কপালের বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম কিছুতেই নিবৃত্তি হইতেছে না, কবিরাজ মহাশয় একবারে আশা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি কপালে হাত দিয়া সেই ধূলার উপর বসিয়া পড়িলেন। বন্দ্যো-

পাধ্যায় মহাশয়ের চক্ষু দিয়া কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু পড়িল।

শশীর শোকাবেগ তখন দ্বিগুণ বেগে উথলিয়া উঠিল; বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চরণ-প্রান্তে পড়িয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল! গৃহিণী শশীকে উঠাইয়া তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া কত প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এখানে আর কাল বিলম্ব বিধেয় নহে মনে করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শশীর হাত ধরিয়া তাহার গৃহাভিমুখী হইলেন। যাইবার সময় গৃহিণী বলিলেন, এখনও জলবিন্দু মুখে দাও নাই—চারিটি চাউল, এক ঘটি জল আনিয়া দিব কি? কর্ত্তা একবার গৃহিণীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি আহার কর।" এই বলিয়া তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। গৃহিণী মরমে মরিয়া গেলেন। বুঝিলেন, জল খাইবার কথাটা বলা বড়ই অন্যায় হইয়াছে।

শশীর গৃহে গিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেখিলেন, রোগিণীর অন্তিম অবস্থা উপস্থিত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া রোগিণীর জ্ঞানের উদয় হইল। হাত নাড়িয়া শশী ও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একবার ডাকিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রোগিণীর শিয়রে যাইয়া

দাঁড়াইলেন, অতি কষ্টে শশী-গৃহিণী ব্রাহ্মণের পদরজঃ মাথায় দিতে গেল, দিতে পারিল না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন রোগিণীর অভিপ্রায় বুঝিয়া নিজ পায়ের ধূলা লইয়া রজকপত্নীর মস্তকে প্রদান করিলেন। রজকপত্নী কর-যোড়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আবার কি বলিতে গেল, বলিতে পারিল না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। রজকপত্নীর মৃত্যুশয্যাপ্রান্তে বসিয়া মুমূর্ষু রজকপত্নীর মস্তক নিজক্রোড়ে উঠাইয়া লই-লেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একবার ঊর্দ্ধে আকাশ পানে চাহিলেন, পরক্ষণে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এইবার তিনি রজকপত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া ভগবানের নাম গান করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন তিনি "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" বলিয়া ভগবানের নাম গান করিতে আরম্ভ করি-লেন, তখন রজক-গৃহ যেন ঋষির আশ্রমস্থল হইয়া উঠিল! দেখিতে দেখিতে রজকপত্নীর আত্মা অনন্তে মিশিয়া গেল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রজকপত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি শেষ করাইয়া পরদিন প্রভাতে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

বাড়ীতে গিয়া দেখিলেন, গৃহিণী তখনও জলবিন্দু স্পর্শ করেন নাই; শশীকে কিছু আহারাদি করাইবার জন্ত পুত্র কৃষ্ণমোহনকে পাঠাইতেছেন। কয়েক দিবস পরে শশী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে আসিয়া তাঁহার চরণ-

প্রান্তে বসিয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহার পা-দুখানির পানে চাহিয়া রহিল। কোন কথা নাই, অন্যদিকে দৃষ্টি নাই—স্পন্দনরহিত অবস্থায় একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার এই অবস্থা দেখিয়া, মস্তকে হাত দিয়া তাহাকে ক্রোড়ের কাছে টানিয়া লইলেন। এত স্নেহ—এত দয়া! শশী ভাবিতে লাগিল, সকলকে ছাড়িতে পারি, কিন্তু আমার প্রতি যাঁহার এত স্নেহ—এত দয়া তাঁহাকে কি করিয়া ছাড়িয়া যাই?

শশী এইবার মনের কপাট খুলিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পা-দুখানির পানে চাহিয়া বলিতে লাগিল,—"আপনি আমার পিতা, আপনি আমার গুরু, আপনি আমার অভীষ্ট দেবতা। আমি যে সারাবাটীতে আছি, সে কেবল আপনার স্নেহে—আপনার দয়ায়! আমি এতদিন বহুদূরে গিয়া পড়িতাম, কেবল আপনার অনুমতির জন্য যাইতে পারি নাই। বলুন, আমার কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে? আমি ধোপা, আপনি আমার স্ত্রীর মলমূত্র স্পর্শ করিয়াছেন। পিতার ন্যায় তাহার সেবা করিয়াছেন, এতটা পাপ কি আমার সহিবে?" বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানাপ্রকারে তাহাকে বুঝাইয়া সান্ত্বনা করিয়া শেষে বলিলেন, "শশী, ইহা যে সংসারের কর্ত্তব্য! কর্ত্তব্য পালন না করিলে মানব যে ঈশ্বরের রাজ্যে কর্ত্তব্য অবহেলা জন্য

পাপে নিরয়গামী হয়।” শশী আবার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পা দুইখানির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এইবার শশী বলিল, “দেব! আমি আর সারাবাটীতে থাকিতে পারিব না। আমার প্রাণ অস্থির হইয়াছে। আপনার চরণতলে বসিয়া বহুদিন বহু উপদেশ শুনিয়াছি। রাত্রে নিদ্রা হইত না, মনে করিতাম, নীচ আমি—অধম আমি—সংসার-বন্ধনে জড়িত, আমার আর মুক্তি কিরূপে হইবে? দেব! ভগবানের ইচ্ছায় আমার সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, আর আমি কাহার মায়ায় সারাবাটীতে থাকিব? আপনাকে আর দেখিতে পাইব না, ইহাই আমার কষ্ট। দেব, আপনি অনুমতি দিন, আপনার জ্ঞান উপদেশ হৃদয়ে লইয়া—আপনার চরণ দুখানি নয়ন সমক্ষে ধরিয়া—সারাবাটী হইতে বিদায় লই।”

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও গৃহিণী অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু শশীর দৃঢ়তার নিকট উভয়েই পরাস্ত হইলেন। পরদিন তখনও উষাদেবী সারাবাটীতে পদার্পণ করেন নাই,—পক্ষিকুল তখনও কুলায় নিদ্রা যাইতেছে; বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় সবেমাত্র শয্যা হইতে উঠিতেছেন, এমন সময় শশী ২টি কুকুর ক্রোড়ে লইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহা-শয়কে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পা-দুখানির দিকে চাহিয়া রহিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সকলই বুঝিলেন,

ভাবিলেন, সহস্র বুঝাইলে শশী আর গৃহে থাকিবে না। একে পত্নী-শোকে উন্মাদ, তদুপরি ভগবৎপ্রেমে আত্মহারা, কাজেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও গৃহিণী অশ্রুসিক্ত নয়নে শশীকে বিদায় দিলেন। শশী একবার মুহূর্ত্তের জন্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া তৎ-ক্ষণাৎ বাহিরে আসিল। শশী দুইটি কুকুর-শাবক বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের কাছে রাখিয়া বলিল, "জন্মের চারি-দিন পরেই ইহাদের মাতার মৃত্যু হয়। বিনা যত্নে মারা যাইবে বলিয়া আমার স্ত্রী সন্তানের ন্যায় দুগ্ধ খাওয়াইয়া ইহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার স্ত্রীর জ্ঞান ছিল, এই কুকুর-শাবক দুটিকে দুগ্ধ খাওয়াইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছে। তাহার শেষ অনুরোধ ভুলিতে পারি নাই।" বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শশীর অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, "কুকুর-শাবক দুটি আমার কাছে রাখিয়া যাও।" শশীর হৃদয়ের একটা ভার যেন কমিয়া গেল। শশী আর একবার অনিমেষ-নয়নে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পা-দুখানি দেখিয়া লইয়া বেনারস রোডে উঠিয়া ৺বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভাবিতে ভাবিতে কাশীধামাভিমুখে যাত্রা করিল।

বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিণী যখন শয়ন-গৃহে প্রবেশ করি-লেন, দেখিলেন, বহু সহস্র স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটি তাম্রকলস

মেঝের উপর সযত্নে রক্ষিত। তবে কি শশী স্বর্ণমুদ্রাগুলি রাখিয়া গেল? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কথা শুনিয়া গৃহিণীকে আদেশ করিলেন, অতি যত্নে সুবর্ণমুদ্রাগুলি রাখিয়া দাও, শশী ফিরিয়া আসিলে তাহাকে দিব। এই সময় হইতেই শেখা ও খোপা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসারে প্রবেশ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যাবলী।

কৃষ্ণমোহন পিতার মৃত্যুর পর বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে সংসারের কর্ত্তব্যকার্য্যগুলি সম্পন্ন করিব। পাঠকপাঠিকাগণ মনে করিতে পারেন, যাঁহার সংসারে এত আয়, তাঁহার আবার চিন্তা কি? কৃষ্ণমোহনের ৮০ বিঘা জমিতে ধান্য ফলিতেছে, ৮।১০ বিঘা জমিতে অন্যান্য চাষ আবাদ হইতেছে, গৃহে দুগ্ধবতী গাভী, পুষ্করিণীতে মৎস্য—বাগানে ফল, ইহাতে কি কৃষ্ণমোহন ও কৃষ্ণমোহনের মাতার জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে না? সঙ্কীর্ণমনা ইংরাজী-শিক্ষিত বাবুনামধারীগণের মনে এইরূপ প্রশ্ন উদিত হইতে পারে বটে, কিন্তু কৃষ্ণমোহন প্রকৃতই চিন্তায় পড়িলেন। কৃষ্ণমোহন ভাবিতে লাগিলেন,—পিতা যাহা করিয়া গিয়াছেন, পিতার চরণতলে বসিয়া যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহা যদি সম্পন্ন করিতে সক্ষম না হই, তবে কেন পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? পিতা নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়াছেন, দীন, দুঃখী কাঙ্গাল ও আতুরের চিরজীবন সেবা করিয়াছেন, আমি

তাঁহার পুত্র হইয়া কি সংসারে কোন কার্য্যেই আসিব না ? কৃষ্ণমোহন এই সমস্ত চিন্তা হৃদয়ে লইয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

কৃষ্ণমোহনের পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার দৈনিক কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থলে প্রকাশ করিতেছি। কৃষ্ণমোহন রাত্রি এক প্রহর থাকিতে শয্যাত্যাগ করিতেন এবং শয্যাত্যাগের পর গৃহের বাহিরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে বসিয়া উর্দ্ধে আকাশ পানে চাহিয়া ঈশ্বরের নাম গান করিতেন। নাম গান করিতে করিতে এতই বিভোর হইতেন যে, এক একদিন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া ফেলিতেন। জ্যোৎস্না-বিধৌতরাত্রে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে বসিয়া যেদিন তিনি আপন মনে বিভোর হইয়া ভগবানের গুণ গান করিতে বসিতেন, পূর্ব্বদিক ফর্সা হইয়া যাইত, তত্রাচ তাঁহার বাহ্জ্ঞান থাকিত না। এইরূপে কৃষ্ণমোহন ভগবানের নাম গান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে গৃহ-দেবতা ৺রামচন্দ্র, শালগ্রাম শিলার জন্য পুষ্পচয়নে বহির্গত হইতেন। কৃষ্ণমোহন যখন পুষ্পচয়ন করিয়া গৃহে ফিরিতেন, তখনও সারাবাটী গ্রাম অন্ধকারে আবৃত থাকিত ; তখনও ঊষাদেবী সারা-বাটী গ্রামে পদার্পণ করিতেন না, বিহগকুল তখনও কুলায় সুখে নিদ্রা যাইত। পুষ্পচয়নের পর কৃষ্ণমোহন গাত্র-

পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহার সেই দুগ্ধবতী গাভীগুলিকে নির্ম্মল প্রভাত-বায়ু সেবন জন্য ছাড়িয়া দিতেন। কৃষ্ণ-মোহনের গোশালা তাঁহার নিজের শয়ন-ঘর অপেক্ষা হীন ছিল না। স্বহস্তে গাভী-গৃহগুলি এরূপভাবে পরিষ্কৃত করিতেন যে, রোগপ্রপীড়িত দেহে গোশালায় শয়ন করিলেও স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। গোসেবা শেষ করিয়া কৃষ্ণমোহন একখানি কোদালি হস্তে গৃহ পশ্চাতের বাগানে গমন করিয়া ফুলগাছের গোড়াগুলি খনন করিতে আরম্ভ করিতেন এবং সেই সময়ের মধ্যেই বাগানের শুষ্ক বৃক্ষের ডাল ইত্যাদি রন্ধনের জন্য ২।৪ বোঝা সংগ্রহ করিয়া ফেলিতেন। কৃষ্ণমোহন যখন কোদাল ধরিয়া মাটী খনন করিতে আরম্ভ করিতেন, তখন তাঁহার সহিত কোদালি সঞ্চালনে সমকক্ষতা করিতে সারাবাটী গ্রামের কাহারও ক্ষমতায় কুলাইত না। কৃষ্ণমোহনের প্রধান কৃষাণ রামতনু বাগ্‌দী কেবল তাঁহার পশ্চাতে যাইতে পারিত মাত্র। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, আড়াই দণ্ডের অধিক রামতনু কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে কোদাল ধরিয়া যুঝিতে পারিত না। আড়াই দণ্ডের পর রামতনুকে কোদাল ফেলিয়া বিশ্রাম জন্য বসিয়া হাঁফ ছাড়িতে হইত।

কোনদিন শাক ও বেগুনের জমি, কোনদিন ফুলগাছ-গুলির গোড়া, কোনদিন আম ও কাঁঠালগাছগুলির মূলদেশ

এইরূপ পালাক্রমে বাগানের জমি খনন করা কৃষ্ণমোহনের নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। বাগান খনন করিতে করিতে যখন কৃষ্ণমোহন দেখিতেন, পূর্ব্বদিক ফর্সা হইয়া আসিয়াছে, বিহঙ্গমকুল তাহাদের কুলায় বসিয়া এক একবার সাড়া দিতেছে—তখন তিনি গুন্ গুন্ করিয়া ভগবানের নাম গান করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিতেন। কৃষ্ণমোহন গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইতেন, রামতনু তাহার শামলা, ধলা, বৈঁড়ে ও বুধো লাঙ্গলের গরু চারিটি লইয়া সারাবাটীর মাঠে যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। রামতনু দৌড়িয়া আসিয়া কৃষ্ণমোহনের চরণতলে প্রণাম করিল এবং পদধূলি লইয়া মস্তকে বক্ষঃস্থলে ও দুটি চক্ষে মাখাইয়া দিল। কৃষ্ণমোহন বলিয়া দিলেন, আজ ডুবরি ও কাঁদুনে ১০বিঘা জমিতে সরিষা বুনিয়া ফেলিও। শামলা, ধলা, বুধো, বৈঁড়েও যেন কৃষ্ণমোহনের আদেশ অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা হন্ হন্ শব্দে সারাবাটীর মাঠের দিকে দৌড়াইল। রামতনু লাঙ্গল স্কন্ধে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

"তোমারই জল, তোমারই স্থল, তোমারই আকাশ, তোমারই নদী" এই প্রকার গুন্ গুন্ করিয়া আপন মনে বকিতে বকিতে একখানি গামছা স্কন্ধে লইয়া কৃষ্ণমোহন "ময়রা পুষ্করিণীর" দিকে চলিলেন। কৃষ্ণমোহন এই ময়রা

পুষ্করিণী ব্যতীত অন্য কোথাও স্নান করিতেন না। এই পুষ্করিণী সারাবাটীর গ্রামের শেষসীমায় অবস্থিত। এখনও সেই ময়রা পুষ্করিণীর চিহ্ন বর্ত্তমান আছে কিন্তু পূর্ব্বের ময়রা পুষ্করিণীর তুলনায় এখন ইহাকে একটি ক্ষুদ্র ডোবা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখনকার এই ময়রা পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পাড় হইতে পশ্চিম পাড়ে দৃষ্টি চলিত না, উত্তর পাড় হইতে দক্ষিণ দিকের বৃক্ষগুলি ক্ষুদ্র ঝোপের ন্যায় অনুমান হইত। যে ময়রা পুষ্করিণীর জলে কুম্ভীরের ন্যায় বৃহৎ রুই মৃগেল খেলা করিত, এখন সেই স্থলে জমিদারের কাছারি-বাড়ীর অট্টালিকা উঠিয়াছে। এই ময়রা পুষ্করিণী সম্বন্ধে যে ইতিবৃত্ত আছে, আমরা অতি বৃদ্ধদের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সারাবাটী গ্রামের উত্তরপাড়ায় বনমালী ময়রা স্ত্রীপুরুষে বাস করিত। তাহাদের কোন সন্তানাদি ছিল না। বনমালীর স্ত্রী অতি স্বামীপরায়ণা ছিল—বনমালীও স্ত্রীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত। বনমালী নিঃসন্তান, ইহাই একমাত্র তাহাদের দুঃখের কারণ ছিল। ইহা ব্যতীত সংসারে কোন কষ্টই ছিল না। সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেও বনমালীর স্ত্রী শান্তি স্বামীর পদরজ না খাইয়া জলস্পর্শ করিত না। বনমালীও যে দিন পাগ্‌লীকে কাছে বসাইয়া আহার করাইত না, সে দিন তাহার প্রাণে

মহা অশান্তি হইত। বনমালী শান্তিকে পাগ্‌লী বলিয়া ডাকিত। তাহার স্ত্রী শান্তি কেন যে বনমালির কাছে পাগ্‌লী নামে অভিহিত হইত, তাহা কেহ জানিত না; তবে শুনিয়াছি, কোন কারণে কখন কখনও পাগ্‌লীর উপর বিরক্ত হইলে শান্তি বলিয়া ডাকিয়া ফেলিত। বৈশাখ মাসের প্রথমে বনমালির সিন্দুরে গাছে আম পাকিয়াছে, পাগ্‌লী কয়েকটী আম দেবতার ভোগে দিবার জন্য পাড়ার ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে পাঠাইয়া একটি আম মধ্যাহ্ন আহারের সময় ক্ষীরের ন্যায় গরম দুগ্ধের সহিত বনমালিকে খাইতে দিয়াছে। বনমালী আম দেখিয়া একবারে চম্‌কাইয়া উঠিল। রাগ করিয়া ডাকিল,—শান্তি! শান্তি কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দাঁড়াইল। শান্তি! বলিয়া ডাকিলেই পাগ্‌লী বুঝিতে পারিত, একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটিবে। বনমালী বলিল, এখনও ব্রাহ্মণ-সেবা হয় নাই, অতিথি-সেবা হয় নাই, যাহাদের আমগাছ নাই, সেই দুলেপাড়ায় আম দেওয়া হয় নাই, তুমি আমাকে খাইতে দিলে কেন? যত তোমার বয়স হইতেছে, ততই কি বুদ্ধি লোপ পাইতেছে? শান্তি নিজের গুরুতর অপরাধ বুঝিয়া লজ্জিত অন্তঃকরণে হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। বনমালী দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথিকে না খাওয়াইয়া—দীন দুঃখী দুলে বাগ্দীর ঘরে ঘরে আম বিতরণ না করিয়া কখনই আম মুখে দিত না।

সারাবাটীর ইতর-ভদ্র সকলেই বনমালী ময়রাকে কেবল "ময়রা" বলিয়া ডাকিত। কেহ ময়রা খুড়া, কেহ ময়রা দাদা, কেহ ময়রা জেঠা, কেহ বা কেবল ময়রা বলিত। সারাবাটীর বালক-বালিকারা তাহার নাম জানিত না; কেবল ময়রা বলিয়াই জানিত। সারাবাটীর মিষ্টান্ন-দোকানের মধ্যে ইহারই প্রধান দোকান ছিল। ইতর-ভদ্র বালক-বৃদ্ধ সকলেই ইহার দোকানে যাইতে ভালবাসিত। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ইহার দোকানে বিক্রয়ের বিরাম ছিল না। ছেলেরা ধানের শিষ লইয়া মোয়া কিনিতে যাইতেছে—গ্রামবাসীরা কেহ চাল, কেহ ধান, কেহ বা কড়ি লইয়া খয়ের নাড়ু প্রভৃতি তখনকার নানাবিধ উপাদেয় মিষ্টান্ন লইয়া আসিতেছে। ইহার দোকানের আয় যথেষ্ট ছিল। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পিতৃমাতৃদায় প্রভৃতির জন্য যে যখন ময়রার দ্বারস্থ হইত, কেহই ফিরিত না। বরঞ্চ যে যাহা মনে করিয়া যাইত, তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থ লইয়া আসিত; পাগ্‌লীও কখন কাহাকেও বঞ্চিত করিত না। এইরূপ ভাবে ময়রা-দম্পতীর জীবন বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দেই অতিবাহিত হইতেছিল। জগতে চির-স্থায়ী কিছুই নহে, চিরদিন একভাবে কেহ থাকে না। একদিন ময়রার মৃত্যু-সংবাদে সারাবাটী গ্রামখানি শোকে আচ্ছন্ন হইল। সে দিন সারাবাটীর অধিকাংশ লোকের

গৃহেই অগ্নি জ্বলিল না, দুগ্ধাভাবে দুগ্ধপোষ্য শিশুরা চীৎকার শব্দে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কুলের কুল-বধূগণ অবগুণ্ঠনের ভিতর অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল। ময়রাকে স্নেহ করিত না এমন লোক সারাবাটী গ্রামে কেহ ছিল না। ময়রাও ভালবাসিত না এমন লোককে সারাবাটীর চতুষ্পার্শ গ্রাম খুঁজিলেও মিলিত না।

ময়রার মৃত্যুর পর পাগ্‌লী যথার্থই পাগলিনী হইয়া উঠিল। সে যথা তথা ময়রার পায়ের ধূলা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। "ময়রার পায়ের ধূলি না পাইলে সে কি করিয়া জল খায়", পাড়ার বৌ-ঝিয়েরা যে তাহাকে অন্নজল গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করে, তাহাকেই এই কথা বলিতে লাগিল। তৃতীয় দিবসের পর যখন পাগ্‌লী কথা কহিতে অশক্ত—উত্থানশক্তিরহিত—সেই সময় কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া পাগ্‌লীকে সুস্থ করিল। পাগ্‌লী প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার স্বামীর সঞ্চিত অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সন্ন্যাসীর উপদেশে সারাবাটীর প্রান্তসীমায় এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইল, চারিদিকে পাথরের ঘাট, নানাবিধ ফল-ফুলের বাগান, বড় বড় মৎস্য এই দীর্ঘিকায় শোভা পাইতে লাগিল। সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে পাগলিনী এই সম্পত্তির যাবতীয় আয় সারাবাটীর দীন-দুঃখীকে দান করিয়া সেই সন্ন্যাসীর

সহিত কোথায় চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে সকলকে বলিয়া গেল, ইহা "ময়রার পুকুর"। সেই হইতে দেশ-বিদেশের সকলেই ইহাকে ময়রা পুষ্করিণী বলিয়া থাকে। এককালে ইহার সুনির্ম্মল পবিত্র জলের সহিত বঙ্গদেশের কোন পুষ্করিণীর জলের তুলনা হইত না।

এই ময়রা পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকের প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাটে কৃষ্ণমোহন স্নান করিতেন। এই ঘাটটি কৃষ্ণমোহনের একচেটে ছিল, কেহ কৃষ্ণমোহনকে অন্য ঘাটে স্নান করিতে দেখে নাই। শুনিয়াছি, কৃষ্ণমোহনের পিতাও নিত্য এই ঘাটে স্নান করিতেন। স্নানের পর তিনি—

পিতাধর্ম্মঃ পিতাসর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥

এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া নিত্য আকাশের দিকে চাহিয়া তন্ময়চিত্তে প্রণাম করিতেন। ইহাতে অনেকেই কৃষ্ণ-মোহনের নিত্য এই ঘাটে স্নানের মর্ম্ম বুঝিতে পারিত। স্নানের পর যখন কৃষ্ণমোহন সুললিত স্বরে ভগবানের নাম গান করিতেন, তখন ময়রা পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বের গৃহস্থগণ বুঝিতে পারিত, প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। কৃষ্ণমোহনের স্নানের সময় হইয়াছে জানিয়া সকলেই শয্যাত্যাগ করিত। পূর্ব্বদিক অরুণরাগে রঞ্জিত হইবার পূর্ব্বেই কৃষ্ণমোহন

স্নানাদি কার্য্য সমাধা করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতেন। স্নানান্তে তিনি দেবগৃহে প্রবেশ করিতেন। প্রায় বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত তিনি পূজাগৃহে নিযুক্ত থাকিতেন। প্রথমতঃ তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পুষ্প, দূর্ব্বা ও বিল্বপত্রাদি দ্বারা দেবপূজা করিতেন। দেবপূজা সমাধা হইলে বহুক্ষণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চক্ষু মুদিত করিয়া থাকিতেন। এই সময় তাঁহার প্রাণায়ামে অতীত হইত। প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ভগবৎপ্রেমে আত্মহারা হইয়া উচ্চৈঃ-স্বরে ঈশ্বরবিষয়ক সঙ্গীত করিতেন। সঙ্গীত সাঙ্গ হইলে কোন দিন শ্রীমদ্ভাগবত বা গীতা, কোন দিন বা বেদ লইয়া একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করিতেন। তখন তাঁহাকে যিনি দেখিতেন, তিনিই শুদ্ধচেতা ঋষিতনয় বলিয়া মনে করি-তেন। এই সমস্ত নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করিতে কৃষ্ণমোহনের প্রায় দিবা ১ প্রহর অতীত হইয়া যাইত। কৃষ্ণমোহনও দেবগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিতেন, এমন সময় শামলা, ধলা, বুধো ও বেঁড়েকে লইয়া রামতনু বাগ্দী সারাবাটী মাঠ হইতে বায়ুবেগে আসিয়া উপস্থিত হইত। রামতনু আসিয়াই প্রথমতঃ কৃষ্ণমোহনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া চরণধূলি লইয়া বক্ষঃস্থলে, মস্তকে ও চক্ষু দুইটিতে মাখাইত। তাহার পর চরণামৃত গ্রহণ করিবার জন্য হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। দেবপ্রসাদ ও চরণামৃত রাম-

তনুর হাতে পড়িলে রামতনু আর দাঁড়াইত না, একবারে দুই লাফে—গোশালায় যাইয়া উপস্থিত হইত। শামলা, ধলা, বুধো ও বেঁড়ের মস্তকে সেই পবিত্র জলের ছিটা দিয়া গাভীগুলির মস্তকে হাত বুলাইয়া শেষে নিজের মস্তকে হাত মুছিয়া ফেলিত।

কৃষ্ণমোহন এইবার তাঁহার জননীর চরণে প্রণাম করিয়া পদধূলি মস্তকে লইতেন। কৃষ্ণমোহন এরূপ ভক্তিপ্লুতহৃদয়ে জননীর চরণে মস্তক রাখিয়া দিতেন যে, জননী কৃষ্ণমোহনের হস্ত ধরিয়া না তুলিলে উঠিতেন না। নানারূপ ধর্ম্মকথায় মাতাপুত্রে আরও কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইত। মাতাপুত্রে যখন ধর্ম্মবিষয়ক কথাবার্ত্তা হইত, তখন রামতনু সেখান হইতে উঠিত না। মাতার অনুরোধ সত্ত্বেও আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণমোহন মাতার সহিত হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। কৃষ্ণমোহনের গৃহে প্রত্যহ অর্দ্ধ মণের অধিক দুগ্ধ এবং তিন চারি সের গব্যঘৃত প্রস্তুত হইত। মাতা, পুত্র, রামতনু ও আরও চারি পাঁচজন কৃষাণের আহারের পর যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিত, তাহাতে সারাবাটী গ্রামের অনেক দীন শিশুসন্তান জীবনধারণ করিত। কৃষ্ণমোহনের জননী এ বিষয়ে একবারে মুক্তহস্ত ছিলেন।

দীন দুঃখীর সন্তানগণ ঔষধাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত

হয় - ইহা দেখিয়া কৃষ্ণমোহনের প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন, আহারাদির পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামলাভের জন্য মাতার চরণতলে বসিয়া যে সময় অতিবাহিত করিতেন, সেই সময় সংসারের কথা, ভগবানের কথা, গীতা ও মহাভারতের কথা, সারাবাটী গ্রামের দীনদুঃখীর কথা, রুগ্ন নিরাশ্রয়ব্যক্তিদের ঔষধ ও পথ্যাদির কথা প্রভৃতি নানাকথার আলোচনা হইত। কৃষ্ণমোহন বলিলেন, "মা! একটি বিষয়ের জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রাণে কষ্টানুভব করিতেছি।" পুত্রের কষ্টের কথায় জননী চমকাইয়া উঠিলেন। মাথাটি বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে মোহন! তোমার আবার কষ্ট কিসের?" জননীর চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু কৃষ্ণমোহনের গণ্ডস্থলে আসিয়া পড়িল। কৃষ্ণমোহন বলিলেন, "মা! আপনার ন্যায় জননীর স্নেহে যে পুত্র রক্ষিত, তাহার অন্য কষ্ট কিছুই থাকিতে পারে না। তবে কষ্টের মধ্যে আমি চিকিৎসা-বিদ্যায় অভিজ্ঞ নহি। এই সে দিন সারাবাটীর মাঠ হইতে রাত্রে আসিবার সময় সংবাদ পাইলাম, মধু জেলের কঠিন পীড়া এবং তাহার স্ত্রী ও পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যাটীও জ্বরে শয্যাগত। তুমিও জান মা! মধু জেলে সমস্ত দিন ঘুরিয়া লোকের

পুষ্করিণীর মৎস্য ধরিয়া যাহা পায়, তাহাতে তাহাদের অতি কষ্টে খাওয়া-পরা চলে মাত্র। উহার চাষ-আবাদ নাই, ধানজমি নাই, সকলই উহার পরিশ্রমের উপর নির্ভর। কয়দিন পড়িয়া থাকায় উপার্জ্জন বন্ধ হওয়ায় তাহার কষ্টের একশেষ হইয়াছে। ইহার উপর সে কবিরাজকে পয়সা দিতে কোথায় পাইবে মা!" জননী বলিলেন—"এ কথা তুমি আমাকে সে দিন কেন বল নাই মোহন?" কৃষ্ণমোহন বলিলেন, "আপনাকে কিছু বলি নাই মা, কারণ আমিই তাহাদের একটা উপায় করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু মা! কবিরাজের জন্য কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কবিরাজ মহাশয় ২ ক্রোশ দূরে কেশবপুরে চলিয়া গিয়াছিলেন; শুনিলাম, তিনি অনেকগুলি রোগী দেখিতে বাহির হইয়াছেন, রাত্রে আর ফিরিবেন না। আমি বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলাম—মধুকে রাত্রেই ঔষধ না দিলে পীড়া বড়ই বাড়িয়া যাইবে ভাবিয়া, রাত্রেই কবিরাজ কাকাকে ডাকিয়া আনিতে হইয়াছিল। আমি যখন কবিরাজ কাকাকে লইয়া ফিরিলাম, তখন রাত্রি দুই প্রহরের অধিক হইল। আসিয়া দেখিলাম যে, দুর্গাপ্রসন্ন রোগীর শিয়রে বসিয়া আছে।" জননী উত্তর করিলেন, "সে যে তোমার ভাই!"

কৃষ্ণমোহন বলিলেন, "মা, আমি মনে করিতেছি,

এইবার হইতে মনোযোগ দিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিব।" জননী বলিলেন, "বাবা, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় তুমি আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রেও অল্প দিনের মধ্যে সুপণ্ডিত হও।"

কৃষ্ণমোহন মাতার নিকট হইতে উঠিয়া সারাবাটীর মাঠের দিকে গমন করিতেন। প্রিয় ভৃত্য রামতনু সঙ্গে সঙ্গে যাইত। প্রভু ভৃত্যে যাইতে যাইতে নানা বিষয়ের পরামর্শ ও কথাবার্ত্তা হইত। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাঠে থাকিয়া কৃষ্ণমোহন চাষ আবাদের সমস্ত বন্দোবস্ত ও রামতনুর সঙ্গে ক্ষেত্রগুলি পরিদর্শন করিতেন। কল্য কোন্ জমীতে লাঙ্গল চলিবে, কোন্ জমীতে ধান্য বপনের ব্যবস্থা হইবে, কোথায় সার দিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় বন্দোবস্ত ও জমিগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া তত্ত্বাবধান করিতে মাঠেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। কৃষ্ণমোহন রাত্রি চারি দণ্ডের কমে কোন দিন গৃহে ফিরিতে পারিতেন না। গৃহে আসিয়াই বেঁড়ে থলা প্রভৃতি লাঙ্গলের গরু ও গাভীগুলির আহারাদির কোন অভাব আছে কি না দেখিয়া, স্নেহভরে সকলের গলা ধরিয়া মুখচুম্বন করিতেন। গরুগুলি আহার ফেলিয়া কৃষ্ণমোহনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত।

হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া দেবালয়ে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতে রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইত। এইবার

কৃষ্ণমোহন মাতাকে প্রণাম করিয়া আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা-গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে বসিতেন। রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া শয়ন করিতেন এবং রাত্রি তৃতীয় প্রহরে শয্যা ত্যাগ করিয়া ভগবানের নামগানে রত হইতেন। ইহাই কৃষ্ণমোহনের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য ছিল এবং দৈব-দুর্ঘটনা না ঘটিলে এ নিয়মের তিনি কখনও ব্যতিক্রম করিতেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণমোহনের পিতার মৃত্যুর পর আরও ১২ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন কৃষ্ণমোহনের বয়স ত্রিশ বৎসর। কৃষ্ণমোহন এখন অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রেও পণ্ডিত হইয়াছেন। কৃষ্ণমোহনের জননীর আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছে, তাঁহার চিকিৎসার যশ ও সুখ্যাতি কেবল হুগলী জেলায় নয়—আরও ২।৩টি জেলায় ঘোষিত হইয়াছে। দীন-দুঃখীগণ কবিরাজ কৃষ্ণমোহনের নাম শুনিলে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে মনে মনে প্রণাম করে। মাতার অনুমতিতে প্রথম বৎসরে কৃষ্ণমোহন জমিদার ও অর্থশালী গৃহস্থের বাটীতে পয়সা লইয়া চিকিৎসা করিতে যাইতেন। এখন আর কৃষ্ণমোহনের সে সময় নাই। অহোরাত্র কৃষ্ণমোহনের বাহিরের ঘরে রোগী আসিয়া জুটিতেছে, কেহ ২ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে, কেহ বা ৫।৬ ক্রোশ পথ হইতে, কেহ বা ২।৩ দিনের পথ হইতে কৃষ্ণমোহনের নিকট ঔষধ লইতে আসিয়াছে। সকলেই নিঃস্ব, সকলেই দরিদ্র। দূরবর্ত্তী নিঃস্বরোগীকে পাথেয় দিয়া গৃহে পাঠাইতে হয়। কৃষ্ণমোহনের এখন আর আহার নিদ্রার সময়

নাই। টোলের দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রধান ছাত্রের উপর টোলের অধ্যাপনার ভার দিয়া একদিন কৃষ্ণমোহনের জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কৃষ্ণমোহনের জননী বলিলেন, "কি হইয়াছে বাবা দুর্গাপ্রসন্ন!" দুর্গাপ্রসন্ন বলিলেন, "মা! মোহন দিনরাত্রি খাটিতেছে, তাহার আহার নিদ্রার সময় নাই, আমার আর টোলে ছেলে পড়াইতে ভাল লাগে না, যতটা পারা যায় মোহনের সাহায্যের জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাই!" জননী বলিলেন, "তোমরা যে বাবা দুটি ভাই।" পাঠকপাঠিকাগণ মনে করিতে পারেন, কর্ত্তব্য কার্য্য মনে করিয়া কৃষ্ণমোহন যে সমস্ত কার্য্য হাতে তুলিয়া লইয়াছেন, এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে বহু শারীরিক সামর্থ্যের প্রয়োজন। একা কৃষ্ণমোহন কিরূপে এই সমস্ত কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতেন? আজকাল আমাদের যেরূপ শারীরিক বল, কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে উদাসীনতা এবং একাগ্রতা, সহিষ্ণুতা, ঐকান্তিক চেষ্টা প্রভৃতির অভাব হইয়াছে এবং আলস্যে সময় নষ্ট, জীবনের মূল্যবান মুহূর্ত্তগুলি হেলায় বৃথাকার্য্যে ব্যয় করা, তাস, পাশা প্রভৃতি জঘন্য ক্রীড়ায় সময় নষ্ট, অল্প বয়স হইতে বিলাসিতা-ব্যাধি, কুসংসর্গ, কুকার্য্যে প্রবৃত্তি, অল্প বয়স হইতে অতিরিক্ত ভাবে দেহক্ষয়ে আসক্তি প্রভৃতিতে প্রগাঢ়

প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহাতে আমাদের ন্যায় অলস, রুগ্ন, দুর্ব্বল বাঙ্গালীর মনে এই প্রশ্ন উদিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে, বরঞ্চ স্বাভাবিক। পাঠক-পাঠিকাগণ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ সংযমী সংসার-আসক্তিহীন কর্ম্মযোগী কৃষ্ণমোহনের ক্রমশঃ শারীরিক সামর্থ্যের পরিচয় পাইবেন।

কৃষ্ণমোহনের সারাবাটীর মাঠে যে সমস্ত জমি ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিষয়াদি ছিল, ইহার কতক অংশ বর্দ্ধমান রাজের জমার অন্তর্গত। বর্দ্ধমানরাজের গদিতে কতক জমির কর দাখিল করিতে হইত এই জন্য মাঝে মাঝে কৃষ্ণমোহন বর্দ্ধমানে যাইতেন। তখন বর্দ্ধমান রাজসংসারে ব্রাহ্মণের বিশেষ প্রতিপত্তি ও আদর ছিল। ব্রাহ্মণ ব্যতীত সাধারণ প্রজারাও স্বয়ং মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া অভাব অভিযোগ ও মর্ম্মবেদনা জানাইতে পারিত। আমাদের কৃষ্ণমোহনের রাজসংসারে বিশেষ খাতির ছিল, এমন কি, উচ্চতম রাজকর্ম্মচারীগণ কৃষ্ণমোহনকে বসিবার জন্য আসন ছাড়িয়া দিতেন। প্রবলপ্রতাপ বর্দ্ধমানরাজও কৃষ্ণমোহনকে সম্মানের সহিত আসন প্রদান করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বন্ধুভাবে ধর্ম্ম ও রাজকার্য্য বিষয়ের আলোচনা করিতেন। কৃষ্ণমোহনও এই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু মহারাজধিরাজের প্রাসাদে যখন সন্ধ্যায় মঙ্গল আরতির নহবৎ সপ্তম সুরে বাজিয়া উঠিত, কৃষ্ণমোহন ভক্তিভরে

প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহাতে আমাদের ন্যায় অলস, রুগ্ন, দুর্ব্বল বাঙ্গালীর মনে এই প্রশ্ন উদিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে, বরং স্বাভাবিক। পাঠক-পাঠিকাগণ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ সংযমী সংসার-আসক্তিহীন কর্ম্মযোগী কৃষ্ণমোহনের ক্রমশঃ শারীরিক সামর্থ্যের পরিচয় পাইবেন।

কৃষ্ণমোহনের সারাবটীর মাঠে যে সমস্ত জমি ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিষয়াদি ছিল, তাহার কতক অংশ বৰ্দ্ধমান রাজের জমার অন্তর্গত; বৰ্দ্ধমানরাজের গদিতে কতক জমির কর দাখিল করিতে হইত। এই জন্য মাঝে মাঝে কৃষ্ণমোহন বৰ্দ্ধমানে যাইতেন। তখন বৰ্দ্ধমান-রাজ-সংসারে ব্রাহ্মণের বিশেষ প্রতিপত্তি ও আদর ছিল। ব্রাহ্মণ ব্যতীত সাধারণ প্রজারাও স্বয়ং মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া অভাব অভিযোগ ও মর্ম্মবেদনা জানাইতে পারিত। আমাদের কৃষ্ণমোহনের রাজ-সংসারে বিশেষ খাতির ছিল, এমন কি, উচ্চতম রাজ-কর্ম্মচারীগণ কৃষ্ণমোহনকে বসিবার জন্য আসন ছাড়িয়া দিতেন। প্রবল-প্রতাপ বৰ্দ্ধমানরাজও কৃষ্ণমোহনকে সম্মানের সহিত আসন প্রদান করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বন্ধুভাবে ধর্ম্ম ও রাজকার্য্য বিষয়ের আলোচনা করিতেন। কৃষ্ণমোহনও এই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু জমীদারকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। ধার্ম্মিকহৃদয় হিন্দু মহারাজাধিরাজের

প্রাসাদে যখন সন্ধ্যার মঙ্গল-আরতির নহবৎ সপ্তম সুরে বাজিয়া উঠিত, কৃষ্ণমোহন ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া মহারাজের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন। মহারাজের পূর্ব্বের কীর্ত্তি-কলাপ, দেবালয় প্রভৃতি সকলই এখনও আছে, সকলই পূর্ব্বের ন্যায় চলিতেছে, কিন্তু সেই সন্ধ্যা-আরতি ও নহবতের সুরেও একটা যেন বিদেশী ছায়া পড়িয়াছে: যাউক সে কথা। আমরা এক্ষণে কৃষ্ণমোহনের শারীরিক সামর্থ্যের কথাই বলিতে বসিয়াছি।

একবার কৃষ্ণমোহন বৈষয়িক বিষয়ের মীমাংসার জন্য বর্দ্ধমান গমন করিয়াছেন। সারাবাটী গ্রাম হইতে বর্দ্ধমান প্রায় ৪০ মাইল অর্থাৎ ২০ ক্রোশ পথ। যেদিন কৃষ্ণমোহন শয্যাত্যাগ করিয়াই বর্দ্ধমানাভিমুখে রওনা হইতেন, সে দিন তিনি দিবা এক প্রহরের পূর্ব্বেই বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া স্নান ও সন্ধ্যা-আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া সেইখানেই জলযোগ করিতেন এবং রাজ-কাছারিতে কার্য্যাদি সারিয়া অপরাহ্ণে গৃহাভিমুখে রওনা হইতেন। বর্দ্ধমান হইতে গৃহে ফিরিতে রাত্রি ৪।৫ দণ্ডের অধিক হইত না। পাঠকপাঠিকাগণ, শয্যাত্যাগ অর্থে আজকালকার বাবুদের সূর্য্যোদয়ের ৮দণ্ড পরে এক পেয়ালা চা খাইয়া শয্যাত্যাগের কথা মনে করিবেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণমোহনের নিত্যক্রিয়ার মধ্যে এক প্রহর

রাত্রি থাকিতে শয্যাত্যাগ তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। কৃষ্ণমোহনের জলযোগের কথাটাও না বলিলে আপনারা হয়ত মনে করিতে পারেন, কৃষ্ণমোহন স্নানাদি করিয়া একটু হালুয়া বা দুটা ডিম বা আলুসিদ্ধ খাইয়া অম্লের উদ্গার তুলিয়া সিগারেট ধরাইতেন। কৃষ্ণমোহনের জলখাবারের ব্যবস্থা ভিন্নরূপ ছিল। যে দিন তিনি বর্দ্ধমান যাইতেন, সেই দিন কৃষ্ণমোহনের জননী সরু পরিষ্কার চাউল উত্তমরূপে বাছিয়া বন্ধন করিয়া দিতেন এবং সেই সঙ্গে পরিষ্কার ইক্ষু গুড় থাকিত। আমরা শুনিয়াছি, চাউলের পরিমাণ দুই সেরের কম হইত না এবং ইক্ষুগুড়ের পরিমাণ এক সেরের অধিক থাকিত। কৃষ্ণমোহন একখানি হাতে বুনানি মোটা চাদর স্কন্ধে ফেলিতেন—গামছা সহ চাউলগুলি কটিদেশে উত্তমরূপে বন্ধন করিতেন এবং একটি গেঁটে লাঠি বগলে লইয়া বর্দ্ধমানাভিমুখে রওনা হইতেন। জুতা কি বস্তু এবং ইহা কি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় তাহা তিনি কখনও জানিতেন না। তবে শুনিয়াছি, বিশেষ প্রয়োজন বুঝিলে তালপত্রের ছত্র কখন কখন ব্যবহার করিতেন।

আজ বিশেষ প্রয়োজনে কৃষ্ণমোহনের বর্দ্ধমানে অধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। তিনি বিশেষ ব্যস্ততার সহিত

কার্য্যাদি শেষ করিয়া যখন গৃহাভিমুখে রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন সর্ব্বমঙ্গলার গৃহে আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। কৃষ্ণমোহনের একবার সর্ব্বমঙ্গলাকে প্রণাম করিতে যাইবার ইচ্ছা হইল কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ জানিয়া সেইখানেই মনে মনে প্রণাম করিলেন। এইবার তিনি গামছাখানি কটিদেশে বন্ধন করিয়া চাদরখানি স্কন্ধদেশ ব্যাপিয়া বক্ষঃস্থলে যজ্ঞোপবীতের সঙ্গে জড়াইয়া ফেলিলেন এবং লাঠি গাছটি হাতে লইয়া—

এসেছি কোথায়, আবার যাইব কোথায়।
কি কার্য্য সাধিতে পিতা রেখেছ হেথায়॥

আপন মনে গাহিতে গাহিতে বায়ুবেগে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কৃষ্ণমোহন যখন পলাশনের মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ঘোর অন্ধকার রজনী, দুই পার্শ্বের বৃহৎ বৃক্ষাদিও অন্ধকারে দেখা যাইতেছে না। বর্দ্ধমান হইতে এই পথ বাহির হইয়া বেনারস রোডে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। পথটি নিতান্ত অপ্রশস্ত নহে; দুইখানি গরুর গাড়ী পাশাপাশি চলিয়া যাইতে পারে। পথের দুই পার্শ্বে ৩।৪ ক্রোশ ব্যাপিয়া মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। ৩।৪ ক্রোশের মধ্যে কোন গৃহস্থের বসতি নাই। পলাশনের মাঠ তখনকার

দিনে বিখ্যাত ছিল। সারাবাটীর পুরাতন চটি অপেক্ষা ইহার নাম ডাক নিতান্ত অল্প ছিল না। এখনও মাঝে মাঝে পলাশনের মাঠ হইতে কৃষকদের লাঙ্গলের অগ্রভাগে নরকঙ্কাল বাহির হইয়া পড়ে। তখন এমন দিন যাইত না—যে দিন এই পলাশনের মাঠে রক্তাক্ত নরদেহ পড়িয়া না থাকিত। অনেকে বলিয়া থাকেন, অন্য স্থানে নরহত্যা করিয়া ডাকাতগণ শবদেহ এই মাঠে আসিয়া ফেলিয়া যাইত। পলাশনের মাঠের নামে পথিকগণের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইত। যখন আমাদের কৃষ্ণমোহন এই মাঠ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন রজনীর অন্ধকারে সেই মাঠ আরও ভয়াবহ দেখাইতেছিল। এরূপ সময়ে এই পথ দিয়া যাহারা চলিত, তাহারা কৃষ্ণমোহনেরই ন্যায় সাহসী তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

২।৪ খানি গরুর গাড়ী মালপত্র লইয়া রাত্রিকালে এই রাস্তা দিয়া প্রত্যহ যাতায়াত করিত, কিন্তু আজ একখানি গরুর গাড়ীও কৃষ্ণমোহন দেখিতে পাইলেন না। ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি কখন জানেন না। যাহার হৃদয়ে বল আছে, তাহার আবার ভয় কিসের? কৃষ্ণমোহন নির্ভয়ে এই অন্ধকার রাত্রে ভগবানের রাজ্যের শৃঙ্খলা ও মানব-প্রকৃতি চিন্তা করিতে করিতে পথ হাঁটিয়া চলিতেছেন। কৃষ্ণমোহন পলাশনের মাঠের প্রায় ২

ক্রোশ অতিক্রম করিয়াছেন, আর এক ক্রোশ যাইতে পারিলেই বেনারস রোডে যাইয়া উঠিবেন। এই স্থান হইতে সারাবাটী গ্রাম চারি ক্রোশের অধিক নহে। কৃষ্ণমোহন আহ্লাদের সহিত চিন্তা করিতেছেন, কতক্ষণ পরে গৃহে পৌঁছিয়া জননীর চরণ দর্শন করিবেন। জননী হয়ত মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন, হয়ত তিনি এখনও আহার করেন নাই। ভৃত্য রামতনুও হয়ত অনাহারে সারাবাটীর মাঠে দাঁড়াইয়া আমার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতেছে। এই সমস্ত চিন্তা করিতে করিতে পবনবেগে পথ অতিক্রম করিতেছেন। কৃষ্ণমোহন বর্দ্ধমানে কখন আহার করিতেন না। কারণ তাঁহার অন্য স্থানে পাকাদি করিবার সুবিধা হইত না—অধিকন্তু জননীর কাছে বসিয়া আহার না করিলে তাঁহার আহারের তৃপ্তি হইত না। সদানন্দ কৃষ্ণমোহন এই সমস্ত চিন্তা করিতে করিতে আরও কিয়ৎদূর পথ অতিক্রম করিলেন। আর অর্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেই বেনারস রোডে উঠিবেন, এমন সময়ে রাস্তার দক্ষিণ দিক হইতে দুইটি লোকের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন। দুই একটি কথা কৃষ্ণমোহনের কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু তিনি কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কৃষ্ণমোহন ভাবিলেন, এত রাত্রে এরূপ স্থানে কে কথা কহিতেছে? তিনি একবার

স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু আর কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। মনের ভ্রম বিবেচনা করিয়া দুই পদ অগ্রসর হইয়াছেন, আবার অস্ফুট স্বর কৃষ্ণমোহনের বড়ই কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। তিনি বুঝিলেন, রাস্তার দক্ষিণ দিকে প্রায় ৫০।৬০ হাত দূরে একটি বৃহৎ বৃক্ষের তলদেশে কাহারা কথা কহিতেছে। কৃষ্ণমোহন বুঝিলেন, ইহারা পথিক নহে। পথিক হইলে সোজা পথ ছাড়িয়া ইহারা মাঠের মধ্যে বৃক্ষের তলে যাইয়া কথোপকথন করিবে কেন? তবে কি ইহারা কোন দুরভিসন্ধিসাধনের জন্য এই রাত্রিকালে এই ভীষণ মাঠের মধ্যে বৃক্ষের তলায় আশ্রয় লইয়াছে? করুণহৃদয় কৃষ্ণমোহন ভাবিলেন, নিজ জীবনের মমতায় এই ভীষণ স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত নহে, একবার দেখিয়া যাই, ইহারা কি মৎলবে এখানে কথোপকথন করিতেছে।

কৃষ্ণমোহন অতি সন্তর্পণে অন্য দিক দিয়া তাহাদের নিকট যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণমোহন ভাবিতে লাগিলেন, নিত্যই নররক্তে এই মাঠ রঞ্জিত হয়, অদ্য রজনীতেও বুঝি বা কাহার আয়ু শেষ হইয়াছে! হায় মানব! হেয় অকিঞ্চিৎকর অর্থের জন্য তোমরা নিত্য এই পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাক! জগতে অর্থই কি তোমাদের এত প্রিয় যে, জীবনের বিনিময়ে ক্ষুদ্র অর্থ

লইয়া দেহ, মন, আত্মা ও হস্ত কলুষিত করিবে? কৃষ্ণ মোহন বুঝিলেন যে, যদি তাহারা প্রকৃতই দস্যুদলের লোক হয়, তবে এস্থলে তাঁহার জীবন কখনই নিরাপদ নহে। কৃষ্ণমোহনের মনোমধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য এই কথা উদিত হইল বটে কিন্তু পর মুহূর্ত্তে আর তিনি এই কথায় মনোযোগ করিলেন না। ইহারা কে ইহাই জানিবার জন্য তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই পথে কৃষ্ণমোহন অনেকবার যাতায়াত করিয়াছেন বটে কিন্তু বামে বা দক্ষিণের মাঠের দিকে তিনি কখন যান নাই। এই বৃক্ষ কোন্ স্থলে অবস্থিত তাহাও তিনি জানেন না। পথ হইতে এই বৃক্ষের শীর্ষদেশ দেখিতে পাওয়া যায়—বৃক্ষ-সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত তাঁহার অভিজ্ঞতা। কৃষ্ণমোহন অন্ধকারে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে গমন করিতেছেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ ও কাঁটা গাছে পদে পদে বাধা পাইতেছেন। পদ-যুগল ছিন্ন হইয়া যাইতেছে—তথাপি তিনি অগ্রসর হইতে বিরত হইতেছেন না। বহুকষ্টে বহুদূর ঘুরিয়া রক্তাক্ত পদে তিনি সেই বৃক্ষের বিংশতি হস্ত পশ্চাতে যাইয়া একটি ঝোপের অন্তরালে আশ্রয় লইলেন। সেইস্থানটি অতি কদর্য্য ও দুর্গন্ধময়। পশ্চাতে ফিরিয়া অনুমানে বুঝিলেন একটি গো-কঙ্কাল পড়িয়া আছে এবং গো-অস্থি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কৃষ্ণমোহন বুঝিলেন, গৃহপালিত

পশ্বাদির মৃত্যু হইলে গৃহস্থগণ এই স্থানে পশুদেহ নিক্ষেপ করে। তিনি এদিকে আর মনোযোগ না দিয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। এই-বার কৃষ্ণমোহন বুঝিতে পারিলেন, তিনি যে দুই ব্যক্তির কথোপকথন হইতেছে অনুমান করিতেছিলেন, তাহা সত্য নহে। বৃক্ষতলে অনূ্যন ৮।১০ জন লোক বসিয়া নীরবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কৃষ্ণমোহন তাহাদের সকল কথা বুঝিতে বা শুনিতে পাইলেন না। তবে স্থূলত ইহাই বুঝিতে পারিলেন যে, ইহারা ভয়ঙ্কর দস্যু এবং ইহাদেরই দল বা দলের লোকে এই পলাশনের মাঠে ও সারাবাটীর পুরাতন চটীতে পথিকের প্রাণসংহার করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। ইহারা যে নানাদেশে ডাকাতি করিয়াও অর্থ সংগ্রহ করে, কৃষ্ণমোহন তাহাদের কথাবার্ত্তার ভাব-ভঙ্গিতে বেশ বুঝিতে পারিলেন। যে ব্যক্তি দলের অন্যান্য ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিতেছে, কৃষ্ণমোহন তাহাকে দল-পতি বা ডাকাতের সর্দ্দার বলিয়া অনুমান করিলেন। দলপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি ঠিক সংবাদ পাই-য়াছ, সারাবাটীর চটি হইয়া গরুর গাড়ী যাইবে?" একজন উত্তর করিল, "ইহাই ঠিক সংবাদ। এই সংবাদের উপর বিশ্বাস করিয়া কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া ফেল—বিলম্বের সময় নাই।"

সর্দ্দার। তোমরা কে কে গাড়ির পশ্চাতে থাকিতে চাও?

একজন। আমাদের ৩ জনকে গাড়ির পশ্চাতে যাইতে হুকুম কর।

সর্দ্দার। তাহাই হউক! অপর সকলে সারাবাটীর চটিতে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।

একজন। সারাবাটীর চটীতে উপস্থিত হইতে বোধ হয় রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইবে। গাড়ীর গরু দুটা বড়ই রোগা।

সর্দ্দার। তবে কি পথেই কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিবে?

২।৩ জন একেবারে বলিয়া, উঠিল তা কি করিয়া হইতে পারে। সেই সেদিনকার মত একটু চীৎকারেই গ্রামের লোক দৌড়িয়া আসিবে। গ্রামের পর গ্রাম, চারিদিকেই লোকের বসতি, একটু গোলমাল হইলেই শীকার হাত ছাড়া হইয়া যাইবে, শেষে পলাইবারও উপায় থাকিবে না। হয়ত ধরা পড়িতে হইবে।

সর্দ্দার। তবে সারাবাটীর চটিতেই প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। রাত্রি তৃতীয় প্রহর হইলেও কার্য্য উদ্ধারের বিঘ্ন ঘটিবে না।

একজন। আমরা তিনজনে তবে কোথা হইতে গাড়ির পশ্চাৎ লইব?

সর্দ্দার। বলরামপুরের খাল হইতে গাড়ির পশ্চাৎ লইলেই চলিবে।

একজন। এখন রাত্রি কত হইয়াছে বলিয়া অনুমান কর?

সর্দ্দার। বোধ হয় রাত্রি দেড় প্রহর হইয়াছে।

একজন। তাহা হইলে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। এতক্ষণ বোধ হয় গাড়ী পারুলের মাঠে উপস্থিত হইয়াছে।

সর্দ্দার। গাড়ির কে সন্ধান আনিল?

একজন। আজ্ঞে আমি সন্ধ্যার পর জাহানাবাদের নদীতে তাহাদিগকে দেখিয়া আসিয়াছি। গাড়োয়ানের কাছে তামাক খাইতে গিয়া সন্ধান লইয়াছি—গাড়োয়ান বলিল, সমস্ত রাত্রি গাড়ী চালাইবে, মেয়েটার স্বামীর কঠিন পীড়া। প্রভাতেই বৈদ্যবাটী পঁহুছিবার জন্য গাড়োয়ান অতি দ্রুতভাবেই শকট চালাইতেছে।

সর্দ্দার।—কার্য্য শেষ হইলে তুমিই অগ্রে পুরস্কৃত হইবে। আর বিলম্ব না করিয়া বন্দোবস্ত মত কার্য্য কর। আমি সারাবাটীর চটিতে যাইয়া মিলিত হইব। সর্দ্দারের আজ্ঞামতে একদিকে ৩ জন অপর দিকে ৬।৭ জন পবন-বেগে চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সর্দ্দারও বাম দিকের মাঠ ধরিয়া অন্ধকার মধ্যে কোথায় মিশিয়া গেল।

কৃষ্ণমোহন চক্ষের সম্মুখে লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত

হইতেছে শ্রবণ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন! ক্রোধে, ঘৃণায় ও দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিলেন। করযোড়ে ভগবানকে বলিলেন,—হে দয়াময়! হৃদয়ে বল দিন। অনাথা স্ত্রীলোকের সাহায্যের জন্য আমায় নিযুক্ত করুন। স্ত্রীলোকটির স্বামীর কঠিন পীড়া! কে সে স্ত্রীলোক? কল্যই বৈদ্যবাটীতে উপস্থিত হইবে। হায় হতভাগিনী, এজনমে তুমি আর বৈদ্যবাটীতে উপস্থিত হইতে পারিবে কি না ভগবানই জানেন। কেন এই দুর্গম পথে রাত্রিকালে বাহির হইয়াছে? মেয়েটির কি আত্মীয় বন্ধু কেহই ছিল না যে, এরূপ দুর্গম পথে রাত্রিকালে বাহির হইতে নিষেধ করে। শকটচালক, তুমিই বা দস্যুর কাছে কেন বলিলে, সমস্ত রাত্রি গাড়ি চালাইব। কৃষ্ণমোহন ব্যাকুলচিত্তে কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া এই সমস্ত কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কৃষ্ণমোহনের চমক ভাঙ্গিল। পিতার অন্তিমবাক্য মনে পড়িল। ভাবিলেন এখানে আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করা উচিত নহে। কঠোর কর্ত্তব্য সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। নির্ম্মম নিষ্ঠুর দস্যুর হস্তে এখনই একটি অনাথা স্ত্রীলোকের জীবলীলা শেষ হইবে। ইহার স্বামী হয়ত এই স্ত্রীরত্নের জন্য রোগশয্যায় ছটফট করিতেছেন,—মনে করিতেছেন, আমার স্ত্রী

আসিয়া এখনই শিয়রে বসিবে। স্বামীপরায়ণা কুললক্ষ্মী পতির পীড়ার সংবাদে না জানি কতই ব্যাকুলা হইয়া স্বামী সন্দর্শনের আশায় জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া এই ভীষণ পথে রাত্রিকালে বাহির হইয়াছেন। ভগবন্! তুমিই অনাথার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কৃষ্ণমোহন নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া পবনবেগে দৌড়িতে লাগিলেন। কৃষ্ণমোহন দৌড়াইতে দৌড়াইতে একবার পড়িয়া গেলেন; আবার উঠিলেন—আবার পড়িয়া গেলেন। বারবার পদে আঘাত পাইলেও কৃষ্ণমোহনের দৌড়াইবার বিরাম নাই। এইবার কৃষ্ণমোহন দৌড়িতে দৌড়িতে সময়ে সময়ে লম্ফ প্রদান করিয়া চক্ষুর নিমিষে ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে চারি দণ্ডের পথ পশ্চাতে ফেলিয়া কৃষ্ণমোহন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণমোহন তুমিই পিতার সুসন্তান! আর ধন্যা তোমার জননী, যিনি এমন রত্ন গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন।

——

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মথুরাবাটী একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামের এখন চিহ্নমাত্রও নাই। তখন কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, দুই ঘর বৈষ্ণব, প্রায় কুড়ি ঘর নবশাক জাতীয় শূদ্র ও দুলে বাগ্দীর বসবাস ছিল। মতিলাল গাঙ্গুলী নামক একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা তত ভাল ছিল না। জমি-জমাদি কিছুই ছিল না, বাগান বা পুষ্করিণী ছিল না—ছিল কেবল একটু নিস্কর ভদ্রাসন। মতিলাল গাঙ্গুলী একখানি খড়ের চালের শয়ন-ঘর, একখানি ভাঁড়ার ঘর, একখানি রন্ধনের জন্য ছোট ঘর, একটী গোশালা। এই গোশালায় মতিলালের একটী গাভী থাকিত। মতিলালের সংসারের মধ্যে অষ্টাদশ বর্ষীয়া পত্নী শরৎকুমারী ও একটী বৃদ্ধা চাকরাণী ছিল। এই চাকরাণীটি মতিলালের পিতার সময় হইতে ইহাঁদের গৃহে আছে—শরৎকুমারী ইহাকে মা বলিয়া ডাকে। মতিলালের পিতা যখন পুত্রের বিবাহ দিয়া শরৎকুমারীকে ঘরে আনিলেন, ক্ষীরদা চাকরাণী অগ্রে গিয়া শরৎ-

কুমারীকে "এস আমার মা লক্ষ্মী, ঘরে এস" বলিয়া পাল্কী হইতে নববধূকে বুকে করিয়া ঘরে লইয়া আসিলেন। সেই হইতে ক্ষীরদা শরৎকুমারীকে নিজ কন্যা অপেক্ষাও স্নেহ করিয়াথাকে। ক্ষীরদার আপনার বলিতে ইহ-জগতে আর কেহ ছিল না। শরৎকুমারী ও মতিলালকেই সে আপনার করিয়া লইয়াছিল। শরৎকুমারী ও মতিলাল ক্ষীরদাকে মাতার ন্যায় মনে করিয়া কার্য্য করিতেন। প্রকৃতই ইহাদের পরস্পরের ভালবাসা ও স্নেহমমতা পুত্র-কন্যা ও জননীর স্নেহমমতা অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। মতিলালের পিতার বৈদ্যবাটীর বাজারে একখানিমুদির দোকান ছিল। দোকানখানি বহু দিনের স্থাপিত এবং ইহার আয়ও মন্দ ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর মতিলাল এই দোকানখানি চালাইতেছেন। মাসে মাসে ক্ষীরদা ও শরৎকুমারীকে খরচ পাঠাইয়া দেন, নিজে সময়ে সময়ে বাটীতে গিয়া ৩।৪ দিন করিয়া থাকেন। মতিলাল যদি কখন ভুলিয়া কাহাকেও একটু জিনিস কম দিয়া ফেলিতেন কিম্বা খরিদ্দারের ঝনঝটের সময় কাহার নিকট দুই-কড়া অধিক লইতেন তবে সে দিন মতিলালের মনকষ্টের সীমা থাকিত না। মতিলাল খরিদ্দারের প্রাপ্য ফিরাইয়া না দিলে তাঁহার আহার নিদ্রায় সুখ হইত না।

মতিলাল ইচ্ছা করিলে মাসে ২।১ বার বাটী যাইতে পারিতেন কিন্তু শরৎকুমারীর ভয়ে যাইতে পারিতেন না। মতিলালের ইচ্ছা—মাঝে মাঝে বাটী গিয়া শরৎকুমারীকে দেখিয়া আসেন। তাহার সেই সরলতাপূর্ণ মুখখানির দুইটি কথা শুনিয়া বিরহ-ব্যথার লাঘব করেন—কিন্তু কর্ত্তব্যচ্যুত হইবার ভয়ে যাইতে পারিতেন না। শরৎ-কুমারীর প্রধান দোষ—মতিলাল গৃহে গমন করিলে ৩।৪ দিনের কম বৈদ্যবাটী ফিরিতে পারিতেন না। প্রাতে নয়, অপরাহ্নে যাইবে—আজ নয়, কাল যাইবে—এইরূপ ৩।৪ দিন বিলম্ব করিয়া শরৎকুমারীর কথা রক্ষা করিতে হয়। এইজন্য মতিলালকে দোকানের বন্দোবস্ত করিয়া ২।১ মাস পরে বাটি যাইতে হইত। ইহাতে শরৎকুমারী কত কাঁদিত, পায়ে ধরিয়া কতবার অনুরোধ করিত, কিন্তু মতিলাল গৃহে আসিতে পারিতেন না।

একবার মতিলাল একদিনের জন্য গৃহে আসিয়াছেন। শরৎকুমারীর অনুরোধ ও কান্না কাটিতে তিন দিন অতীত হইয়া গিয়াছে, অদ্য বৈদ্যবাটী না গেলেই নয়। তিন দিন দোকান বন্ধ আছে, ক্রেতারা অন্য দোকানে গিয়া জিনিস ক্রয় করিবে, ইহাতে মতিলালের দোকানের বিশেষ ক্ষতি হইবে। মতিলাল শরৎকুমারীর দক্ষিণ বাহু নিজ বক্ষঃস্থলে টানিয়া লইয়া গণ্ডস্থলে একটি

চুম্বন করিয়া বলিলেন, "শরৎকুমারী! তুমি কি বুঝিতেছ না, সেই দোকানখানিই আমাদের ভরণপোষণের এক-মাত্র অবলম্বন?" শরৎকুমারী বলিল,—"স্বামিন্! তাহা জানি, আরও জানি, দোকানখানি না থাকিলে আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।"

মতিলাল। তবে কেন শরৎ! তুমি আমাকে বার-বার গমনে বাধা দিতেছ?

শরৎ। কেন বাধা দিতেছি, তাহা জানি না। তবে ইহা জানি, আপনি বৈদ্যবাটী না গেলে আনন্দের হাসি হাসিয়া আমি অনাহারে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি।

মতিলাল। তবে কি শরৎ, তুমি আমাকে বৈদ্যবাটী যাইতে নিষেধ করিতেছ?

শরৎ। আপনি কি আমার নিষেধ শুনিবেন? দয়া করিয়া যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে আমি বলিব—স্বামিন্! দয়াময়! এ দাসীকে ছাড়িয়া বৈদ্য-বাটী যাইবেন না। কষ্ট! কিসের কষ্ট? আমি চির-জীবন অনাহারে ছিন্নবস্ত্রে থাকিয়া যদি আপনাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাই, যদি নিত্য আপনার চরণসেবা করিতে পারি, তবে আমাপেক্ষা জগতে আর সুখী কে?

মতিলাল। শরৎ, তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী

দেবী! তুমি আমার গৃহের লক্ষ্মী! তোমার কষ্ট দেখিবার পূর্ব্বে আমার যেন মৃত্যু হয়। আমি নিজের সহস্র কষ্ট অকাতরে সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার কষ্টের কথা মনে হইলেও হৃদয় ফাটিয়া যায়। শরৎ! তুমি জান না,আমি তোমাকে ছাড়িয়া কি কষ্টে বৈদ্যবাটীতে থাকি! হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে লুকাইয়া—মনের আগুন মনে চাপিয়া—নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়া তোমার নিকট হইতে বিদায় লই, সে কেবল সাংসারিক অভাবের জন্য। তোমার প্রেমময়ী মূর্ত্তি দিবারাত্র আমার চক্ষের সমক্ষে জাগিয়া থাকে। আমি যে সহস্র বৃশ্চিক-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বৈদ্যবাটীর দোকানে পড়িয়া থাকি, সে কেবল শরৎ তোমার জন্য, তোমার সুখের জন্য, তোমার সংসারের কথঞ্চিৎ কষ্ট লাঘবের জন্য।

শরৎ। স্বামী, দেবতা, গুরু, হৃদয়েশ্বর! আমি আপনাকে পতিরূপে পাইয়া যে সুখে আছি, সংসারের যাবতীয় অভাব, কষ্ট, দারিদ্র্য যদি একত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, তথাচ আমাকে এই স্বর্গসুখ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। এই দাসীর জন্য আপনি কেন কষ্ট করেন প্রভু?

মতিলাল। হৃদয়েশ্বরি, তুমি আমার জন্য সকল কষ্টই সহ্য করিতে পার সত্য কিন্তু এই হতভাগ্যের সংসারে

আসিয়া দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করিবে, ইহা আমি কেমন করিয়া জীবন থাকিতে দেখিব? তাই তোমাকে ছাড়িয়া বৈদ্য-বাটীতে থাকিতে হয়।

শরৎকুমারী। নাথ, তুমি বৈদ্যবাটীতে থাকিলে সদাই তোমার জন্য আশঙ্কা হয়। মনে হয়, তুমি বুঝি পীড়ায় ছট্‌ফট করিতেছ, মনে হয়, তোমার বুঝি কোন বিপদ ঘটিয়াছে, এই সব কুচিন্তাতে আমার মন আরও অস্থির হইয়া পড়ে।

মতিলাল হাসিয়া বলিলেন,—"শরৎ, তুমি কি এখনও ছেলেমানুষ আছ? তুমি এখন বড় হইয়াছ, তোমার জ্ঞান বুদ্ধি হইয়াছে, বালিকার ন্যায় বৃথা চিন্তা করিয়া কেন নিজের মনে অশান্তি আনিয়া শরীর মাটী কর? ভগ-বানের নিকট প্রার্থনা কর, যদি কারবারে কখনও উন্নতি লাভ হয়, তবে তোমাদিগকেও বৈদ্যবাটীতে লইয়া গিয়া একসঙ্গে বাস করিয়া সুখী হইব—উভয়ে উভয়ের মুখ দেখিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিব। তোমাকে এই সব বৃথা চিন্তায় দেহ মাটী করিতে হইবে না।"

শরৎকুমারী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভগবান্ কি এমন দিন দিবেন?"

এই ক্ষুদ্র পরিবারটির একপ্রকার সুখশান্তিতেই দিন কাটিতেছিল। শরৎকুমারী ও মতিলাল পবিত্র দাম্পত্য-

প্রেমের বন্ধনে উভয়ে উভয়কে বাঁধিয়া, বিরহ-মিলনে, পরস্পর পরস্পরের পবিত্র চিন্তায় এক প্রকার সুখস্বচ্ছন্দেই দিন কাটাইতেছিল। ভগবানের রাজ্যে যদি সকলই চিরস্থায়ী হইত, তবে বুঝি জগৎ চলিত না। যে সুখী, সে যদি চিরদিন সুখেই জীবন কাটাইত, দীনব্যক্তি যদি চিরদিন দুঃখ-যন্ত্রণাই ভোগ করিত, রোগী যদি রোগ ভোগ করিয়াই ধরাধাম হইতে গমন করিত, জ্যোৎস্না বা অন্ধকার যদি চিরকালই একভাবে জগৎপৃষ্ঠে ব্যাপিয়া থাকিত, সুস্থকায় সবল ব্যক্তি যদি চিরজীবন নিরাময় হইয়া ও বলবান দেহ লইয়া ধরাধামে বিচরণ করিতে পারিত, যৌবন যদি চিরকালের মধ্যে বার্দ্ধক্যে পরিণত না হইত, তাহা হইলে কে বলিতে পারে, জগৎ চলিত কি না? আমরা নিত্য চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি— ভগবানের রাজ্যে প্রতি নিমিষে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আজ যিনি অর্থের গৌরবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছেন, কাল তিনি হয়ত উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আজ যিনি নীরোগ ও সবল দেহ লইয়া ঘুরিতেছেন, কাল হয়ত দেখিতে পাইবে, সেই ব্যক্তি রোগ-শয্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। আজ যিনি সামান্য অর্থের জন্য লালায়িত, কাল তিনি বহু অর্থের অধিপতি। ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব আমরা

সংসারে এই প্রহেলিকা বুঝিতে পারি এরূপ সাধ্য আমাদের নাই। বুঝিতে পারি না বলিয়াই মতিলাল ও শরতের বিপদ সম্মুখীন ভাবিয়া প্রাণে কষ্টানুভব করিতেছি।

একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আমাদের অষ্টাদশ-বর্ষীয়া শরৎকুমারী স্নান করিয়া আসিয়া রন্ধন করিতে-ছেন। শরৎকুমারীর অলঙ্কারের মধ্যে হাতে দুইগাছি শাঁখা ও কয়েকগাছি রূপার চুড়ি, কর্ণে দুইটি ছোট মাক্‌ড়ি। পরিধানে একখানি ছোট মোটা কাপড়। ক্ষীরদা সূতা কাটিয়া এই কাপড়খানি কয়েক দিন পূর্ব্বে বুনিয়া দিয়াছেন। শরৎকুমারী শ্যামবর্ণা সুন্দরী, মুখ-খানি যৌবন-সুলভ কমনীয়তা ও সরলতায় পূর্ণ। পরের দুঃখের কথা শুনিলে শরৎকুমারীর চক্ষু দিয়া টস্‌-টস্‌ করিয়া জল পড়িতে থাকে। ক্ষীরদা এজন্য অনেক সময় হাসিতে হাসিতে বলিত, শরৎ, তোমার সব ভাল কিন্তু চক্ষু দুটি অত পান্‌সে কেন? শরৎ বলিত, কি জানি মা! পরের দুঃখ শুনিলে আমার প্রাণটা যেন কাঁদিয়া উঠে। শরৎকুমারীর মুখে কেহ কখন একটি রূঢ়কথা শুনে নাই। পাড়ার ছোট ছেলেরা শরৎকুমারীর ক্রোড়ে উঠিলে তাহা-দের জননীর ক্রোড়েও যাইতে চাহিত না। কাহারও অসুখের কথা শুনিলে শরৎকুমারী ছুটিয়া দেখিতে যাইত। ক্ষীরদা তিরস্কার করিয়া বলিত, বউমানুষ হইয়া যেখানে

সেখানে কি করিয়া যাইতে চাও? এক এক সময় প্রতিবাসীদের অসুখের কথা শুনিয়া শরৎকুমারী রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিতে যাইবার জন্য এতই অনুরোধ মিনতি করিত যে, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্ষীরদা শরৎকুমারীকে লইয়া প্রতিবাসীর গৃহে না যাইয়া থাকিতে পারিত না। শরৎকুমারী যতক্ষণ প্রতিবাসীর গৃহে থাকিত, কখন রোগীর মাথায় হাত বুলাইত, কাহার সাগু, কাহার গরম জল যাহা হয় একটা কার্য্য না করিতে পারিলে শরৎকুমারীর কষ্ট হইত। শরৎকুমারী আজ রন্ধনশালায় রন্ধন করিতে গিয়া রন্ধনে মনোযোগ দিতে পারিতেছেন না, একবার মনে করিলেন, আজ আর রাঁধিব না। আবার ভাবিলেন, আমার সঙ্গে মা কেন উপবাস করিয়া কষ্ট পাইবে। ক্ষীরদার যদি আহারের একটা ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় আজ শরৎকুমারী কেবল শয্যায় পড়িয়া কাঁদিত। শরৎকুমারীর আজ রন্ধনের ইচ্ছা নাই, কাহারও সহিত কথা কহিতে ভাল লাগিতেছে না, শরৎকুমারীর হৃদয়ে কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছে। শরৎকুমারী সেই রন্ধনশালাতেই অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলেন। শরৎকুমারীর চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল।

"শরৎ! তুই চুল শুকাইলি না, ভিজা মাথায় অসুখ করিবে যে?"

একটু বিরক্তভাবে ক্ষীরদা এই কথা বলিয়া রন্ধন-গৃহে প্রবেশ করিল। শরৎকুমারী মনের যন্ত্রণা গোপন করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। শরতের মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীরদা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন শরৎ, তোর মুখ অত ভার কেন? একি! কাঁদ্‌ছিস না কি? তোর চক্ষু দিয়া যে জল পড়িতেছে? কি হইয়াছে শরৎ? কিছু অসুখ করে নাই ত?"

শরৎকুমারী উত্তর করিল,—"না মা, আমার কোন অসুখ করে নাই।"

ক্ষীরদা। নিশ্চয়ই তোর কিছু হইয়াছে? তোর মুখ দেখিয়া আমার বড় ভয় হইতেছে, তোর মনে কি কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, আমায় প্রকাশ করিয়া বল্?

শরৎ। মা! আমার আজ কিছুই ভাল লাগিতেছে না, যেন প্রাণের ভিতর হুহু করিতেছে।

এইবার ক্ষীরদাও কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"কেন শরৎ, তোর মন আজ অমন করিতেছে?"

শরৎকুমারী বলিল,—"মা! আমার মনে হইতেছে, যেন বৈদ্যবাটীতে তোমার ছেলের কোন অমঙ্গল হইয়াছে।"

এইবার ক্ষীরদা আশ্বস্ত হইয়া বলিল,—"দূর পাগলী মেয়ে! অমন কথা বলিতে আছে? তুই নিজের মনে

ভাঙ্গাগড়া করিয়া একটা প্রলয় ব্যাপার করিস্! বালাই! অমন কথা তোর মুখে আর কখন যেন বাহির না হয়। আজ দশদিন হয় নাই—বৈষ্ণব দিদি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে ছেলে আমার কত কথা বলিয়া দিয়াছে। আর পাঁচদিন পরে ছেলে ঘরে আসিবে, তুই কেন আমার ছেলের অমঙ্গল কামনা করিতেছিস্? ছেলের আমার যদি অসুখ বিসুখ হইত, ছেলে ঘরে চলিয়া আসিত। তুই আরও একদিন স্বপ্ন দেখিয়া এইরূপ কাণ্ড করিয়াছিলি।" ক্ষীরদা এই বলিয়া শরৎকুমারীকে নানারূপ তিরস্কার করিতে লাগিল।

শরৎকুমারী একটু শান্ত হইল বটে কিন্তু তাহার মনের খট্‌কা গেল না।

বেলা আড়াই প্রহর অতীত হইল। শরৎকুমারী ও ক্ষীরদা আহার করিতে বসিয়াছে। ক্ষীরদা একগ্রাস অন্ন মুখে তুলিতে যাইতেছে, শরৎকুমারী এখনও অন্নে হাত দেয় নাই—ক্ষীরদার অন্নাদি কিছু চাই কি না জিজ্ঞাসা করিতেছে। এমন সময় একটী অপরিচিত লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মা-ঠাকরুণ, ইহাই কি মতিলাল গাঙ্গুলীর বাড়ী?" শরৎকুমারী তাড়াতাড়ি অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষীরদা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? হাঁ, ইহাই মতিলালের বাড়ী।"

আগন্তুক উত্তর করিল, "আমি বৈদ্যবাটী হইতে আসিতেছি, গাঙ্গুলি মহাশয়ের ৫।৬ দিন হইল জ্বর হইয়াছে, বৌ-ঠাকুরাণী ও মাকে যাইতে হইবে। আপনিই কি তাঁর মা ?"

"হাঁ বাবা ! আমিই মতির মা !"

ক্ষীরদার মুখে কথা বাহির হইতেছে না। ক্ষীরদা মাটির উপর বসিয়া পড়িল।

পাঠক পাঠিকাগণ শরৎকুমারীর কি অবস্থা হইল তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না।

শরৎকুমারীর মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে আমরা এখানে অশক্ত। শরৎকুমারী স্বামীর অসুখের কথা শুনিয়া থর থর করিয়া কাঁপিয়া জগৎ অন্ধকার দেখিলেন ; শরৎকুমারী ভাবিতেছেন, আমি কি জীবিতা না মৃতা ? স্বামীর পীড়ার কথা শুনিবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইল না কেন ? কেন আমি এখনও বাঁচিয়া আছি ? আমি কি করিয়া স্বামীর কাছে যাই ? এমন কি কোন উপায় হইতে পারে না যে, এই মুহূর্ত্তেই গিয়া স্বামীর চরণ দুইখানি ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে পারি। স্বামী ! দেবতা ! তুমি সেখানে পীড়ার যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছ—আর আমি তোমার এই হতভাগিনী স্ত্রী এখনও এখানে পড়িয়া আছি ! নাথ ! আমার বুক যে ফাটিয়া যাইতেছে,

কখন তোমার চরণ দুইখানি বক্ষে লইব? শরৎকুমারী রন্ধনশালায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারী কখন অজ্ঞান হইয়া যাইতেছেন, কখন বা জ্ঞান হইতেছে। একটু জ্ঞান হইতেই উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিতেছেন, পরমুহূর্ত্তে আবার পড়িয়া যাইতেছেন।

ক্ষীরদা কতক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর মাটী ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মতির অসুখের কথা শুনিয়া ক্ষীরদার বল সামর্থ্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ক্ষীরদার বুকের স্পন্দন যেন ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। ক্ষীরদা ধীরে ধীরে আগন্তুকের নিকট গমন করিয়া সমস্ত সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহাকে কে পাঠাইয়াছে কয়দিন জ্বর হইয়াছে; চিকিৎসা হইতেছে কি না, আসিবার সময় মতি কি বলিয়া দিল, কাহাকে যাইতে বলিল ইত্যাদি একটি একটি করিয়া সমস্ত সংবাদ লইতে লাগিল। ক্ষীরদা সমস্ত কথা শুনিয়া বুঝিলেন, জ্বরটা শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আমাদের বিশেষতঃ শরতের যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর বিলম্ব করাও বিধেয় নহে। ক্ষীরদা শরৎকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, শরৎ অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। ক্ষীরদা নানারূপ শুশ্রূষা করিয়া শরৎকে উঠাইল। শরৎ ক্ষীরদার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্ষীরদা বলিল,—"মা শরৎ, কাঁদিও না, ভগবান

মতিকে আমার ভাল করিয়া দিবেন, অসুখ সকলেরই হইয়া থাকে, তাহার জন্য ভাবনা কি মা?" শরৎ বলিল, "মা! এখন বৈদ্যবাটী যাইবার কি বন্দোবস্ত করিলে?" ক্ষীরদা বলিল, "মা শরৎ! আমি সেই কথাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি! যদি এখনই বাহির হওয়া যায়, তবে সমস্ত রাত্রি চলিয়া প্রত্যুষেই বৈদ্যবাটী পৌঁছিতে পারিব? কিন্তু মা শরৎ! পথ অতিশয় দুর্গম, সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি, তোমাকে লইয়া কি করিয়া বাহির হই! আর এত পথ তুমি চলিয়া যাইতে পারিবে কি মা? যদি গরুর গাড়ী পাই, তবেই সুবিধা, নচেৎ কি করিব মা, আমি ত আকাশ পাতাল ভাবিতেছি!" শরৎকুমারী বলিল,—"মা, তুমি শীঘ্রই একখানি গরুর গাড়ীর চেষ্টা কর। যদি একান্তই গরুর গাড়ী না পাও, তবে চল আমরা বাহির হই। আমি নিশ্চয়ই চলিয়া যাইতে পারিব, মা! আমার জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। যদি চলিতে না পারি, পথে যদি মৃত্যু হয়, সেও আমার পক্ষে মঙ্গল।"

"অধীর হইও না মা শরৎ! আমি এখনই যে স্থানে পাই গরুর গাড়ী লইয়া আসিব।" এই বলিয়া ক্ষীরদা গরুর গাড়ীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইল।

পাঠকপাঠিকাগণ! আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি,

তখন রেলগাড়ীর নামগন্ধও এ দেশে ছিল না। গয়া, কাশী প্রভৃতি তীর্থ স্থানে লোক পদব্রজে গমন করিত, দশদিনের পথ হইতে নরনারী পদব্রজে আসিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া যাইত। মথুরাবাটী হইতে বৈদ্যবাটী ২০ ক্রোশ পথ। সকলেই পায়ে হাঁটিয়া বৈদ্যবাটী যাতায়াত করিত। কেহ কেহ ইচ্ছা করিলে গরুর গাড়ীতেও যাইত।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্ষীরদা একখানি গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া শরৎকুমারীর নিকট উপস্থিত হইল। শরৎকুমারী কখন পদব্রজে বৈদ্যবাটী গমন করিবার জন্য মনকে দৃঢ় করিতেছেন, পরক্ষণে আবার স্বামীর জন্য উন্মাদিনী। শরৎকুমারী ভাবিতেছেন, কখন পথের বাহির হই নাই—বৈদ্যবাটী পর্য্যন্ত কি করিয়া হাঁটিয়া যাইব? আবার হৃদয় ও মনকে দৃঢ় করিয়া বলিতে লাগিলেন—এখন আবার আমার লজ্জা, সম্ভ্রম, মান, অপমান কি? আমার হৃদয়েশ্বর রোগ-শয্যায় শায়িত—আর আমি পথের বাহির হইবার জন্য ভয় করিতেছি? আমি যতই গৃহে বিলম্ব করিতেছি, ততই আমার দেবতার নিকট অপরাধী হইতেছি। মা আসিলেই বাহির হইব, পথে মৃত্যু হয় সেও আমার পক্ষে মঙ্গল। গরুর গাড়ী দেখিয়া শরৎকুমারী মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন। ভাবিলেন, যে কোন উপায়েই হউক, প্রভাতে বৈদ্যবাটী পৌঁছিব। শরৎকুমারী ক্ষীরদাকে

বলিল, মা! আর কেন বিলম্ব করিতেছ. শীঘ্র বৈদ্যবাটীর লোককে ডাকিয়া—এস আমরা গাড়ীতে উঠি। শরৎকুমারীর সামান্য যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, অঞ্চলে বাঁধিয়া লইলেন। দুই একখানি রূপার অলঙ্কার ছিল লইতে ভুলিলেন না, ভাবিলেন, স্বামীর চিকিৎসায় লাগিতে পারে।

শরৎকুমারী গাড়োয়ানের সম্মুখে আসিয়া রুদ্ধকণ্ঠে আকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি আমার পিতা! আমি তোমার অভাগিনী কন্যা। তোমাকে কি দিয়া সন্তুষ্ট করিব? কন্যার মিনতি এই বাবা!—তুমি যেরূপে পার সমস্ত রাত্রি গাড়ী চালাইয়া কল্য প্রভাতে আমাদিগকে বৈদ্যবাটীতে পৌঁছিয়া দিও। তুমি ত সকলই শুনিয়াছ বাবা,—আমার স্বামী বৈদ্যবাটীতে কঠিন জ্বরে শয্যাগত। তোমার এই উপকারের ঋণ যদি জীবনে কখন পরিশোধ করিতে পারি, তবে তোমার কন্যার জীবন সার্থক হইবে।"

শরৎকুমারী এখন লজ্জাশীলা কুলবধূ নহে। শরৎকুমারী এখন স্বামীর জন্য পাগলিনী। লজ্জা, ভয়, মান, অপমান শরৎকুমারীর কোমল হৃদয় হইতে আজ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

জহিরউদ্দিন গাড়োয়ান শরৎকুমারীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিল,—"মা! আমি যেরূপে পারি তোমাকে কাল

বেলা ৪ দণ্ডের ভিতর বৈদ্যবাটী লইয়া যাইব। তুমি আমাকে বাবা বলিয়াছ, আমার বড় জোর কপাল যে, তোমার মত একটি সুন্দর টুক্‌টুকে মেয়ে আমার বরাতে আজ লাভ হইল। আমি মূর্খ মুসলমান গাড়োয়ান, তুমি মা সতীলক্ষ্মী ব্রাহ্মণের কন্যা; তোমায় কন্যারূপে পাইয়া আমি ধন্য হইলাম।" স্নেহে জহিরউদ্দিনের চক্ষু দুইটি ছল ছল করিতে লাগিল। ক্ষীরদা ও শরৎকুমারী আর বিলম্ব না করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। জহিরউদ্দিন বৈদ্যবাটীর লোকটীকে নিজের একপার্শ্বে বসিবার স্থান করিয়া দিয়া নিজেও স্বস্থানে উঠিয়া বসিল।

জহিরউদ্দিন গরুদুটীর পৃষ্ঠে স্নেহভরে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "দেখিস্ বাবা! নিমক্‌হারামি করিস্ না, আমার মান রক্ষা করিস্।" এই বলিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গরু দুইটি পবন-বেগে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। শরৎকুমারীর প্রাণ মন বহু পূর্ব্বে বৈদ্যবাটীতে স্বামীর পদতলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কেবল দেহটা গাড়ীর মধ্যে একপার্শ্বে পড়িয়া রহিল।

মথুরাবাটী হইতে জাহানাবাদের নদী প্রায় ১৪ মাইল পথ। এই নদী পার হইয়া বেনারস রোডে উঠিতে হয়। শরৎকুমারীর গাড়ী যখন জাহানাবাদের নদী পার হইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জহিরউদ্দিন গরু

ঘুটাকে এই নদীতে জলপান করাইতে লাগিল। সারা-বাটীর চটি ব্যতীত পথে আর কোথাও জল পাইবার উপায় নাই। জহিরউদ্দিন বলিল,—"মেয়ে! তোমরাও এই-খানে হাত মুখ ধুইয়া নদীর একটু জল মুখে দাও, পথে আর কোথাও জল পাইবার উপায় নাই।" এই বলিয়া ঘোড়া দুটী ছাড়িয়া দিয়া জহিরউদ্দিন একটু তামাক খাইবার যোগাড় করিতে লাগিল। শরৎকুমারী ক্ষুৎপিপাসায় মৃত-প্রায় হইয়া গাড়ীর একপার্শ্বে পড়িয়া স্বামীর চিন্তাতেই ছট-ফট করিতেছেন। শরৎকুমারী প্রভাত হইতে একটু জলবিন্দুও মুখে দেন নাই। জহিরউদ্দিন গাড়োয়ান বলিল,—"মা। তুমি যদি একটু জল না খাও, তবে আমি বসিয়া রহিলাম, গাড়ীতে উঠিব না।" জহিরউদ্দিনের কাকুতি মিনতিতে শরৎকুমারী নদীতে অবতরণ করিয়া কয়েক অঞ্জলি জল পান করিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন।

জহিরউদ্দিন গাড়ীর কিঞ্চিৎ দূরে একটি অশ্বত্থ-বৃক্ষের তলায় বসিয়া আপন মনে তাম্রকূট ভক্ষণ করিতে করিতে ভাবিতেছে এইবার যে গাড়ী ছাড়িব, একবারে সারাবাটীর চটিতে যাইয়া বিশ্রাম করিব। এমন সময় একটি খর্ব্বাকৃতি বলিষ্ঠকায় লোক জহিরউদ্দিনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। জহিরউদ্দিন তখন আপন চিন্তায় বিভোর, একজন লোক আসিয়া যে তাঁহার কাছে দাঁড়া-

ইয়াছে, ইহা তাহার লক্ষ্য নাই। লোকটা বলিল,—"চাচা, একবার ছিলিমটা দিবে?" জহিরউদ্দিনের এইবার লোকটির প্রতি দৃষ্টি পড়িল। চাচা বলিল,—"কলিকা চাহিতেছ, আচ্ছা দিতেছি।" চাচার পার্শ্বে যাইয়া কত দিনের পরিচিতের ন্যায় বসিয়া লোকটা বলিল,—"চাচার গরু দুটী বেশ! আহা, এমন বলিষ্ঠ ও সুন্দর গরু কখনও দেখি নাই, একবার দেখিলে বারবার গরু দুটীকে চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে।" গরু দুটীর সুখ্যাতিতে চাচার মনটা নরম হইয়া গেল। প্রথমতঃ জহির উদ্দিন লোকটার প্রতি চটিয়া গিয়াছিল। বহুক্ষণ পরে অতি কষ্টে জহির উদ্দিন একটু অগ্নি সংগ্রহ করিয়া ধূমপান করিতে বসিয়াছে, এবং দুই একটি টান্ টানিয়াছে মাত্র, এমন সময় কোথা হইতে একটা লোক আসিয়া ভোগের আগে প্রসাদের ন্যায় কলিকাটির জন্য হাত বাড়াইয়া রহিয়াছে—সুতরাং জহিরউদ্দিনের বিরক্তি হইবারই কথা। প্রাণের প্রিয় গরু দুটীর সুখ্যাতিতে জহিরউদ্দিনের বিরক্তি চলিয়া গেল। জহিরউদ্দিন বলিল, "বাপ্‌জি! এই গরু দুইটী আমার সব। ইহাদের কষ্ট কখনও দেখিতে পারি না। আমার নিজের প্রাণ অপেক্ষাও আমার গরু দুটী বড়।" চতুর লোকটা মনে করিল, এইবার চাচাকে হাতে আনিয়াছি। লোকটা জিজ্ঞাসা করিল,—"চাচার

গাড়ী কোথায় যাইবে?" চাচা শেষ একবার ধূম টানিয়া লইয়া কলিকাটি লোকটার হস্তে দিয়া বলিল, "বৈদ্যবাটী।" 'এই স্থানে বুঝি চাচার গাড়ী আজ রাত্রে থাকিবে?" প্রশ্ন করিয়া পরিচিত বন্ধুর ন্যায় লোকটী চাচার পার্শ্বে আরও একটু সরিয়া বসিল। জহিরউদ্দিন বলিল, "না এখনই গাড়ী ছাড়িব। প্রাতঃকালেই বৈদ্য-বাটী পৌঁছিব মনে করিয়াছি, এখন আল্লার ইচ্ছা!" "তবে কি চাচা, সমস্ত রাত্রিই তোমার গাড়ী চলিবে?" জহিরউদ্দিন অন্যমনস্কভাবে বলিল, "মেয়েটির স্বামীর কঠিন পীড়া, সমস্ত রাত্রি না চালাইলে উপায় নাই?" এই বলিয়া লোকটার হস্ত হইতে কলিকাটি লইয়া জহিরউদ্দিন উঠিয়া দাঁড়াইল। কার্য্য সিদ্ধ করিয়া অপরিচিত লোকটা কোথায় চলিয়া গেল, জহিরউদ্দিন আর দেখিতে পাইল না। আল্লার নাম করিয়া গরুদুটী গাড়ীতে জুতিয়া জহিরউদ্দিন গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এইবার আরও দ্রুতবেগে জহির উদ্দিন গরুদুটী তাড়াইতে আরম্ভ করিল। পবনবেগে গাড়ীখানি ছুটিতে লাগিল।

গাড়ীখানি যখন বলরামপুরের খালের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর অতীত হইয়াছে। বলরামপুরের খাল হইতে সারাবাটীর পুরাতন চটি দেড় ক্রোশের অধিক হইবে না। গরুদুটী খুব দ্রুত

চলিতেছে, এত শীঘ্র যে গাড়ী বলরামপুরের খালে আসিয়া উপস্থিত হইবে, জহিরউদ্দিন তাহা আশা করে নাই। গরু দুটার উপর যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া দক্ষিণ ও বামদিকে মুখ ফিরাইয়া জহিরউদ্দিন গরু দুটীকে বারবার উৎসাহিত করিতে লাগিল। জহিরউদ্দিনের আনন্দ আর ধরে না, গুন্ গুন্ স্বরে আল্লা আল্লা বলিয়া গান জুড়িয়া দিল। জহিরউদ্দিন একবার গুন্ গুন্ করিতেছে, পরক্ষণে "ভেলা মোর বাপ রে" বলিয়া গরু দুটার পৃষ্ঠে হাত দিতেছে, অমনি গরুদুটীও পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতভাবে হন্ হন্ করিয়া শকটস্কন্ধে অগ্রসর হইতেছে। এইবার জহিরউদ্দিনের গাড়ী বলরামপুরের খাল অতিক্রম করিল।

গাড়ী খুব দ্রুত চলিতেছে। এক একবার চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ব্যতীত এই নিস্তব্ধ অন্ধকার রজনীতে আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইতেছে না। বলরামপুরের খাল হইতে গাড়ী আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—এমন সময় জহিরউদ্দিন সেই অন্ধকারের মধ্যে দেখিতে পাইল, যেন ২।৩ জন লোক রাস্তার বামপার্শ্বে গাড়ী হইতে ১২।১৪ হাত দূরে দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ী আরও অগ্রসর হইয়া আসিল, জহিরউদ্দিন এবার বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিল কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কিছু নয় মনে করিয়া জহিরউদ্দিন পূর্ব্বের ন্যায় দ্রুতবেগে গাড়ী

চালাইতে লাগিল, কিন্তু মনে একটা সন্দেহের ছায়া পড়িল। জহিরউদ্দিন ভাবিতে লাগিল, ইহারা কি মানুষ? মানুষ কেন এরূপ রাত্রে এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে? বোধ হয় বৃক্ষের ছায়াকেই আমার মানুষ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকিবে। আর যদি প্রকৃতই মানুষ হয়, তবে ইহারা নিশ্চয়ই দস্যু তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জহিরউদ্দিন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গাড়ী চালাইতে লাগিল; মনের কথা কাহাকেও কিছু বলিল না। কেবল একবার ডাকিল, "মেয়ে, ঘুমাইতেছ মা?" শরৎকুমারী আহার নিদ্রা মথুরা-বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "না বাবা, আমি বসিয়া আছি।"

দেখিতে দেখিতে গাড়ী সারাবাটীর চটির নিকট আসিয়া পড়িল। আর অল্পদূর অগ্রসর হইলেই গাড়ী সারাবাটীর চটিতে উপস্থিত হয়।

সারাবাটীর চটি মাঠের মধ্যে বেনারস রোডের পার্শ্বে অবস্থিত। দুই ধারেই মাঠ। অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যে কোথাও লোকের বসতি নাই। চটির পূর্ব্ব পার্শ্বে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী, পুষ্করিণীর একটু দূরেই ২।৩টি প্রকাণ্ড অশ্বথ বৃক্ষ। সারাবাটীর এই পুরাতন চটিতে ৩।৪ খানি দোকান আছে। এই দোকানের মালিকগণ পথিকদের জন্য আরও ৭।৮ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। সন্ধ্যা

সময় যে সমস্ত পথিক এই চটিতে উপস্থিত হয়, তাহারা ভাড়া দিয়া এই ঘরে রাত্রিযাপন করে। যাহারা রন্ধন করিয়া আহারাদি করে, তাহাদিগকে আর ঘরের জন্য পৃথক ভাড়া দিতে হয় না। দোকানের মালিকদের নিকট হইতে চাউল, ডাউল, হাঁড়ি ও কাঠ ইত্যাদি ক্রয় করিতে হয়। রাত্রি এক প্রহরের মধ্যেই দোকানদারেরা স্ব স্ব দোকানে চাবি বন্ধ করিয়া গৃহে চলিয়া আসে। এই দোকানদারদের সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার কুকথা করিত। কেহ বলিত, সারা-বাটীর চটিতে যে সমস্ত হতভাগ্য পথিক দস্যুহস্তে নিহত হয়, এই দোকানদারেরা তৎসংবাদ পূর্ব্বাহ্নেই জানিতে পারিত কিন্তু জীবনের আশঙ্কায় দস্যুদের নাম প্রকাশ করিত না। কেহ বলিত, দস্যুদের সঙ্গে দোকানদারের ষড়যন্ত্র আছে, কেহ কেহ বলিত, ডাকাতদের ভয়েই ইহারা রাত্রিকালে দোকানে থাকিত না। এইরূপে নানা লোকে নানারূপ কথা বলিত কিন্তু এই জনপ্রবাদ সম্বন্ধে কোনরূপ প্রমাণ নাই।

আর অল্পমাত্র পথ অগ্রসর হইলেই শরৎকুমারীর গাড়ী-খানি চটিতে আসিয়া পৌঁছিবে, এমন সময় গাড়ীর পশ্চাৎ হইতে ২।৩ জন লোক সাঙ্কেতিক ভাষায় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই অশ্বত্থ বৃক্ষের তলদেশ হইতে ৮।১০ জন লোক সেইরূপভাবে ভীষণ চীৎকার করিতে

করিতে দৌড়িয়া আসিল। চীৎকার শব্দে গাড়ীতে বসিয়া জহিরউদ্দিন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া, তাহার সন্দেহ সত্যে পরিণত হইতে চলিল দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। বৈদ্যবাটীর লোকটির তন্দ্রা আসিয়াছিল—চীৎকারের শব্দে গৃহেই শয়ন করিয়া আছে মনে করিয়া অর্দ্ধনিদ্রিত নয়নে লম্ফ দিয়া গাড়ীর নীচে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। ক্ষীরদা গাড়ীতে মুখ লুকাইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিল। শরৎকুমারী বিপদের উপর বিপদ বুঝিয়া করযোড়ে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে দস্যুগণ গাড়ীর চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ফেলিল। সকলের হস্তেই বড় বড় বংশদণ্ড। প্রথমেই দুইজন দস্যু জহিরউদ্দিনকে গাড়ী হইতে টানিয়া লইয়া ভূমিতে আছ্ড়াইয়া দিল। এক আছাড়েই জহিরউদ্দিনের বাম অঙ্গ অসাড় ও অবশ হইয়া গেল। জহিরউদ্দিন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,বাপ্ সকল,আমাকে তোমরা মারিয়া ফেল, আরোহী মেয়ে দুটীকে কিছু বলিও না। জহিরউদ্দিন এই কথাটি বলিবামাত্র একজন দস্যু ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া অশ্লীল ভাষায় জহিরউদ্দিনকে গালি দিতে লাগিল। অপর দস্যু জহিরউদ্দিনের মুখে এক ঘা সজোরে লাঠি বসাইয়া দিল। লাঠির এক আঘাতে জহিরউদ্দিনের নাসিকা

দিয়া অজস্রধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। বৈদ্যবাটীর লোকটা মৃতের ন্যায় নীচে পড়িয়াছিল, একজন দস্যু লাঠির অগ্রভাগ দিয়া টানিয়া আনিল, অন্য একজন লাঠির দ্বারা ৮।১০ হাত দূরে তাহাকে লোষ্ট্র নিক্ষেপের ন্যায় ছুড়িয়া দিল। দুইজন লোক গাড়ীর উপরে উঠিয়া ক্ষীরদা ও শরৎকুমারীকে টানিয়া বাহির করিবার জন্য অগ্রসর হইল—একটা দস্যু পশ্চাৎ দিক হইতে ক্ষীরদার অঞ্চল ধরিয়া টানিতে লাগিল। ২।৩ জনে শকটের চালের উপর সজোরে লাঠির আঘাত করিতে লাগিল, গাড়ীর আচ্ছাদনটা ভাঙ্গিয়া একদিকে উড়িয়া পড়িল। একটা লোক শরৎকুমারীর মস্তকের কেশগুচ্ছ সজোরে আকর্ষণ করিয়া গাড়ীর নীচে ফেলিল। শরৎকুমারী শঙ্কিত হৃদয়ে গগনভেদী চীৎকার করিয়া উঠিল। জহিরউদ্দিন শরৎকুমারীর চীৎকার শুনিয়া ধীরে ধীরে মাটি ধরিয়া উঠিয়া বসিল, বসিবামাত্র দুই ঝলক রক্ত বমন হইয়া গেল। অতি ক্ষীণস্বরে জহিরউদ্দিন বলিল, "বাপু সকল, সতীর গায়ে হাত দিও না। নারীহত্যার পাতক সইয়—" বলিতে না বলিতে ২ জন দুই দিক হইতে আসিয়া যষ্ঠি দ্বারা মস্তকে সজোরে আঘাত করিল। জহিরউদ্দিনের মাথার খুলি ফাটিয়া গিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। জহিরউদ্দিনের মৃত্যুর বিলম্ব নাই বুঝিয়া দস্যুগণ তাহার

ন সময়ে একজন ভীমবেগে দৌড়িয়া আসিয়া গগনভেদী রবে
চীৎকার করিয়া বলিল সাবধান পাপাধমগণ!

দিকে আর তাকাইল না। ৪।৫ জন স্ত্রীলোককে অর্দ্ধ উলঙ্গবৎ করিয়া তাহার কাছে কিছু আছে কি না অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল। অপর দিকে কয়েক-জন যমদূতের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি দস্যু শরৎকুমারীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কয়েকজন নরকলঙ্ক শরৎকুমারীর অপার রূপরাশিতে মুগ্ধ হইয়া বন্যপশুর ন্যায় পাশবিক অত্যাচারের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। লুণ্ঠন-কার্য্য শেষ হইলে শরৎকুমারীকে প্রাণে না মারিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য অপর কয়েকজন পাষণ্ড পূর্ব্ব হইতেই উদ্‌যোগ আয়োজন করিতে লাগিল। একজন ভীষণদর্শন দস্যু শরৎকুমারীর অপার রূপরাশি দর্শনে জ্ঞানশূন্য হইয়া পশুর ন্যায় কামোন্মত্ত হৃদয়ে বাহু-প্রসারণ করিয়া শরৎকুমারীকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছে, সহসা কে একজন ভীমবেগে দৌড়িয়া আসিয়া গগনভেদী রবে চীৎকার করিয়া বলিল, "সাবধান পশ্বাধমগণ! স্ত্রীলোকটিকে সত্বর পরিত্যাগ কর, নচেৎ তোদের প্রায়শ্চিত্ত সন্নিকট।" দস্যুগণ চম্‌কাইয়া পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখিল, একজন বলবান পুরুষ প্রকৃতই তাহাদিগকে আক্রমণ করি-বার জন্য আসিতেছে। আক্রমণকারীর উন্নত ললাট—প্রশস্ত বক্ষস্থল, আজানুলম্বিত বাহু, ক্রোধে চক্ষুদ্বয় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। দস্যুদলের কেহ কেহ এই বীর

পুরুষের হুহুঙ্কারে ভীত হইয়া স্তব্ধ-হৃদয়ে বীরপুরুষের দিকে চাহিয়া রহিল। দস্যুদলপতিও ক্রুদ্ধ হইয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে একবার এই বীরপুরুষের দিকে চাহিয়া দেখিল। পরক্ষণে উপেক্ষাভরে হো হো করিয়া বিকট হাসি হাসিয়া আদেশ করিল, ঐই মেয়ে-টার সঙ্গে শীঘ্র ইহাকে যমালয়ে প্রেরণ কর। বীর পুরুষ অসীম সাহসের সহিত একবারে দলপতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "পাষণ্ড, এখনও বলিতেছি, এই স্ত্রীলোকটিকে এই দণ্ডেই পরিত্যাগ করিতে বল্। এই লোমহর্ষণ দৃশ্য আমি আর চক্ষে দেখিতে পারি-তেছি না।" কথা শেষ হইতে না হইতে ৩ জনের লাঠি বীর পুরুষের মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে পড়িল। বীর পুরুষ লাঠির আঘাত গ্রাহ্য না করিয়া উত্তেজিত স্বরে আবার চীৎকার করিয়া বলিল, "দস্যুসর্দ্দার! সহস্র-বার মিনতি করিয়া বলিতেছি, মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিতে বল্।" এবার দলপতি ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে উঠিয়া, অপরের হস্ত হইতে একটা লাঠি লইয়া বীর পুরুষের মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "শত্রুটাকে শীঘ্র মারিয়া ফেল।" দলপতির কথা শেষ হইতে না হইতে সকলেই সেই মুহূর্ত্তে বীরপুরুষকে আক্রমণ

করিল। কেহ লাঠি উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া আছে, কেহ মস্তকে, কেহ পৃষ্ঠে, কটিদেশে লাঠির উপর লাঠির আঘাত করিতেছে। দলপতি দন্ত কড়্ মড় করিয়া বলিতেছে—"শত্রুটার জিহ্বা টানিয়া চক্ষু দুইটা উৎপাটন করিয়া ফেল।" এইবার বীরপুরুষের লাঠির আঘাত অসহ্য হইয়া উঠিল। ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া দলপতির বক্ষঃস্থলে এক পদাঘাত করিলেন। দলপতি ৬।৭ হাত দূরে গিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা দস্যুর হস্ত হইতে ১ গাছা লাঠি ভীম বলে কাড়িয়া লইয়া প্রথমেই দলপতির মস্তকে উপর্য্যুপরি কয়েকবার আঘাতে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিলেন। দলপতি বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া ভূমে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। দলপতির মস্তক হইতে রক্তস্রোত নির্গত হইয়া সেইস্থান শোণিতাক্ত হইতে লাগিল। দলপতির অবস্থা দেখিয়া সকলে হতভম্ব হইয়া পড়িল। বীরপুরুষ ক্ষিপ্রহস্তে চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে একবারে সবলে আক্রমণ করিয়া লাঠি চালাইতে লাগিল। বীরপুরুষের ক্ষিপ্রহস্তের লাঠির তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া দুইজন সরিয়া দাঁড়াইল—অপর সকলে প্রাণপণে যুঝিবার চেষ্টা করিল। বীরপুরুষের উপর বৃষ্টিধারার ন্যায় লাঠি পড়িতেছে, কিন্তু কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া তিনি এক একজনের মস্তক লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে লাগিলেন। আরও ৩ জন

লোক দলপতির ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। একে একে আরও কয়েকজনকে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিতে দেখিয়া অপরাপর আহত দস্যুগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পশ্চাতের দিকে সরিতে লাগিল। বীরপুরুষ ক্রমশই ক্ষিপ্রহস্তে যষ্টি চালনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। লাঠির আঘাতে সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে রঞ্জিত হইয়া আরও দুইজন পড়িয়া গেল। এবার একে একে সকলেই প্রাণ লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বীর পুরুষ বুঝিলেন, যে অঙ্গে যাহার লাঠির আঘাত লাগিয়াছে, সেই অঙ্গ চিরদিনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিবে; সুতরাং উহাদের পশ্চাৎধাবন করিয়া আর কোন লাভ নাই। এক্ষণে মেয়েটি জীবিত আছে কিনা ইহাই দেখিতে হইবে। বীরপুরুষ দস্যুদের পশ্চাতে পশ্চাতে প্রায় ১ বিঘা জমী অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া শকটের নিকট আসিবার সময় বীরপুরুষ দেখিতে পাইলেন, দস্যুসর্দ্দার রক্ত বমন করিয়া ছটফট করিতেছে, অপর কয়জন রক্তাক্ত-কলেবরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে। বীরপুরুষ সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া গাড়ীর দিকে স্ত্রীলোকটীকে দেখিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কয়েক হস্ত অগ্রসর হইয়া দূর হইতে দেখিলেন, একটী স্ত্রীলোক অচৈতন্য অবস্থায় এক ব্যক্তির ক্রোড়ে মস্তক

রাখিয়া শয়ন করিয়া আছে। স্ত্রীলোকটির চৈতন্য সম্পাদনের জন্য যথোচিত চেষ্টা হইতেছে। বীরপুরুষ ক্রোধকম্পিত ভীমরবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে স্ত্রীলোক-টীকে স্পর্শ করিয়া আছ?" লোকটী উত্তর করিল, "কৃষ্ণ-মোহন, আমি তোমার ভাই।"

কৃষ্ণমোহন দ্রুতপদে নিকটে আসিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দেখিলেন, একদিকে দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য স্ত্রীলোটীর চৈতন্য সম্পাদন করিবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছেন, অপর দিকে রামতনু বাগ্দা ক্ষীরদা ও জহির-উদ্দিনের শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। পাঠক-পাঠিকাগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, ইনিই আমাদের তেজস্বী বীর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনু কিরূপে এ স্থলে আসিয়া পড়িল তাহা জানিবার কৌতূহলী হইলেও কৃষ্ণমোহন নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

রামতনুকে বলিলেন.রামতনু. শীঘ্র জল লইয়া আইস। রামতনু বিনাবাক্যব্যয়ে চটির একটা দোকানে গিয়া কয়েকবার পদাঘাত করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং মৃত্তিকানির্ম্মিত বড় কল্‌সি ২টা হস্তে লইয়া পুষ্করিণীর দিকে ছুটিল। নিমিষের মধ্যে রামতনু দুই কলশ জল লইয়া কৃষ্ণমোহনের নিকট উপস্থিত হইল। কৃষ্ণমোহন

শরৎকুমারী, ক্ষীরদা ও জহিরউদ্দিনের মুখে একটু একটু জল দিতে লাগিলেন। দুর্গাপ্রসন্ন তাহাদের অঙ্গের শোণিতরাশি নিজবস্ত্রে মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। রামতনু বস্ত্র দ্বারা ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে লাগিল। কৃষ্ণমোহন নানাপ্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাদের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারী ও ক্ষীরদার ধীরে ধীরে জ্ঞান হইতে লাগিল। বহু চেষ্টাতেও কৃষ্ণমোহন জহিরউদ্দিনের চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেন না,—তাহার আঘাত বড়ই গুরুতর হইয়াছিল এবং মস্তক ও নাসিকার দ্বার দিয়া অতিরিক্ত শোণিত নির্গত হওয়ায় জহিরউদ্দিনের নিশ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। বৈদ্যবাটীর লোকটীকে সেস্থলে কেহই দেখিতে পাইলেন না—সে লোকটী অধিক আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই, বোধ হয় গোলযোগের সময় সুবিধা পাইয়া একদিকে পলায়ন করিয়া থাকিবে। জহিরউদ্দিনের রীতিমত চিকিৎসার আবশ্যক ভাবিয়া কৃষ্ণমোহন সকলকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রামতনু জহিরউদ্দিনকে বক্ষঃস্থলে উঠাইয়া লইলেন,—দুর্গাপ্রসন্ন ক্ষীরদার কটিদেশ বাম হস্তের উপর রাখিয়া স্কন্ধদেশ ও মস্তক দক্ষিণ হস্তের উপর স্থাপন করিয়া লইয়া চলিলেন। কৃষ্ণমোহন শরৎকুমারীকে পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার ন্যায়

বাম হস্তে বসাইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইবার সময় পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন, ডাকাতের দলের অন্যান্য লোক আহত ব্যক্তিদিগকে ও দলের সর্দ্দারকে স্কন্ধে তুলিয়া দৌড়িয়া পলাইতেছে। কৃষ্ণমোহন একবার আকাশের দিকে চাহিয়া হাসিলেন,—সে দিকে আর মনোযোগ করিলেন না।

সারাবাটীর চটি হইতে কৃষ্ণমোহনের বাটী অর্দ্ধ ক্রোশ পথ। অল্প সময়ের মধ্যেই কৃষ্ণমোহন, দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনু ক্ষীরদা, শরৎকুমারী ও জহিরউদ্দিনকে লইয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন;—তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে। বিহগকুল চীৎকার শব্দে সারাবাটী গ্রামবাসীদিগকে শয্যাত্যাগ করিতে বলিতেছে। কৃষ্ণমোহন-জননী পুত্রের গৃহাগমনের অপেক্ষায় সমস্ত রাত্রি জাগ্রত হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, কৃষ্ণমোহনের চিন্তাতেই তাঁহার রজনী অতিবাহিত হইয়াছে। প্রভাত সমুপস্থিত জানিয়া কৃষ্ণমোহন-জননী পুত্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া সারাবাটীর মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন,—এমন সময় কৃষ্ণমোহন 'মা! মা!' বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণমোহনের সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে ভাসিয়া গিয়াছে, ললাট হইতে স্বেদধারা ঝরিয়া

পড়িতেছে। কৃষ্ণমোহনের জননী পুত্রের অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

কৃষ্ণমোহন বলিলেন, "মা! কোন চিন্তা নাই—আমার কিছুই হয় নাই। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার দেহের একবিন্দু রক্তপাতও হয় নাই। আমার দেহ কেবল দস্যুরক্তে প্লাবিত হইয়াছে। সকলই বলিতেছি, অগ্রে ইহাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা করুন।" কৃষ্ণমোহন রামতনুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রামতনু, খানিকটা গরম দুগ্ধ চাই।"

রামতনু এক লম্ফে একটা দশসেরা মৃত্তিকা ভাণ্ড হস্তে লইয়া গোশালার দিকে দৌড়িল।

কৃষ্ণমোহনের জননী ক্ষীরদা ও শরৎকুমারীকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণমোহনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একি বাবা! মেয়ে দুটার কি হইয়াছে?" শরৎকুমারীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আহা! এই মেয়েটি যেন লক্ষ্মী ঠাকরুণ!" শরৎকুমারীকে ক্রোড়ে তুলিয়া পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন।

কৃষ্ণমোহন দুইটা বটিকা মর্দ্দন করিয়া জহিরউদ্দিনকে অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করাইয়া দিলেন এবং কয়েকটি ঔষধ মর্দ্দন করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতে লাগিলেন ইতিমধ্যে রামতনু একটা পাত্রে খানিকটা উষ্ণ দুগ্ধ লইয়া

আসিল। কৃষ্ণমোহনের জননী "মা একটু গরম দুগ্ধ খাও" এই বলিয়া বালিকা কন্যার ন্যায় ক্রোড়ে বসাইয়া শরৎকুমারীকে অল্প অল্প করিয়া দুগ্ধ খাওয়াইয়া দিলেন। পরিষ্কার বিছানা প্রস্তুত করিয়া শরৎকুমারীকে শয়ন করাইয়া কৃষ্ণমোহনের জননী ক্ষীরদার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। ক্ষীরদা ও শরৎকুমারী সেবা-শুশ্রূষায় অল্পক্ষণের মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠিল।

বহু চেষ্টা করিয়াও কৃষ্ণমোহন জহিরউদ্দিনের চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেন না। জহিরউদ্দিনের আঘাত অতি সাংঘাতিক হইয়াছে। কৃষ্ণমোহন জহিরউদ্দিনের জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। জহিরউদ্দিনের প্রাণের আশঙ্কা করিয়া কৃষ্ণমোহন মকরধ্বজ ও মৃগনাভির ব্যবস্থা করিলেন। বারবার ঔষধ প্রয়োগে এবং নানারূপ শুশ্রূষায় বেলা ৫ দণ্ডের সময় জহিরউদ্দিন চক্ষুরুন্মীলন করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্ঞানেরও উদয় হইল। জহিরউদ্দিনের জীবনের আর আশঙ্কা নাই জানিয়া কৃষ্ণমোহন হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শরৎকুমারী এখন বেশ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে, দুগ্ধাদি আহার করিয়া একটু সবল হইয়াছে। কৃষ্ণমোহন আনন্দিত হৃদয়ে মাতার কাছে বসিয়া পূর্ব্ব দিনের সমস্ত ঘটনা যথা-যথ বলিতে লাগিলেন। স্নেহাধিক্য বশতঃ কৃষ্ণমোহন-

জননী পুত্রের গত রজনীর বিপদের কথায় চমকাইয়া উঠি-লেন। কৃষ্ণমোহনকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া বারম্বার মস্তক চুম্বন করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, তোমাকে ভগবান আর গৃহদেবতা রামচন্দ্রদেব গত রজনীর বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" কৃষ্ণমোহন বলিলেন, "মা, তোমার আশীর্ব্বাদেই আমার কোন অমঙ্গল ঘটে নাই।"

শরৎকুমারী কৃষ্ণমোহনের জননীর চরণে প্রণাম করিয়া পদধূলি পুনঃ পুনঃ মস্তকে লইলেন এবং পূর্ব্ব-দিনের বিপদের কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। তাঁহার পুত্রের জন্যই তাহাদের জীবন রক্ষা হইয়াছে, এই কথা বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে কৃষ্ণমোহনের চরণ-উদ্দেশে বারম্বার নমস্কার করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণমোহনের জননী শরৎকুমারীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। এইবার শরৎকুমারী কৃষ্ণমোহনের জননীর চরণে লুটাইয়া পড়িয়া আকুলপ্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন।

"কেন মা! আর ভাবনা কি? ভগবান ত তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন? বাবা রামচন্দ্র ত তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন? এই ঘর তোমার নিজের ঘর বলিয়াই মনে কর না মা? কেন মা, গত কার্য্যের জন্য রোদন করিতেছ?"

কৃষ্ণমোহনের জননী বহু কষ্টে শরৎকুমারীকে একটু

সান্ত্বনা করিয়া অঞ্চল দিয়া স্নেহভরে নয়নাশ্রু মুছাইতে লাগিলেন।

"মা, তোমাদের ঋণ আমি ইহজীবনে সুধিতে পারিব না। এই ঘর আমি আমার গর্ভধারিণী জননীর ঘর বলিয়াই মনে করিতেছি। সে জন্য আমি কাঁদি নাই। আপনার ন্যায় জননীর ক্রোড়ে বসিয়াও আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছে।"

"কেন মা! তোমার প্রাণে কি কষ্ট?"

এই বলিয়া কৃষ্ণমোহনের জননী শরৎকুমারীর মুখচুম্বন করিয়া ক্রোড়ের কাছে টানিয়া আনিলেন।

"মা! বিপদের মধ্যেও আমি সম্পদের মুখ দেখিতে পাইলাম। জননী বহুদিন এই হতভাগিনী কন্যাকে ফেলিয়া গিয়াছেন; আজ আপনাকে মা বলিয়া আমি সেই শোক বিস্মৃত হইলাম। কিন্তু মা! নিজের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া দাদা কেন আমার জীবন রক্ষা করিলেন। মা! দস্যুহস্তে আমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত। আমার স্বামী বন্দ্যবাটীতে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত।" এই বলিয়া শরৎকুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে বিবাহ হইতে, স্বামীর প্রগাঢ় ভালবাসা এবং বর্ত্তমান পীড়ার কথা সমস্তই অদ্যোপান্ত বলিতে লাগিলেন।

সতী সতীহৃদয়ের ব্যথা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

শরৎকুমারীর হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত কৃষ্ণমোহনের জননী দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন—শরৎকুমারীর হৃদয়ে তাঁহার স্বামীমূর্ত্তি অহরহঃ বিরাজ করিতেছে। শরৎকুমারী সেই মূর্ত্তি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভক্তিচিত্তে ধ্যান করিতেছেন। বুঝিলেন, শরৎকুমারীকে আর স্বামী হইতে দূরে রাখা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। শরৎকুমারী অপেক্ষা কৃষ্ণমোহনের জননীর ব্যাকুলতা অধিকতর বৃদ্ধি হইল। কৃষ্ণমোহনের জননী বলিলেন "মা শরৎ! এখনই তোমাকে স্বামীসন্নিধানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছি। কিন্তু মা, আমার আর কন্যা নাই, মাকে যেন ভুলিয়া যাইও না।

শরৎকুমারী বলিল, "মা, হতভাগিনী দরিদ্রা কন্যাকে মনে রাখিবেন ত?" কৃষ্ণমোহনের জননী স্নেহভরে শরৎকুমারীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন।

কৃষ্ণমোহনের জননী ডাকিলেন "বাবা কৃষ্ণমোহন!"

কৃষ্ণমোহন জহিরউদ্দিনের বিছানায় বসিয়া তাহার মস্তকে ব্যজন করিতেছিলেন,—জননীর আহ্বানে তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কৃষ্ণমোহন গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র শরৎকুমারী তাঁহার পদে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "দাদা! আমার ভাই নাই, মা নাই;—আজ শুভমুহূর্ত্তে মা ও ভাই পাইলাম আপনি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া আমার জীবনরক্ষা

করিয়াছেন ;—ভগবানের কৃপায় যে মাতার গর্ভে আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই মাকে আজ আমি মা বলিতে পাইলাম।”

কৃষ্ণমোহন বলিলেন “আমি ধন্য এই জন্য যে, তোমার মত একটী ভগিনী পাইয়াছি! ভগিনি, তোমার তো আর কোন অসুখ নাই? শরীরের মধ্যে কোথাও বেদনা আছে কি?”

শরৎকুমারী বলিল “না দাদা, কোথাও বেদনা নাই।”

জননী কৃষ্ণমোহনকে কাছে বসাইয়া শরৎকুমারী সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলিয়া তাহার স্বামীভক্তির বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জননী বলিলেন “বাবা কৃষ্ণমোহন! আর বিলম্ব না করিয়া যাহাতে শরৎকুমারী ত্বরায় বৈদ্যবাটী পৌঁছিতে পারে তাহার উপায় কর।” শরৎকুমারীর পতিপরায়ণতা, ধর্ম্মবুদ্ধি ও সরলতায় কৃষ্ণমোহন বড়ই সুখী হইলেন। মনে মনে প্রশংসা করিয়া জননীকে বলিলেন “মা! শরৎকুমারীকে বৈদ্যবাটীতে পাঠাইবার এখনই সব স্থির করিতেছি।”

কৃষ্ণমোহন বহির্বাটিতে আসিয়া দুর্গাপ্রসন্ন ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, জহিরউদ্দিনের সেবা শুশ্রূষার ভার তাঁহার উপর থাকিবে এবং রামতনুর সঙ্গে তিনি এবং কৃষ্ণমোহন বৈদ্যবাটী যাইবেন। ক্ষীরদা বড়ই দুর্ব্বল

হইয়া পড়িয়াছে; তাহাকে বৈদ্যবাটী না লইয়া গিয়া জননীর কাছে রাখিয়া যাইবেন।

কৃষ্ণমোহন রামতনুকে আজ্ঞা করিলেন "জহিরউদ্দিনের গাড়ীখানা প্রস্তুত করিয়া রাখ—বৈদ্যবাটী যাইতে হইবে।" রামতনু ঝটিতি গিয়া গাড়ীখানা টানিয়া আনিয়া ছাউনি বাঁধিয়া ফেলিল এবং গরু জুতিয়া গাড়ীর উপর বসিয়া রহিল। রামতনু গাড়ীখানা পূর্ব্বেই চটি হইতে লইয়া আসিয়াছিল।

কৃষ্ণমোহন জননীকে যাইয়া বলিলেন "মা, সমস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে। আপনি অনুমতি করিলেই শরৎকুমারীকে লইয়া যাইতে পারি।" জননী বন্দোবস্তের কথা শুনিয়া আহ্লাদের সহিত সম্মতি প্রদান করিলেন।

"বাবা কৃষ্ণমোহন! কা'ল হইতে অনাহারে আছ, আজও কিছু আহার করিয়া যাইবে না?" এই বলিয়া জননী কৃষ্ণমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কৃষ্ণমোহন বলিলেন "মা! তিন চারি দিনের অনাহারে আপনার পুত্রের কোনই কষ্ট হইবে না।" বেলা দুইপ্রহরের সময় শরৎকুমারীকে লইয়া কৃষ্ণমোহন যাত্রা করিলেন। রামতনু দ্রুতবেগে গাড়ী ছুটাইয়া দিল। শরৎকুমারী ভাবিল কৃষ্ণমোহন মানুষ না দেবতা? আবার

মনোমধ্যে নূতন প্রশ্নের উদয় হইল—কৃষ্ণমোহনের জননী মানবী না দেবী?

রাত্রি যখন দুইপ্রহর, তখন রামতনু বৈদ্যবাটীর ঘাটে গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইল। মতিলাল গাঙ্গুলির পিতার বহুদিনের দোকান— সুতরাং ইহারা অপরিচিত হইলেও ঘোর অন্ধকার রজনীতেও মতিলালের দোকান ঠিক করিয়া লইতে কোনরূপ অসুবিধা হইল না।

সকলে মতিলালের দোকানের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন মতিলাল প্রলাপ বকিতেছে এবং এক একবার শরৎ শরৎ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। একজন পাশের দোকানদার রোগীর নিকট বসিয়া আছে। স্বামীর অবস্থা দেখিয়া শরৎকুমারী অবগুণ্ঠনের ভিতর ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কৃষ্ণমোহন শরৎকুমারীকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া রোগীর পার্শ্বে বসিতে বলিলেন। শরৎকুমারী বামবাহু দ্বারা স্বামীকে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা মতিলালের বাম হস্ত বক্ষঃস্থলে তুলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণমোহন অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগীর নাড়ী দেখিলেন; চক্ষু জিহ্বা ইত্যাদি পরীক্ষা করিলেন। বুঝিলেন নাড়ীর কোনই দোষ নাই, তবে পূর্ণ বিকার! রোগীর অবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণমোহন হতাশ হইলেন না। চিকিৎসার কি

হইয়াছে, পার্শ্বের দোকানদারটীকে প্রশ্ন করিলেন। দোকান দারের কথায় কৃষ্ণমোহন বুঝিলেন মতিলালের প্রথম হইতেই সুচিকিৎসার অভাব ঘটিয়াছে।

কৃষ্ণমোহন রোগীর পীড়ার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। রামতনু সমস্ত রাত্রি রোগীর পার্শ্বে বসিয়া প্রভুর উপদেশমত ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন। শরৎকুমারী নিশ্চল স্পন্দনহীন অবস্থায় স্বামীপার্শ্বে বসিয়া ভগবানকে ডাকিতেছেন, চক্ষের জলে বসন আর্দ্র হইয়া যাইতেছে; তিনি কখন মতিলালের কপোলদেশে, কখন বক্ষস্থলে, কখন মস্তকে হাত দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। শরৎকুমারীর এক একটি দীর্ঘনিশ্বাসে কৃষ্ণমোহনের হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। শরৎকুমারীকে কৃষ্ণমোহন এখন আর কোন সান্ত্বনা-বাক্য বলিতেছেন না—কৃষ্ণমোহন মনে করিতেছেন শরৎকুমারীর ইহাই সুখ—ইহাই শরৎকুমারীর সান্ত্বনা! মনে মনে বলিলেন "কাঁদ শরৎকুমারি! তোমার অশ্রুবারি ভগবানের চরণে পড়িতেছে। মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গলের স্থান নাই। এই অশ্রুজলের ভিতরেই মানব-চক্ষুর অন্তরালে তোমার জীবনের মঙ্গল নিহিত আছে। সেই নিশ্চল,—স্পন্দনহীন শরৎকুমারীর দিকে চাহিয়া কৃষ্ণমোহন মনে মনে বলিতে লাগিলেন—শরৎকুমারি! আমরা ক্ষুদ্র মানব, ভগবানের

রাজ্যে ভবিষ্যতের যবনিকা উত্তোলন করিয়া দেখিবার সাধ্য আমাদের নাই! কি করিয়া বুঝিব শরৎকুমারি, তোমার অদৃষ্টে কি আছে। ক্ষুদ্র মানব আমরা—আমাদের হস্তে এই বিশ্বরাজ্যের অধীশ্বর যতটুকু ক্ষমতা দিয়াছেন সেইটুকু লইয়াই আমরা নাড়াচাড়া করিতেছি। কখন আবার এই ক্ষমতাটুকুরও অপব্যবহার করিয়া ফেলিতেছি। সেই অসীম ক্ষমতার নিকট আমাদের সীমাবিশিষ্ট ক্ষমতা অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ। যে অসীম শক্তি তোমার উপর কার্য্য করিতেছে তাহার উপর ক্ষুদ্র কৃষ্ণমোহনের সীমাবিশিষ্ট অতি তুচ্ছ ক্ষমতা কি করিবে শরৎকুমারি? তোমার অদৃষ্ট সেই অসীম শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কোথায় কি অবস্থায় উপনীত হয় দেখিয়া কেবল হাসিব—কাঁদিব! ইহা ব্যতীত ক্ষুদ্র মানবশক্তি তোমার কিছুই করিতে পারিবে না!

কৃষ্ণমোহন শরৎকুমারীর দিকে আর চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না। তখন রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণমোহন রামতনুকে সাবধানে থাকিতে বলিয়া ধীরে ধীরে পতিতপাবনী জাহ্নবীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণমোহন আজ ভীষণ চিন্তায় মগ্ন। বৈদ্য-বাটীর এখন সকলেই ঘোর নিদ্রায় শয্যোপরি অচৈতন্য। জাহ্নবীতট নিস্তব্ধ! কেবল জাহ্নবীবক্ষে নৌকাগুলি ভাসি-

তেছে ; নৌকার মধ্য হইতে মাঝি মাল্লারা মাঝে মাঝে দুই একটি কথা কহিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। কৃষ্ণমোহন পতিতপাবনী জাহ্নবী-তীরে বসিয়া আপন মনে গান গাহিতে লাগিলেন ;—

হরি হরি ব'লে, কবে যাব চ'লে,
ছাড়ি এই ভব, তাই ভাবি মনে।
সংসারেরি জ্বালা, করে ঝালাপালা,
বেড়ে গেল বেলা, জীবন গগনে ॥
থাকিব না আর এ ছার ভবে,
চির সুখী হেথা কে হয়েছে কবে ?
যেখানে প্রাণের চির শান্তি হবে,
চল মন তথা, ত্বরিত গমনে ॥

কৃষ্ণমোহন অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রেমানন্দে ভাসিতে ভাসিতে সেই সর্ব্বসন্তাপহারিণী জাহ্নবী-তীরে বসিয়া এই সঙ্গীতটি বারবার গাহিতে লাগিলেন। চক্ষের জলে কৃষ্ণ-মোহনের বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল।

শরৎকুমারী ও মতিলালকে অনেকক্ষণ ছাড়িয়া আসিয়া-ছেন,—কৃষ্ণমোহন আর সেই সর্ব্বপাপহরা সন্তাপহারিণীর তটে বসিতে পারিলেন না। কৃষ্ণমোহন একবার আকা-

শর পানে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রাণের বোঝা নামাইয়া ফেলিলেন। মনে মনে ভগবানের পাদপদ্মে সুখ, দুঃখ, আশা, ভরসা, মতিলাল ও শরৎকুমারীর চিন্তা, সমস্তই সমর্পণ করিয়া করযোড়ে মনে মনে বলিলেন,

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি,
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তি
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন,
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

কৃষ্ণমোহন গুন্ গুন্ করিয়া আপন মনে গান গাহিতে গাহিতে দোকানে আসিয়া দেখিলেন, শরৎকুমারী সেই-ভাবেই স্বামী-পার্শ্বে বসিয়া আছে! কৃষ্ণমোহন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা! সতীর সতীত্ব কি সুন্দর! শরৎকুমারী একভাবে নিশ্চল স্পন্দনহীন দেহে তন্ময়চিত্তে ধ্যানমগ্নাবস্থায় ভগবানের চরণে স্বামী-ভিক্ষা চাহিতেছে। কৃষ্ণমোহন রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইয়া গেল, শরৎ-কুমারীর তবু সেই একই অবস্থা।

প্রভাতে রোগীর অবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণমোহনের আজ বড়ই আশঙ্কা হইল। রজনীশেষে রোগীর প্রলাপ বন্ধ হইয়াছে, জ্বর কমিয়া আসিয়াছে এবং নাড়ীর অবস্থা কৃষ্ণ-

মোহনের ভাল বোধ হইল না। কৃষ্ণমোহন অন্য ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। রামতনু ঔষধ খাওয়াইয়া দিল কৃষ্ণমোহন বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

বেলা এক প্রহরের পর রামতনু দেখিল কৃষ্ণমোহনের চক্ষুদ্বয় জলভারাক্রান্ত। কৃষ্ণমোহন বামহস্ত গণ্ডস্থলে স্থাপন করিয়া বিমর্ষ ভাবে বসিয়া আছেন।

প্রভুর অবস্থা দেখিয়া রামতনুর মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রামতনু ভাবিল, না জানি আবার কি বিপদের সম্মুখে ভগবান আমার প্রভুকে নিক্ষেপ করিতেছেন।

রামতনু অস্ফুটস্বরে কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিল "এখন রোগীর অবস্থা কিরূপ দেখিতেছেন?

কৃষ্ণমোহন বলিলেন "রামতনু! নিয়তির নিকট আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টা ব্যর্থ হইবার বুঝি আর বিলম্ব নাই। রোগীর অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই আশঙ্কা হইতেছে। তুমি ঔষধটা আর একবার মৃগনাভি দিয়া মর্দ্দন করিয়া খাওয়াইয়া দাও।"

রামতনু গত রাত্রি বহু আশা বুকে লইয়া চতুর্গুণ বলে রোগীর পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা ও ঔষধাদি প্রদান করিয়াছে। প্রভুর কথা শুনিয়া রামতনুর দেহ হইতে বল, বুদ্ধি, আশা, ভরসা সব যেন উড়িয়া গেল। বটিকা সহ মৃগনাভি মর্দ্দন করিতে রামতনুর হাত উঠিতেছে না.

হাতটা যেন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। রামতনু প্রভুর মুখের পানে চাহিয়া শরৎকুমারীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। অতিকষ্টে মনঃস্থির করিয়া রামতনু ঔষধ খাওয়াইয়া দিল।

রামতনু তাহার প্রভুকে অনেক কঠিন ব্যাধির চিকিৎসা করিতে দেখিয়াছে। মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া কবিরাজগণ যে রোগীকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে— রামতনুর প্রভু তাহাকে আরোগ্য করিয়াছেন। কিন্তু সদাকার এরূপ হতাশের কথা রামতনু প্রভুর মুখে কখন শুনে নাই। রামতনু ভাবিতে লাগিল, আমার প্রভুর মন্ত্রৌষধি কি এক্ষণে কার্য্যকরী হইবে না।

বেলা এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণমোহন চিন্তাকুলনয়নে রোগীর দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। মুখ গম্ভীর। নীরব অশ্রুপাতে চক্ষু দুটি লালবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বেলা দেড় প্রহরের সময় রোগীর ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে লাগিল। জ্বর বহুক্ষণ পূর্ব্বে ত্যাগ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ বরফের ন্যায় শীতল হইয়া আসিতেছে। কৃষ্ণমোহন একবার নাড়ী দেখিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, পরক্ষণে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া বলিলেন—"ভগবান! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!"

কৃষ্ণমোহনের শেষ কথাটি শরৎকুমারীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। এ পর্য্যন্ত শরৎকুমারীর মুখ হইতে একটি কথাও বহির্গত হয় নাই। কৃষ্ণমোহনের শেষ কথাটি শুনিয়া শরৎকুমারীর যেন ক্ষণেকের জন্য চৈতন্য হইল। শরৎকুমারী অস্ফুট স্বরে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, —

"দাদা! এখন কি রকম দেখিতেছেন?"

কৃষ্ণমোহন শরৎকুমারীকে কি উত্তর দিবেন! কৃষ্ণমোহন তখন অন্য চিন্তায় মগ্ন! কৃষ্ণমোহন তখন ভাবিতেছেন, মতিলালের জীবন পার্থিব জগতের সুখ দুঃখ, স্নেহ ও ভালবাসা, সব পরিত্যাগ করিতে চলিয়াছে। একদিকে জীবন, অন্যদিকে মৃত্যু! মতিলাল আবার কোথায় যাইবে? জানি না, তাহার কর্ম্মফল মতিলালকে কোথায় লইয়া যাইবে? মতিলাল ও তুমি আসক্তিবশে সংসারে আসিয়া সংসারের যাবতীয় বস্তুকে আপনার ভাবিতে, এখন সকলই তোমার পর হইতে চলিয়াছে। মানব! যে প্রিয়বস্তুকে একদিনের জন্য চক্ষের অন্তরালে রাখিয়া বিরহ-ব্যথায় কাতর হও, তাহাকে চিরতরে ছাড়িতে হইবে; যে বস্তুকে আপনার ভাবিয়া পরকে ভোগ করিতে দেখিলেও কষ্টানুভব কর—সেই বিষয়-বৈভব তোমার কোথায় থাকিবে, একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? মানব! অস্থায়ী জীবনে কতই না তুমি তেজ, দম্ভ, অহঙ্কার

দেখাও! জীবনের পরিণাম কোথায়, একবার ভুলিয়াও চিন্তা কর না!

শরৎকুমারী আবার একবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাদা, এখন কি রকম দেখিতেছেন?"

কৃষ্ণমোহন দেখিলেন, রোগীর নাভিনিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে। কৃষ্ণমোহনের বীরহৃদয় এইবার উথলিয়া উঠিল।

কৃষ্ণমোহন শরৎকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন "শরৎ! প্রাণকে দৃঢ় কর। তুমি বালিকা হইলেও বুদ্ধিমতী—মূর্ত্তিমতী সাবিত্রীসতী। পতির আত্মার মঙ্গলের জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাইবার সতী রমণীর ইহাই উপযুক্ত সময়।"

শরৎকুমারী স্বামীর পা-দুখানি বক্ষঃস্থলে তুলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

"থাক শরৎকুমারী! ইহ-জীবনের মত যতক্ষণ পার স্বামীপদ হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাক! অপার দুঃখের মধ্যে এই সুখটুকুও তোমার জীবনে আর কখন ঘটিবে না।"

মনে মনে এই কথা-কয়টি বলিয়া কৃষ্ণমোহন মুমূর্ষু মতিলালের শিয়রে বসিয়া তন্ময়-চিত্তে করযোড়ে তাঁহার আত্মার মঙ্গলের জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষের শিয়রে ভগবানের নামামৃত উচ্চৈঃস্বরে

উচ্চারণ করিতে করিতে কৃষ্ণমোহন বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। এই বার কৃষ্ণমোহন অশ্রুজলে বক্ষস্থল ভাসাইয়া গাহিলেন,—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চসর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।

পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥
অমী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাঃ
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥
রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা

ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ।
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ।
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি।
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎসমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ”

ভগবানের নামগান করিতে করিতে কৃষ্ণমোহন একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, মতিলালের শেষ নিশ্বাস বহির্গত হইবার আর বিলম্ব নাই। গঙ্গা-মৃত্তিকায় ভগবানের নাম মতিলালের ললাটে ও বক্ষঃস্থলে লিখিয়া দিয়া অন্তিম সময়ে ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। রামতনু পশ্চাতে দাঁড়াইয়া “গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম” বল, বল, “গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম” বলিয়া আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিল। রামতনুর ব্যাকুল-ক্রন্দনধ্বনিতে পাষাণও বুঝি বিদীর্ণ হইয়া যায়!

দেখিতে দেখিতে মতিলালের শেষ নিশ্বাস বহির্গত হইয়া গেল। যেখানে জ্বালা নাই—যন্ত্রণা নাই—বিরহ নাই—রোগ শোক নাই—সেই ত্রিদিব জগতে মতিলালের আত্মা মহাপ্রস্থান করিল। রহিল কেবলমাত্র পাঞ্চ-

ভৌতিক দেহ। আর সরলা বালিকা শরৎকুমারীর সুখ-শান্তিও এই সঙ্গে চিরতরে মিশিয়া গেল।

শুভ্রবসন পরিহিতা একটি বিধবা উত্তর করিল, "ভাবিতে হইবে না বৌরাণী, রামতনু
[illegible]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বেদবাটীর শ্মশানে ধূ ধূ অগ্নি জ্বলিতেছে। কৃষ্ণমোহন প্রজ্বলিত চিতার সম্মুখে গম্ভীরভাবে বসিয়া মাঝে মাঝে এক একখানি শুষ্ক কাষ্ঠ জ্বলন্ত চিতার উপর ফেলিয়া দিতেছেন। অপর দিকে শরৎকুমারী ও রামতনু। শরৎকুমারী নিশ্চল, নিস্তব্ধ পাষাণের ন্যায় গম্ভীর; শরৎকুমারী জীবিতা কি মৃতা, সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় নাই, তাহার ক্রন্দন নাই, স্পন্দন নাই! শরৎকুমারী সেই পবিত্র শ্মশানে চিতাভস্মের উপর মৃতার ন্যায় পড়িয়া আছে। শরৎকুমারীকে মৃতাও বলিতে পারি না! ঐ দেখ, শরৎকুমারী এক একবার কটমট করিয়া মতিলালের জ্বলন্ত চিতার দিকে চাহিতেছে; আবার ঐ দেখ, মা পতিতপাবনী গঙ্গার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে! শরৎকুমারীর আজ লজ্জা-শরম কোথায় গেল? শরৎকুমারী যে কুলের কুলবধূ? শরৎকুমারী আলুলায়িত-কেশা, অর্দ্ধ-উলঙ্গিনীর ন্যায় জাহ্নবী-সলিল লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে কেন? ঐ দেখ, কৃষ্ণমোহন কত প্রকারে বুঝাইয়া ধরিয়া আনিতেছেন। শরৎকুমারী কি পাগলিনী? পাগলিনী বা কি করিয়া বলিব? শরৎকুমারীর জ্ঞান আছে। ঐ দেখ, শরৎ-

কুমারী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কৃষ্ণমোহনকে বলিতেছে "আপনি একবার আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া মনে করিবেন না, এবারেও বাঁচাইতে পারিবেন।" শরৎকুমারী তবে কি? শরৎকুমারীর অবস্থা বর্ণনা করিবার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। শরৎকুমারী আজ শোকের অতীত—দুঃখের অতীত! শোক বা দুঃখের যে একটা সীমা আছে, শরৎকুমারী আজ সে সীমার বাহিরে! এ অবস্থা ভাষায় বুঝান যায় না! সতী পতির বিচ্ছেদে যে অবস্থায় হাসিতে হাসিতে জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ হয়;—অর্দ্ধ দগ্ধ হইয়াও সতী যে অবস্থায় খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে আম্র-পল্লব ঘুরাইতে থাকে; যে অবস্থায় সতী পতির মৃত্যুর পর হাসিতে হাসিতে আসিয়া মৃত-স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করে—শরৎকুমারীর আজ সেই ভীষণ অবস্থা! বলিতে পার পাঠক, শোকের উপর সতী-রমণীর এই হাসি কোথা হইতে আসে? এই হাসি আনন্দের, না দুঃখের? সতীর পতি-বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় কি আনন্দ হয়? তবে ঘোর দুঃখের সময় পতি-বিয়োগবিধুরা সতী হাসে কেন? দুঃখের যখন সীমা থাকে না, তখন হাসির উদয় হয়! এ হাসি বড় ভীষণ—বড়ই কঠোর। সীমাহীন দুঃখরাশি যখন দুকূলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিতে থাকে, তখন চক্ষুর অশ্রুরাশি শুষ্ক হইয়া যায়, শরৎকুমারীর আজ সেই অবস্থা!

শরৎকুমারী আবার জাহ্নবীর পবিত্র জলরাশি লক্ষ্য করিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক পাগলিনীর ন্যায় দৌড়াইতে লাগিলেন। কৃষ্ণমোহন এবারেও বহু কষ্টে সান্ত্বনা করিয়া জ্বলন্ত চিতার পার্শ্বে শরৎকুমারীকে শয়ন করাইলেন। তারপর শরৎকুমারী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিল।

কৃষ্ণমোহন শরৎকুমারীর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছেন, শরৎ এমন করিতেছে কেন? অতি আসক্তি ও মোহ-বশেই শরৎকুমারী এমন করিতেছে। হায়! সংসারের মায়া-প্রপঞ্চ! শরৎকুমারী! তোমাকে কি দোষ দিব? সংসারের অতি বড় জ্ঞানীরাও মিথ্যাকে সত্য বস্তু মনে করিয়া এইরূপে যন্ত্রণা পাইয়া থাকেন। যাহা চিরদিন থাকে না,—থাকিতে পারে না, তাহাকে সত্য বস্তু মনে করিয়া মোহ-মদিরা পানে সংসারের কত শত জ্ঞানী পণ্ডিত বিভোর হইয়া আছেন। শরৎ! তুমি আমি আত্মীয়-বিচ্ছেদজনিত শোকে যন্ত্রণা পাইব, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শরৎ! আমার ন্যায় অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্যক্তি তোমাকে কি বুঝাইবে? বুঝাইবার সময়ও এখন আসে নাই—তোমার হৃদয়ের প্রবল শোকাবেগে এখন সমস্ত সত্য বাক্যই ভাসিয়া যাইবে। থাক শরৎ, জ্ঞানহীনা মৃতার ন্যায় যতক্ষণ পার পড়িয়া থাক! শোক-দুঃখের প্রবল স্রোতে ভগবান যেন তোমার হৃদয়ের

মলিনতা ধৌত করিয়া দিয়া সত্যজ্ঞান প্রদান করেন।

কৃষ্ণমোহন আবার দুইখানি শুষ্ক কাষ্ঠ প্রজ্জ্বলিত চিতার উপর ফেলিয়া দিলেন।

দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইল! মতিলালের সোনার কান্তি দেহ ভস্মে পরিণত হইল। পবিত্র জাহ্নবী-জলে সেই চিতাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া কৃষ্ণমোহন ভগ্নান্তঃকরণে শরৎকুমারীকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"দাদা! বেলা প্রায় আড়াই প্রহর অতীত হইয়া যায়, এখনও স্নান করিলেন না? আহ্নিক ও রামচন্দ্রের পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া ঠাকুর-ঘরে বসিয়া আছি। আসুন না,—অসুখ কর্‌বে যে?"

"যাই দিদি! তুমিও আমার জন্য অনাহারে কষ্ট পাইতেছ?"

একটি যুবতী বিধবা স্ত্রীলোক কৃষ্ণমোহনকে উপরি-উক্ত কথাগুলি বলিলেন। কৃষ্ণমোহন বলিলেন, "যাই দিদি, তুমিও আমার জন্য অনাহারে কষ্ট পাইতেছ?"

পাঠক! এই যুবতী বিধবা স্ত্রীলোকটি আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিতা শরৎকুমারী! মঙ্গলালের মৃত্যুর পর দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; কৃষ্ণমোহনের জ্ঞানোপদেশ ও সান্ত্বনায়, কৃষ্ণমোহনের জননীর স্নেহ, ভালবাসা ও যত্নে, সতত ভগবানের চিন্তা ও আরাধনায় শরৎকুমারীর শোকের অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। শরৎকুমারী এখন আর সে শরৎকুমারী নহে। শরৎকুমারী এখন ঋষিকন্যার ন্যায় দিবা-রজনী ভগবানের চিন্তাতেই অতিবাহিত করিতেছেন। শরৎকুমারী একবার একমুষ্টি আতপ চাউলের

অন্ন গ্রহণ করেন, তাহাও স্ব-ইচ্ছায় নহে! কৃষ্ণমোহনের কাছে শরৎকুমারী আহার করিতে না বসিলে কৃষ্ণমোহন আহার করিতে চায় না, এই জন্য!

"শরৎ, তুই এই দুধ দিয়া আর দুটি ভাত খা।" শরৎ যদি বলে, "না দাদা, আমার পেটে ধরে না।" তবে কৃষ্ণমোহন আহার করিতে করিতে ক্রোড়ের অন্ন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়েন। এরূপ ঘটনা অনেকবার হইয়াছে। কাজেই শরৎকুমারী এখন আর দাদার অনুরোধ না রাখিয়া পারে না শরৎকুমারীর বড় ভয় পাছে দাদা না খাইয়া উঠিয়া পড়েন! একদিন শরৎ একা রন্ধনগৃহে বসিয়া দুইটা ভাত মুখে দিয়া দাদাকে বলিয়াছিল, "আমার খাওয়া হইয়া গিয়াছে।" সেদিন কৃষ্ণমোহন আর আহার করিলেন না। শরৎকুমারী সেদিন কি কুকার্য্য করিয়াছি, ভাবিয়া অনুতাপে দিন যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

ভীষণ ম্যালেরিয়ার সারাবাটী গ্রাম—কেবল সারাবাটী গ্রাম নয়, হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। কে কার শুশ্রূষা করে,—কে কার মুখে জল দেয়,—অহর্নিশ ঘরে ঘরে আর্ত্তের চীৎকার-ধ্বনি! কৃষ্ণমোহন ভীষণ চিন্তায় মগ্ন! বেলা আড়াই প্রহর অতীত,—প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেব কৃষ্ণমোহনের মাথার উপর

দিয়া পড়িয়া পড়িতেছে; কৃষ্ণমোহনের স্নান আহ্নিক আহারের দিকে লক্ষ্য নাই; কৃষ্ণমোহন গভীর দুঃখ ও চিন্তায় উদ্বিগ্ন। দেশের উপায় কি হইবে? এরূপে নিত্য অসংখ্য নর-নারী ম্যালেরিয়ার করালগ্রাসে পতিত হইলে অল্প দিনেই হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলা শ্মশানভূমে পরিণত হইবে। কৃষ্ণমোহন যখন এই সমস্ত চিন্তামগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, তখন শরৎকুমারী আসিয়া কৃষ্ণমোহনকে স্নানাহারের জন্য অনুরোধ করিলেন।

কৃষ্ণমোহন এই দুইটা বৎসর শরৎকুমারী, জননী, বামতনু ও সোদরপ্রতিম দুর্গাপ্রসন্নকে লইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দেই জীবন কাটাইতেছিলেন। ধর্ম্মচিন্তা, শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, দেবপূজা, গ্রামের দীন-দুঃখীর সেবা ও সারাবাটীর জমি-জমাদির উন্নতির চিন্তা লইয়া তাঁহার সময় অতীত হইতেছিল। শরৎকুমারী বিধবা হইবার পর কেবলমাত্র কয়েক দিবস বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কৃষ্ণ-মোহনের দূরদর্শিতায় সমস্তেরই এখন সুবন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। ক্ষীরদা চিরদিন মতিলালের আশ্রয়ে ছিল, তাহাকে আশ্রয় দিবার আর কেহ নাই, এইজন্য কৃষ্ণ-মোহন শরৎকুমারীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শরৎকুমারীর স্বামীর ভদ্রাসনবাটী প্রভৃতি, যাহা কিছু ছিল জীবিত-কালের জন্য তাহাকে ভোগ-দখল করিতে ছাড়িয়া

দিয়াছেন। জহিরউদ্দিন গাড়োয়ান দস্যুহস্তে আহত হইয়া যদিও কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্নের সেবা ও যত্নে রক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু জহিরউদ্দিনের কাজকর্ম্ম করিয়া খাইবার ক্ষমতা নাই। জহিরউদ্দিনের দক্ষিণ হস্ত একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, বামপদে ভর দিয়া চলিবার শক্তি নাই, পায়ের হাড় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জহিরউদ্দিনের সংসারে তাহার স্ত্রী ব্যতীত আর কেহ ছিল না। কৃষ্ণমোহন শরৎকুমারীর পরামর্শে জহিরউদ্দিনকে বৈদ্যবাটীর দোকানখানি চিরদিনের জন্য নিঃস্বত্ব হইয়া দান করিয়াছেন এবং একটি উপযুক্ত ব্যক্তিকে দোকানের কাজকর্ম্ম চালাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। জহিরউদ্দিন স্ত্রী ও গাড়ীখানি লইয়া বৈদ্যবাটীতেই বাস করিতেছে। এখানে গাড়ীখানির আয়ও বৃদ্ধি হইয়াছে। দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রতি মাসে একবার করিয়া আসিয়া দোকানের হিসাবপত্র সমস্ত দেখা-শুনা করিয়া যান। জহিরউদ্দিনকে যদি কেহ কখন জিজ্ঞাসা করিত, "চাচা, এই দোকানখানি কি তোমারই?" জহিরউদ্দিন বামহস্ত উঠাইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইত। জহিরউদ্দিন বলিত, "দোকান শরৎকুমারীর, আমি তাহার বেতনভোগী অযোগ্য ভৃত্যমাত্র।"

শরৎকুমারী যেদিন জহিরউদ্দিনকে ডাকিয়া বলিল,

"বাবা! আমার জন্যই তোমার আজ এই দুর্দ্দশা,—তুমি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতে, তাহাতেই তোমাদের উভয়ের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত; কিন্তু এখন আর তোমার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা নাই। আমি যে কয়দিন বাঁচিব, তোমার কষ্ট ও দুর্দ্দশার কথা ভুলিতে পারিব না; আমিই যে তোমার কষ্টের মূল একথা চিরদিন আমার স্মরণ থাকিবে। বাবা! তুমিও যদি বৈদ্য-বাটীর লোকটির ন্যায় পলাইয়া যাইতে, তাহা হইলে তোমার এই শোচনীয় দশা ঘটিত না। আমাকে রক্ষা করিবার জন্য বারবার ডাকাতদের অনুরোধ করাতেই তোমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আমি তোমার দীনা বিধবা কন্যা! আমার আর কিছুই নাই,—কি দিয়া তোমার ভালবাসার ঋণ শুধিব! সেই দোকানখানি তোমায় দান করিলাম। আজ হইতে সেই দোকানখানি আমার নহে, তোমার। চিরজীবন আমি তোমার ঋণে আবদ্ধ থাকিলাম, তোমার দীনা কন্যাকে ক্ষমা করিও।"

জহিরউদ্দিন শরৎকুমারীর কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল—"মেয়ে, গরিব বলিয়া আমাকে এমন কথা বলিস্? আমার যদি আজ হাত পা থাকিত, তবে তোর বৈধব্য-বেশ দেখিয়া আমি এক দণ্ডও এদেশে থাকিতাম না। স্ত্রীর হাত ধরিয়া দেশে

দেশে ভিক্ষা মাগিয়া খাইতাম। আমি তোর দোকান লইয়া কি করিব মেয়ে? দোকানখানিই যে তোর সম্বল। এমন কথা আর কখনও বলিস্ না।"

শরৎকুমারী বলিল—"বাবা! আমার ধন অর্থের কিছুই প্রয়োজন নাই, জীবনধারণের জন্য দিনান্তে এক-মুষ্টি তণ্ডুল, ইহার জন্য বিধবার চিন্তা কি? অন্য চিন্তা থাকিলে বিধবার স্বামীপদ চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটে। আমার কিছুই নাই, কি দিয়া তোমার উপকার ও ভালবাসার ঋণ পরিশোধ করিব? যাহা দিতেছি, তাহা ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র। তুচ্ছ দান লইতে যদি অস্বীকৃত হও, বুঝিব তুমিও আমাকে ত্যাগ করিলে।" এই বলিয়া শরৎকুমারী জহির-উদ্দিনের হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

জহিরউদ্দিন শরতের অনুরোধ এড়াইতে পারিল না। বুঝিল, স্বীকৃত না হইলে শরৎ দিন দিন এইরূপ কান্নাকাটী করিবে। অগত্যা জহিরউদ্দিন বৈদ্যবাটীতে আসিয়া বাস করাই স্থির করিল। জহিরউদ্দিন ভ্রমেও দোকানের একটি পয়সা ব্যয় করিত না, তাহার গরু দুটীর উপায়ই যথেষ্ট হইত; দোকানের সমস্ত আয় জমা করিতে আরম্ভ করিল। কেহ জিজ্ঞাসা না করিলেও জহিরউদ্দিন অন্য কথার অবতারণা করিয়া বলিত, এটী শরৎকুমারীর দোকান।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শরৎকুমারী, কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্ন, তিন ভাই-ভগিনীতে আজ ভীষণ চিন্তায় মগ্ন! কি উপায়ে এই ভীষণ ম্যালেরিয়ার কবল হইতে গ্রামবাসী রক্ষা পাইবে,—কি করিলে ঘরে ঘরে ক্রন্দনধ্বনির নিবৃত্তি হইবে—কেমন করিয়া এই দীন-দুঃখী নিরাশ্রয়গণের সেবা শুশ্রূষা ও ঔষধাদির বন্দোবস্ত হইবে;—কেই বা অসংখ্য শবদেহের সংকার করিয়া শৃগাল-কুক্কুরের ভীষণ রব নিবৃত্তি করিবে!

কৃষ্ণমোহনের আর অন্য স্থানের সংবাদ লইবার অবসর বা সময় নাই। চারিদিকেই বিকট চীৎকার-ধ্বনি উঠিয়াছে। কৃষ্ণমোহন সারাবাটী ও তন্নিকটস্থ দুই-চারিখানি গ্রাম লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন। অহোরাত্র কুক্কুর শৃগালের বিকট চীৎকারে জীবিত মনুষ্যও দ্বারের বাহির হইতে ভয় পাইতেছে। কৃষ্ণমোহন ভাবিতেছেন, ভগবান্ এ কি করিলেন? হায়! কি পাপে—কাহার অভিশাপে সোনার সারাবাটীর আজ এই দুর্দ্দশা হইল! সারাবাটীর নিকটস্থ মায়াপুর, রসুলপুর, বাঘর-চক, হরাদিত্য, বলরামপুর, মোহনপুর, মুথাডাঙ্গা, ধরমপোতা প্রভৃতি পঞ্চাশখানি গ্রাম একেবারে শ্মশানে পরিণত হইবার

উপক্রম হইয়াছে;—স্বয়ং যমরাজ বুঝি হুগলী জেলার এই সমস্ত গ্রামগুলি ধ্বংসমুখে প্রেরণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন,—তাই ভীষণ ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী করাল-বদন-ব্যাদান করিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

সারাবাটী ও তন্নিকটস্থ গ্রামগুলি হইতে ঘরে ঘরে অহোরাত্র ভীষণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইতেছে। এই ক্রন্দন-ধ্বনির সঙ্গে শৃগাল কুক্কুরের বিকট রবের কি ভীষণ সমাবেশ! স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনীসহ সারাবাটীর যে গৃহে ছয়জন লোক বাস করিতেছিল, ম্যালেরিয়া আক্রমণে দুই-জনের মৃত্যু হইয়াছে, একজনের মৃত্যু হইবার আর বিলম্ব নাই; দুইজনের কম্প দিয়া জ্বর আসিল, তাহারাও শয্যা-গ্রহণ করিল, দু পাঁচদিন পরে এই শয্যাই তাহাদের মৃত্যু-শয্যায় পরিণত হইল। যাহাদের গৃহে ভ্রাতা ভগিনীসহ সুস্থ ও সবলকায় দশজন লোক মনের আনন্দে দিনযাপন করিতেছিল, তাহাদের পাঁচজনের মৃত্যু হইয়াছে, দুইজন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় শবদেহের পার্শ্বে পড়িয়া আছে,—তিন-জনের কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে, তাহারাও শয্যা গ্রহণ করিল। কোন গৃহে দুইজন লোক, একজনের মৃত্যু হইয়াছে, একজন প্রবল জ্বরে উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়া আছে,—শৃগাল কুক্কুর আসিয়া দুইদিকে দুইজনকে টানিয়া লইয়া চলিল। যেদিকে চাহিয়া দেখিবে, সেই-

দিকেই এই দৃশ্য! চারিদিকে শৃগাল-কুক্কুরের দল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে;—কোথাও মৃতদেহ, কোথাও বা জীবন্ত দেহ শৃগাল কুক্কুরে মনের আনন্দে ছিঁড়িয়া খাইতেছে। কি ভীষণ হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! ঘরে বাহিরে শবদেহ—শ্মশানে শবদেহ—পুষ্করিণীতে শবদেহ—পথে, ঘাটে, মাঠে যেদিকে চাহিবে, কেবল শবরাশি! একখানা মানব-হস্ত বা দেহের একখণ্ড অস্থি লইয়া শৃগাল-কুক্কুরের কি বিবাদ ও ভয়ঙ্কর বিকট চীৎকার ধ্বনি! সন্ধ্যার পর কুক্কুর শৃগালের ভয়ে গৃহের বাহির হইবার উপায় নাই। তদুপরি চারিদিকে পচা শবদেহের উৎকট দুর্গন্ধ! এই ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী ভাদ্র মাসের শেষভাগে আগমন করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে হুগলী জেলার অধিকাংশ গ্রাম একেবারে ধ্বংসমুখে প্রেরণ করিয়াছিল।

সেই ম্যালেরিয়া বৎসরের ভীষণ দৃশ্য লেখনীমুখে বর্ণনা করা অসাধ্য! এখনও এই সমস্ত গ্রামের অধিবাসীগণ ম্যালেরিয়ার বৎসরের নাম শুনিলে চমকাইয়া উঠে! তাহাদের পিতৃ পিতামহগণের মুখে ম্যালেরিয়ার বৎসরের যে সব ভীষণ কাহিনী শুনিয়া এখন গল্প করে, সে সব কথা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। হুগলী জেলার অধিকাংশ গ্রাম এই ম্যালেরিয়ার বৎসরে দানবের লীলাভূমি হইয়াছিল। তন্মধ্যে সারাবাটী ও মায়াপুর গ্রাম একবারে

লোকশূন্য হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রাম দুইখানির বোধ হয় চৌদ্দআনা লোক ম্যালেরিয়ার করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে সারাবাটী ও মায়াপুর গ্রামের যে শ্রী ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। পাঠক-পাঠিকাগণ এখন যদি একবার সারাবাটী ও মায়াপুর গ্রামে পদার্পণ করেন, অশ্রু সংবরণ করিতে পারিবেন না। সারাবাটীর মাঠ এখনও পূর্ব্বের ন্যায় আছে, কিন্তু ক্ষেত্রে ফসল নাই, দামোদরের ভীষণ বন্যায় সারাবাটীবাসীদের সেই আদরের ক্ষেত্রগুলিতে এখন কেবল দুর্ব্বাঘাস গজাইয়া আছে! যে সারাবাটী ও মায়াপুর গ্রামে মানব-কল্লোলে গ্রামবাসীগণ রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারিত না, সেই গ্রামে শৃগাল কুকুরের কণ্ঠস্বর ভিন্ন এখন আর কিছুই শ্রুত হয় না! যে গ্রামে চারি হস্ত পরিমাণ ভূমিখণ্ডও পতিত ছিল না, লোকের বসতির পর বসতি—গৃহের পর গৃহ—দেবালয়ের পর দেবালয়ে যে গ্রাম অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত, সেই সোনার গ্রাম এখন কেবল পতিতজমি, জঙ্গল ও গৃহের ভগ্নাবশেষে ইহার পূর্ব্ব-গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছে! যে গ্রামে গৃহে গৃহে মা আনন্দময়ীর আগমনে একদিন প্রতি গৃহ আনন্দে মুখরিত হইত, যে গ্রামে বিজয়া দশমীর দিন অন্যূন তিনশতখানি আনন্দময়ীর প্রতিমা ময়রা পুষ্করিণীতে

বিসর্জ্জনের জন্য বাহির হইত, সেই গ্রামের দূর দূরান্তর হইতেও এখন বিসর্জ্জনের বাদ্য শুনিতে পাওয়া যায় না! একদিন এই গ্রামে মা আনন্দময়ীর আগমনে চারি দিন দীন-দুঃখীর রন্ধনশালায় অগ্নি জ্বলিত না। দুলে, বাগ্দী, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল সকল জাতীয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় মনের আনন্দে প্রতিগৃহে আহার পাইত। ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ, কে কোথায় আহার করিবে স্থির করিতে পারিত না। একদিন এই সমস্ত গ্রামে ব্রাহ্মণের জন্য ঘরে ঘরে উপরোধ অনুরোধ চলিত। সকলেরই ইচ্ছা, আমার গৃহে আজ অধিক ব্রাহ্মণের পদধূলি পড়ুক। সকলেই পূজনীয় ব্রাহ্মণগণকে চরণে ধরিয়া মিনতি করিত, "আজ মহাষ্টমীর দিন, আজ যেন আমার গৃহে পদার্পণ হয়।" কর্ম্মকর্ত্তা মধ্যাহ্ন-ভোজনের পুর্ব্বে ব্রাহ্মণ-গৃহে যাইয়া চরণে ধরিয়া কত মিনতি করিতেছেন, সেই সময়ে অন্যান্য বাটীর কর্ত্তারাও যাইয়া তদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণ কাহার গৃহে যাইয়া পদধূলি দিবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেন না। হায়, সারাবাটী বা মায়াপুর গ্রামে আর সে দৃশ্য নাই! এখন আর মহামায়ার একখানি প্রতিমাও কেহ দেখিতে পায় না। ইতরশ্রেণীর দীন-দুঃখীগণের একমুষ্টি অন্ন পাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার এখন আর স্থান নাই। সারাবাটী

গ্রামের কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধরগণ যে গৃহে মা আনন্দময়ীকে আনিয়া সপ্তাহকাল সহস্র সহস্র দীন-দুঃখীগণকে অকাতরে অন্নব্যয় করিতেন—যে গৃহে অকাল মন্বন্তরে—সেই ভীষণ ১২৭২ সালের দুর্ভিক্ষে মাসাধিক কাল অন্নছত্র খুলিয়া নিত্য সহস্র সহস্র অনাহারে কঙ্কাল-সার দীন দুঃখীকে অন্নদান করিয়া জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন—সেই কৃষ্ণমোহনের বাসভবন এখন ম্যালেরিয়ার কল্যাণে বনভূমিতে পরিণত হইয়াছে! যে গৃহে অন্যূন অর্দ্ধলক্ষ নরনারী দুর্ভিক্ষ বৎসরে সপ্তাহকাল অনশন যন্ত্রণার পর উদর পূরিয়া অন্নাহারে জীবনরক্ষা করিয়াছে—সেই কৃষ্ণমোহনের বাসভবন এখন ভীষণ ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে শৃগাল-কুকুরের বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। কৃষ্ণমোহনের বংশধরগণ জীবিত আছেন, কিন্তু ভীষণ ম্যালেরিয়ার আশঙ্কায় ও দামোদরের বন্যার অত্যাচারে কেহই পৈত্রিক বাসভূমিতে বাস করিতে সাহসী হন না। যে দুর্ভিক্ষ সময়ে কৃষ্ণমোহনের বংশধর স্বর্গীয় রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামময় বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নদানে অসংখ্য নরনারীকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়া অশেষ পুণ্যসঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, জানি না, তাঁহাদের বাসভবন আজ শৃগাল কুকুরের বাসভবনে পরিণত হইল কেন? যদি কখন ম্যালেরিয়া রাক্ষসী এই দেশ ও সারাবাটী গ্রাম

পরিত্যাগ করে, যদি কখন দামোদরের ভীষণ বন্যাস্রোত ভগবানের ইচ্ছায় অপর নদনদীর অঙ্গে মিশাইয়া দেয়, যদি কখন কৃষ্ণমোহনের বংশধর স্বর্গীয় রামময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাত্মার বংশে ধার্ম্মিক ও পিতৃপিতামহের কীর্ত্তি-কলাপ ও পৈত্রিক ভদ্রাসনের সম্মান রক্ষার উপযুক্ত বংশধরের উৎপত্তি হয়, তবে হয় ত সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষদের যে ভদ্রাসনে পদরেণুর ক্ষুদ্র কণা পড়িয়া আছে, সেই স্থল আবার একদিন উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইবে। জানি না ভগবান! এমন দিন কখন আসিবে কি না? জানি না ভগবান লেখকের এই ভবিষ্যদ্বাণী কখন সফল করিবেন কি না! মহাত্মা রামময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধরগণ! জানিবে না—বুঝিবে না—যে সারাবাটী গ্রাম তোমাদের পিতৃপুরুষগণের কত প্রিয় ছিল! তোমরা হয় ত জানিবে না যে, এই স্থলে তোমাদের পিতৃপুরুষের কত কীর্ত্তি-কলাপের নীরব প্রতিধ্বনি এখনও উত্থিত হইতেছে! এই "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমিতে বসিয়া তোমাদের পিতৃপিতামহগণ দান, ধ্যান, পরোপকার, দীনসেবা, অতিথি-সৎকার, স্বার্থত্যাগ, মা আনন্দময়ী দশভূজার পূজায় মন প্রাণ সমর্পণ, পরের জীবনরক্ষার্থে নিজ জীবন উৎসর্গ; গৃহদেবতা ৺রামচন্দ্রদেবের পূজা, আরতি ও নিত্য ভোগের ব্যবস্থা, নিজ ক্ষুধার অন্ন হইতে

দীন দুঃখীকে অন্নদান প্রভৃতি নিত্য কত সৎকার্য্যই করিয়াছেন। ভাবী বংশধরগণ! তোমরা কি তাঁহাদের পদরেণু মস্তকে লইয়া তাঁহাদের প্রাণের বাসনা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইবে না? এই মহৎ বংশে কি এমন সুপুত্রের উদ্ভব অসম্ভব?

পাঠক পাঠিকাগণ! কথায় কথায় মনের আবেগে অন্য কথায় আসিয়া পড়িয়াছি। কৃষ্ণমোহন, শরৎকুমারী ও দুর্গাপ্রসন্ন আজ ভীষণ চিন্তায় নিমগ্ন! গ্রামবাসীর দুঃখদুর্দ্দশা এবং চক্ষুর সম্মুখে ভীষণ মৃত্যু দেখিয়া তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন! প্রাণে শান্তি নাই.— আহার নিদ্রায় মনোযোগ নাই, নিজ নিজ জীবনে মমতা নাই, তিলার্দ্ধের জন্য বিশ্রাম নাই। কৃষ্ণমোহন ও শরৎ-কুমারী গৃহে গৃহে—পাড়ায় পাড়ায় গিয়া ঔষধ, পথ্য ও রোগীর শুশ্রূষায় দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছেন। দুর্গাপ্রসন্ন রামতনুকে সঙ্গে লইয়া শবদাহের ব্যবস্থা করিতেছেন। রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, শরৎ-কুমারী যাইয়া সেই চেতনাহীন মস্তক নিজ ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন, রোগীর মলমূত্র দক্ষিণ হস্তে পরিষ্কার করিয়া পৃথক শয্যায় শয়ন করাইলেন। কৃষ্ণমোহন যাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন এবং কখন কি ঔষধ খাওয়াইতে হইবে, তাহার উপদেশ দিয়া আসিলেন।

দেখিতে দেখিতে সেই গৃহের অপর একজন রোগীর জীবলীলা শেষ হইয়া গেল। দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনু আসিয়া শবদেহ স্কন্ধে লইয়া শ্মশানে ফেলিলেন! শ্মশানে আবার একটি চিতা জ্বলিতে লাগিল। ধূ ধূ করিয়া সর্ব্বদাই চিতার অগ্নি জ্বলিতেছে, চারিদিক্ হইতে রামতনু ও দুর্গাপ্রসন্ন শবদেহ আনিয়া ফেলিতেছে। কৃষ্ণমোহন ও শরৎকুমারীর মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম নাই,—দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনুর তিলার্দ্ধের অবসর নাই। অনাহার, অনিদ্রা ও কঠিন পরিশ্রমে শরৎকুমারী বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছে না; তথাচ শরৎকুমারীর বিশ্রাম নাই,—রোগীর পার্শ্বে বসিয়াই শরৎকুমারীর রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়া যাইতেছে। শরৎকুমারীর অবস্থা দেখিয়া একদিন কৃষ্ণমোহন বলিলেন, "দিদি শরৎ! তুমি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ,—তোমার চক্ষু বসিয়া গিয়াছে—মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না—তুমি একদিন বিশ্রাম কর। তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই ভয় হইতেছে। একটু নিদ্রা যাওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে; অদ্য রাত্রে তুমি গৃহের বাহির হইও না।"

শরৎকুমারী বলিলেন, "দাদা, আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কোন কষ্টই নাই। আপনি আমাকে সহোদরা অপেক্ষাও স্নেহ করেন, তাই বাহিক চেহারার বৈলক্ষণ্য

দেখিয়া দুঃখিত হইতেছেন, কিন্তু দাদা! আমার অন্তরের অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন! রোগ-যন্ত্রণায় কাতর অসংখ্য লোকের মৃত্যু দেখিয়া হৃদয় বিচলিত হইতেছে বটে, কিন্তু প্রাণপণে আমি যে সেবাব্রত পালন করিতে পারিতেছি, ইহাই আমার শান্তি! ইহাই আমার আনন্দ! এই শান্তির নিকট কোন বিশ্রাম স্থান পায় না।”

কৃষ্ণমোহন।—ইহা আমার ভগিনীর মতই কথা বটে! শরৎ, তোমার অন্তঃকরণ যে আমার চেয়েও বড়, তাহা এতদিন জানিতে পারি নাই! আমার অনুরোধে শরৎ, তুমি একটা রাত্রি বিশ্রাম কর, দেহটা ত রক্ষা করিতে হইবে।

শরৎকুমারী। দাদা! আপনার কাছেই ত শিখিয়াছি, আত্মবলিদান ব্যতীত পরের জীবনরক্ষা হয় না! আমি যাহা করি, সকলই আপনার শিক্ষায়। আপনিই ত শিখাইয়াছেন, নিজের জীবন দিয়াও অনাথ ও আশ্রয়হীনের জীবন রক্ষা করিবে। দাদা! এই অকিঞ্চিৎকর জীবন কখনও কাহারও উপকারে আসিবে না; আজ দীন দুঃখীর সেবা করিতে করিতে যদি এই জীবনের ক্ষয় হয়, তাহা হইলেও বুঝিব, এই জীবনটা ভগবানের রাজ্যে কিছু কাজে লাগিল।

কৃষ্ণমোহন চাহিয়া দেখিলেন, শরৎকুমারীর মুখে কি

যেন একটা স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইতেছে। কৃষ্ণমোহন শরৎকুমারীর মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন—দেখিলেন, স্নেহ, দয়া, সরলতায়—এত অনিদ্রা, অনাহারেও শরৎকুমারীর মুখখানি ঢলঢল করিতেছে। শরৎকুমারীকে যেন দেবীপ্রতিমা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়।

কৃষ্ণমোহন বলিলেন, "শরৎ! তোমার জীবনটা তোমার কাছে আদর যত্নের জিনিষ না হইলেও, তোমার স্নেহ-মমতা না পাইলেও, আমার কাছে বড়ই আদরের, বড়ই স্নেহের। তোমাকে বারবার অনুরোধ করিতেছি, আজ রাত্রিটা তুমি বিশ্রাম কর, আজ আর কোথাও যাইও না! আমরা তিন জনে যতদূর সাধ্য হয় সকল গৃহেই ঘুরিয়া বেড়াইব।"

শরৎকুমারী বলিলেন, "দাদা! তোমার আদেশ আমার অলঙ্ঘনীয়, আমি আজ গৃহেই থাকিব; কিন্তু নিদ্রা আমার হইবে না! রুগ্নের তপ্ত নিশ্বাসে,—মুমূর্ষের আর্ত্তনাদে,—আত্মীয়বিয়োগবিধুরজনের কাতর ক্রন্দনে,—নিরাশ্রয় রোগীর রোগ-যন্ত্রণায় আমি কি শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পারিব? আমি—"

শরৎকুমারী কৃষ্ণমোহনকে আরও কি বলিতেছিলেন, এমন সময় রামতনু দৌড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই স্থলে উপস্থিত হইল।

কৃষ্ণমোহন শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে রামতনু ?

রামতনু বলিল,—"খানিকটা দুধ লইতে আসিয়াছি। আহা! সেই বেচা দুলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে মারা গিয়াছে! তাহার স্ত্রী সমস্ত দিন প্রসব বেদনায় অস্থির হইয়া স্বামীর পা দুখানি জড়াইয়া পড়িয়া ছিল, এখন একটি সন্তান প্রসব করিয়া শোকে দুঃখে ও যন্ত্রণায় অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে। ছেলেটি ট্যা ট্যা করিয়া কাঁদিতেছে; জননী মৃতস্বামীর পার্শ্বে মৃতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে! ছেলেটির মুখে কি দিব তাই দৌড়িয়া একটু দুধ লইতে আসিয়াছি। আমি আর দেরি করিতে পারিতেছি না। দিদি! শীঘ্র একটু দুধ আনিয়া দাও।"

কৃষ্ণমোহন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভগবান! কি পাপে সোণার সারাবাটীর আজ এই দুর্দ্দশা হইল ?"

শরৎকুমারী তাড়াতাড়ি একবাটি দুগ্ধ গরম করিয়া আনিয়া বলিলেন, "দাদা! আমি একবার যাইয়া দেখিয়া আসি! আমাকে আজ আর বিশ্রাম করিতে বলিবেন না! রামতনু একা কি করিবে, আমাকে রামতনুর সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিন্।"

কৃষ্ণমোহন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যাও

দিদি! ভগবান বুঝি এইজন্যই তোমাকে সারাবাটীতে পাঠাইয়াছেন—ভগবানের রাজ্যে তোমার ন্যায় দেবী-প্রতিমার বিশ্রামের আবশ্যকতা নাই।"

শরৎকুমারী ঊর্দ্ধশ্বাসে রামতনুর সঙ্গে বেচা তুলের গৃহে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্ব শোক উথলিয়া উঠিল। শরৎকুমারী দেখিলেন, বেচা তুলে মৃত্যুশয্যায় শায়িত—পার্শ্বে সদ্যপ্রসূতা স্ত্রী চৈতন্যহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে। স্ত্রীলোকটীর বসন শোণিতধার ভাসিয়া যাইতেছে। শরৎকুমারী মনে মনে বলি হায়! কি দেখিলাম—দেখিয়া যে বুক ফাটিয়া যাইতেছে একদিন আমার দেবতাও এইরূপে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন! শরৎকুমারীর অশ্রুধারায় বসন সিক্ত হই গেল। পরক্ষণে শরৎকুমারীর চৈতন্য হইল; ভাবিলে আমি কি কার্য্য করিতে আসিয়া কি করিতেছি? ... রমণী সংজ্ঞাহীনা, সদ্যজাত শিশু একবিন্দু দুগ্ধাভাবে ... প্রায় হইয়াছে! শরৎকুমারী তাড়াতাড়ি শিশুর ক্রোড়ে লইয়া বিন্দু বিন্দু দুগ্ধ মুখে দিলেন,—...ইয়া ক্রন্দন নিবৃত্তি হইল। রামতনু দুই লাফে বাঁশের ... আনিয়া শরৎকুমারীর হস্তে প্রদান করিল, শর...কটী নাড়ী কাটিয়া শুষ্ক বস্ত্র বিছাইয়া ছেলেটীকে শয়ন ...ইলেন। রামতনু দৌড়িয়া কোথা হইতে দুই বো...টী

কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিল। শরৎকুমারী গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া—বেচা দুলের পত্নীর শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলেন। স্ত্রীলোকটির শোণিতসিক্ত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া তাহাকে একটি পৃথক্ শয্যায় শয়ন করাইলেন এবং অগ্নির তাপ দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ শুশ্রূষার পর একটু একটু গরম দুগ্ধ মুখে দিয়া চেতনা সম্পাদন করিলেন। কৃষ্ণমোহন রাত্রে দুইবার আসিয়া খিয়া গেলেন এবং উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। সন্ন ও রামতনু বেচা দুলের শবদেহ স্কন্ধে লইয়া াভিমুখে চলিল। যাইবার সময় রামতনু বলিয়া গেল ি, আমি এখনই ফিরিয়া আসিতেছি। শবদেহ দুর্গাপ্রসন্ন হ করিতে লাগিল, রামতনু মাঝে মাঝে লম্ফ দিয়া ড়িয়া আসিয়া শরৎকুমারীকে দেখিয়া যাইতে লাগিল। রাত্রির সেবা-শুশ্রূষায় স্ত্রীলোকটি একটু সুস্থ হইল তাহাকে সান্ত্বনা করিতে শরৎকুমারীর অনেক সময় ত হইয়া গেল।

াভাতে বেচারামের স্ত্রী শরৎকুমারীর গলা জড়াইয়া া করিতে করিতে বলিল, "মা! তুমি কি স্বর্গের যদি স্বর্গ হইতে এই হতভাগিনীর গৃহে দয়া পদার্পণ করিয়াছ, তবে মা কেন আমাকে বাঁচাইলে ন আমাকে স্বামীর সঙ্গে যাইতে দিলে না?"

শরৎকুমারী নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিয়া শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে দিয়া বলিলেন, "মা! ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন এইটী তোমার বাঁচে। আমিও মা, তোমার ন্যায় অনাথিনী। মরিলে কি হইবে মা, স্বামীমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া—স্বামীপদ বুকে রাখিয়া সংসারের কার্য্য কর, তোমার শিশুপুত্রটিকে মানুষ কর!"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "মা! তুমি চলিয়া গেলে বাঁচিব তোমাকে দেখিয়াই বাঁচিতে ইচ্ছা হইতেছে, তুমি আবার কখন আসিবে মা?"

শরৎকুমারী বলিলেন, "সময় পাইলেই আসিব,—প্রত্যহ দুই বার আসিয়া তোমায় দেখিয়া যাইব। আমি এখন দুধ আনিতে যাই—এখনই দুধ লইয়া আসিব।" এই বলিয়া শরৎকুমারী দুগ্ধ আনিবার জন্য চলিয়া গেলেন। অর্দ্ধপথে রামতনুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। রামতনু এক বাটি গরম দুগ্ধ লইয়া হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। শরৎকুমারী রামতনুকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, আবার নানারূপ বুঝাইলেন, শিশু ও শিশুর জননীকে দুগ্ধপান করাইয়া আবার আসিব, বলিয়া গেলেন। পথে আসিতে আসিতে প্রতি বাটীতে সংবাদ লইলেন, কে কেমন আছে। একটী গৃহে দেখিলেন, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িতা একটী বিধবা রমণীর পার্শ্বে একটি শিশুসন্তান চীৎকার করিতেছে। রমণীটী

জাতিতে কৈবর্ত্ত। এক পক্ষ অতীত হয় নাই, ম্যালে-রিয়ার করাল গ্রাসে ইহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, দুইটী পুত্র ও একটী কন্যার মধ্যে একটী পুত্র ও কন্যাটীর মৃত্যু হইয়াছে। ছয় মাসের দুগ্ধপোষ্য শিশুটী লইয়া হতভাগিনী বহু আশায় বাঁচিয়াছিল। তাহা বুঝি বিধির অভিপ্রেত নহে। হতভাগিনী ম্যালেরিয়া জ্বরে অজ্ঞান, অচৈতন্য হইয়া আছে; শিশুটি পার্শ্বে পড়িয়া ক্ষুধার তাড়নায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। শরৎকুমারী স্ত্রীলোকটীর পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া অনেকবার ডাকিলেন, চৈতন্য নাই। গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন, প্রবল জ্বরে হতভাগিনী বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছে। শরৎকুমারী শিশুটীকে ক্রোড়ে তুলিয়া ক্রন্দন নিবৃত্তির জন্য কতপ্রকার আদর করিতে লাগিলেন—বক্ষস্থলে তুলিয়া গৃহের চারিদিকে পদচারণা করিতে লাগিলেন, কিছুতেই ক্রন্দনের নিবৃত্তি হইল না। শরৎকুমারী বুঝিলেন, শিশুটী ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া কাঁদিতেছে। শিশুটীকে ক্রোড়ে তুলিয়া শরৎকুমারী গৃহের বাহিরে আসিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। দুই একটি কুক্কুর শৃগাল ব্যতীত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। শরৎকুমারীর ইচ্ছা ছিল যদি কাহাকেও দেখিতে পান, তবে দুর্গাপ্রসন্ন বা রামতনুকে সংবাদ পাঠা-ইয়া এই শিশু ও ইহার জননীর জীবনরক্ষার উপায়

করিবেন। শিশুটির শুষ্ক ও ভগ্নকণ্ঠের ক্ষীণ ক্রন্দনস্বরে শরৎকুমারী বুঝিতে পারিলেন, পূর্ব্বদিন হইতে স্তন্য বা গব্য-দুগ্ধ বিন্দুমাত্রও শিশুর উদরে যায় নাই। ছয় মাসের শিশু পূর্ব্বদিন হইতে অনাহারে আছে, আহারাভাবে আর কতক্ষণ বাঁচিতে পারে? শিশুর ক্রন্দনস্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। শরৎকুমারী শিশুটির জীবনরক্ষার জন্য ব্যাকুলচিত্তে ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে রামতনু, দুর্গাপ্রসন্ন বা কৃষ্ণমোহনের সহিত সাক্ষাতের আশায় চতুর্দ্দিকে কাতরভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারী কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া গৃহাভিমুখে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, আবার উদাসনয়নে ব্যাকুলভাবে চারিদিকে বারবার চাহিয়া দেখিতেছেন, যদি কাহাকেও দেখিতে পান। শরৎকুমারীর চতুর্দ্দিকে কাতরদৃষ্টি বারবার ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে! "ভগবান! সারাবাটী কি একবারেই লোকশূন্য করিলেন?—একটী প্রাণীও এই বিপদের সময় আমার নয়নপথে পতিত হইল না যে, ভ্রাতৃগণের নিকট সংবাদ পাঠাই" এই বলিয়া দয়ার প্রতিমা শরৎকুমারী কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শরৎকুমারীর কোমল হৃদয়খানি ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল! অনাহারে জঠরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া কোমলপ্রাণ শিশু বক্ষঃস্থলেই ঢলিয়া

পড়িবে, ইহা কি শরৎকুমারীর সহ্য হয়? গৃহে শিশুর মুমূর্ষু মাতাকে বুঝি এতক্ষণ শৃগাল কুকুরে মনের আনন্দে ভক্ষণ করিতেছে—আর কোমলপ্রাণা শরৎকুমারীর পবিত্র স্নিগ্ধ বক্ষঃস্থলে বিধাতার নাড়ীছেঁড়া ধন একটু দুগ্ধাভাবে বৃন্তচ্যুত শুষ্কপুষ্পের ন্যায় ঝরিয়া পড়িতেছে! শরৎকুমারী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। চৈতন্যহীনা শিশুর মুমূর্ষু জননীকে ত্যাগ করিয়া গেলে হতভাগিনী জীবন্ত অবস্থাতেই শৃগাল কুকুরের উদরে যাইবে, এদিকে একটু দুগ্ধের সংগ্রহ না হইলে চক্ষের উপর জীবন্ত শিশুর প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে। দেবীরূপিণী শরৎকুমারী পাগলিনীর ন্যায় শিশুটীকে বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। অশ্রুবারিতে শরৎকুমারীর বক্ষঃস্থল প্লাবিত! শিশু ও শিশুর জননীর প্রাণরক্ষার জন্য ভগবানের চরণে একান্ত প্রার্থনা! চাহিয়া দেখ বঙ্গকুলাঙ্গনাগণ! শরৎকুমারী তোমাদিগকে সংসারে কি পথ দেখাইয়া যাইতেছেন।

শরৎকুমারী স্বর্গের দেবীমূর্ত্তিতে শিশুবক্ষে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে চতুর্দ্দিকে চাহিতেছেন, মনুষ্যমূর্ত্তি তাঁহার ব্যাকুলনয়নে পতিত হইতেছে না। আবার শরৎকুমারী ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন "ভগবন্! দুঃখিনী কন্যা চরণে এত কি অপরাধ করিয়াছে যে, একবিন্দু দুগ্ধের অভাবে এই অনাথ শিশু আমার বক্ষে প্রাণত্যাগ করিবে?

আপনার জগৎ-ভাণ্ডারে এতই কি অভাব হইয়াছে প্রভো! যে অকালে এই স্বর্গীয় কুসুম ঝরিয়া পড়িবে। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে আপনার প্রদত্ত রক্তবিন্দু এখনও শুষ্ক হয় নাই। প্রভো! এই রক্তবিন্দু পান করিয়া কি শিশুর জীবনভিক্ষা দিবেন না?" শরৎকুমারীর কোমল দেহ-চর্ম্ম ছিন্ন করিবার জন্য চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারার দয়া, আত্মত্যাগ ও ব্যাকুল প্রার্থনায় ভগবানও বুঝি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না! শরৎকুমারী যখন দেহের রক্তবিন্দু শিশুর শুষ্ককণ্ঠে দিবার অভিলাষে দেহ ক্ষত করিবার উপযোগী কোন বস্তুর অন্বেষণের জন্য ইতস্ততঃ উদাসনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সেই সময়ে দেখিতে পাইলেন, অদূরে কৃষ্ণমোহন এক অশীতিপর অন্ধ বৃদ্ধাকে স্কন্ধে লইয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছেন। বৃদ্ধা মৃতা কি জীবিতা, তাহা বুঝিবার উপায় নাই! বৃদ্ধার অস্থি ও পঞ্জর দূর হইতে এক একখানি দেখা যাইতেছে। বৃদ্ধা যে রোগ, শোক ও অনাহারে অস্থি-কঙ্কালসার হইয়াছে, তাহা উহার কালিমামাখা মুখমণ্ডল দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। শরৎকুমারী অদূরে কৃষ্ণ-মোহনকে দেখিতে পাইয়া "ভগবান তোমার দয়া অসীম" বলিয়া আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। "দাদা যখন আসিয়াছেন, নিশ্চয়ই এইবার শিশুর জীবনরক্ষা হইবে"

এই ভাবিয়া মনে মনে বারবার ভগবানকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণমোহন শরৎকুমারীকে দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধাকে লইয়া আরও দ্রুতপদে শরৎকুমারীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। "শীঘ্র আসুন, একটু দুগ্ধাভাবে শিশুটী বুঝি আর অধিকক্ষণ বাঁচে না" এই বলিয়া শরৎকুমারী অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

"কি হইয়াছে শরৎ! তোমার ক্রোড়স্থ শিশুসন্তান কাহার? এখন আমাদের কাঁদিবার সময় নয়. শিশুটীর কি হইয়াছে, সংক্ষেপে আমাকে বল? ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শোক-দুঃখ করিবার আমাদের অধিকার নাই। শোক-দুঃখে অধীর হইয়া অশ্রুপাতে সময় নষ্ট করা অপেক্ষা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া সংসারে কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিতে মনুষ্যের দৃঢ়তা প্রকাশ করাই মনুষ্যত্ব।"

কৃষ্ণমোহনের একটীমাত্র কথায় শরৎকুমারীর দিব্য-জ্ঞানের উদয় হইল। রোদন সংবরণ ও হৃদয়কে সংযত করিয়া শরৎকুমারী আকুলকণ্ঠে সংক্ষেপে বলিলেন—"একটু দুগ্ধাভাবে এই ছেলেটি মারা যাইতে বসিয়াছে" এই বলিয়া শরৎকুমারী এই শিশু ও শিশুর জননী সম্বন্ধে সংক্ষেপে সমস্ত কথা কৃষ্ণমোহনকে জানাইলেন।

কৃষ্ণমোহন বলিলেন "শরৎ! তুমি শিশুটিকে উহার জননীর কাছেই লইয়া যাও, নচেৎ সে শৃগাল কুকুরের

কবলে পতিত হইবে। আমি এখনই দুগ্ধসহ রামতনুকে পাঠাইয়া দিতেছি।"

শরৎকুমারী বৃদ্ধার দুঃখে দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বৃদ্ধাটিকে কোথা হইতে আনিলেন দাদা?"

"শরৎ! বৃদ্ধাটি অন্ধ, ইহার দৃষ্টিশক্তি একবারেই নাই, অন্ধের যষ্টি স্বরূপ ইহার একমাত্র পুত্র গত রজনীতে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। বৃদ্ধা শোকে অধৈর্য্য হইয়া সম্মুখে যাহা পাইয়াছে তাহা লইয়াই নিজের মস্তকে বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছে। গত রজনীতে হত-ভাগিনীর পুত্রের সংবাদ লইবার একটুও অবসর পাই নাই। দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনু সমস্ত রজনী বাহিরেই ছিল, উভয়ে জলবিন্দুও মুখে দেয় নাই। তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ায় বৃদ্ধার পুত্রের কোনই সংবাদ তাহাদিগকে জানাইতে পারি নাই। অদ্য প্রভাতে যাইয়া দেখি, হতভাগিনী মৃতপুত্রের পার্শ্বে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে। জীবিতাবস্থাতেই শৃগাল কুক্কুরের উদরে যাইবে! এ দৃশ্য আরও ভীষণ, তাই শরৎ, বৃদ্ধাকে একটা আশ্রয়ে রাখিবার জন্য লইয়া যাই-তেছি। জানি না শরৎ! হুগলি জেলার অদৃষ্টে আরও কি ঘটিবে? জানি না শরৎ! সারাবাটীর এই শোচনীয় দুর্দ্দশা কতদিনে অপনীত হইবে?" ভ্রাতা ভগিনীর শোকাশ্রু নির্গত

হইতে লাগিল। ভগবান ব্যতীত সারাবাটীতে এ শোকাশ্রু মুছাইবার আর কেহ নাই।

শরৎকুমারী শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার মাতার কাছে গমন করিলেন। কৃষ্ণমোহন বৃদ্ধাকে স্কন্ধে লইয়া পবনবেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই রামতনু এক ঘটি দুগ্ধ সহ শরৎকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়া মাতাপুত্রের সেবা শুশ্রূষায় মনো-নিবেশ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সারাবাটীর যখন এই অবস্থা, যখন গৃহে গৃহে রোদন-ধ্বনি; শবদেহ স্তূপাকার হইয়া পথে, শ্মশানে পড়িয়া আছে; কৃষ্ণমোহন, শরৎকুমারী, দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনুর যখন আহার নিদ্রার সময় নাই; সারাবাটী যখন লোক-শূন্য হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না;—সারাবাটীর যখন চৌদ্দ আনা লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে শমনসদনে গমন করিয়াছে, সেই সময়ে কৃষ্ণমোহন একদিন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

শরৎকুমারী, দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনু আজ তিন দিন গৃহে পদার্পণ করেন নাই। এই তিন দিন তাঁহাদের স্নানাহারের অবসর ঘটে নাই। এখন সারাবাটীতে কেবল কুক্কুর শৃগালের ভীষণ কলরব ক্রমেই বৃদ্ধিই পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই একটি নরনারীর অন্তিম যন্ত্রণার ক্ষীণ অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। ক্রমে এই ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনিও বুঝি সারাবাটীতে আর কাহারও কর্ণ-গোচর হইবে না! শরৎকুমারী, দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনু

ঐশ্বরিকবলে বলীয়ান হইয়া অহোরাত্র পথে, গৃহে, শ্মশানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। বিশ্রাম নাই, বিরাম নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই—ঔষধ পথ্য, শুশ্রূষা, সান্ত্বনা, মুমূর্ষকে কুক্কুর শৃগালের কবল হইতে রক্ষা, শ্মশানে শবদেহ বহন ও দাহক্রিয়া লইয়াই যাহারা ব্যস্ত, তাহাদের অন্য কার্য্যের বা আহার নিদ্রার অবসর কোথায়? কৃষ্ণমোহনও দুই-দিনের পর গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। দুইদিনের মধ্যে কৃষ্ণমোহন সন্ধ্যাহ্নিকের একটু অবসরও পান নাই,—পিপাসায় জিহ্বা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। দুইদিনের পর ক্লান্তদেহে গৃহে ফিরিয়া জননীর অবস্থা দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন!

কৃষ্ণমোহনের জননীর আজ দুইদিন জ্বর! মুখে একটু জল দিবার লোক ছিল না। সকলেই সেবাব্রতে ব্রতী। কৃষ্ণমোহন দেখিলেন, জননী প্রবল জ্বরে অচৈতন্যা—এখনও কম্পের নিবৃত্তি নাই। কৃষ্ণমোহন ভীষণ সমস্যায় পড়িলেন। গৃহের বাহিরে হাহাকার ধ্বনি—শবদেহে সারাবাটী পরিপূর্ণ—অহোরাত্র শৃগাল কুক্কুরের কলরব; ইহার উপর এ কি ভীষণ প্রাণঘাতী দৃশ্য!! গৃহমধ্যে জগদ্ধাত্রীরূপিণী স্নেহময়ী জননী প্রবল ম্যালেরিয়ার আক্র-মণে শয্যাগত। কৃষ্ণমোহন অকুল পাথারে পড়িলেন। কি ভীষণ সমস্যা!

কৃষ্ণমোহন মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভাবিতেছেন, "জানি না, ভগবান আমার অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন। ভীষণ ম্যালেরিয়া-বিষ যাহার দেহে প্রবেশ করিতেছে, কয়েক দিবসের মধ্যেই তাহার জীবনের খেলা শেষ হইয়া যাইতেছে। মাতৃস্নেহের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পাইয়া আজও লালিতপালিত হইতেছি—ভগবান এইবার কি আমায় বৃক্ষতল আশ্রয় করাইবেন! আমি আজও শিশুর ন্যায় মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া আছি—আজও মাতার স্নেহ-পীযুষধারা পান করিয়া জীবিত রহিয়াছি; এতদিন পরে কি সংসার-মরুভূমে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জীবন ত্যাগ করিতে হইবে? জননীর অপরিসীম স্নেহের বন্ধনে বাঁধা থাকিয়া সংসারের মধুরত্ব উপভোগ করিতেছি; জননীর স্নেহপীযুষ-পানে সঞ্জীবিত হইয়া সংসারে-সংগ্রামে অগ্রসর হইতেছি; জানি না, ভগবান আমায় অকূলপাথারে ভাসাইয়া এবার কোথায় লইয়া ফেলিবেন। পিতৃহারা হইয়া জননীর অপরিসীম স্নেহে কৃষ্ণমোহন পিতৃশোক বিস্মৃত হইয়াছিলেন, আজ পিতৃশোকের ভীষণ দাবানল হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিতেছে। কৃষ্ণমোহন যতই চিন্তা করিতেছেন, ততই যেন ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া আকুল হইয়া পড়িতেছেন। কৃষ্ণমোহন যেদিকে চাহিতেছেন, সেই দিকেই ঘোর

অন্ধকার! মাতৃভক্ত কৃষ্ণমোহন যে সংসারে একমাত্র জননী ব্যতীত আর কাহাকেও জানিতেন না।

কৃষ্ণমোহন যখন এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, তখন শরৎকুমারী, দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনু আসিয়া উপস্থিত হইলেন! কৃষ্ণমোহন সকলকে উপস্থিত দেখিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে মাতার অবস্থা শোকাবেগে রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে যাইয়াও বলিতে পারিলেন না।

সকলেই চিন্তিত, সকলেই উদ্বিগ্ন! শরৎকুমারী 'মা মা' করিয়া স্নেহ-বাহুলতায় জননীকে বেষ্টন করিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্ন করুণ অমিয়মাখা 'মা মা' ধ্বনিতে জননীর চেতনা সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রভুভক্ত রামতনু শ্রাবণের ধারার ন্যায় অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া প্রভুপত্নীর পা দুখানি বুঝি ইহজীবনের মত বক্ষঃস্থলে তুলিয়া লইয়া নিজ মস্তকের দীর্ঘ কেশরাশি ক্রোধ ও অভিমানে ছিঁড়িতে লাগিল। রামতনু আজ তিনদিন অনাহারের পর ক্লান্ত শ্রান্তদেহে গৃহে আসিয়াছে, প্রভুপত্নী কত আদর করিয়া সম্মুখে খাইতে বসাইবেন, তাহার পরিবর্তে প্রভুপত্নীর আদরের সন্তানের সম্মুখে এ কি দৃশ্য! রামতনু ভাবিতেছে, আমি জাগ্রত, না স্বপ্ন দেখিতেছি! আমার মায়ের এ দশা কে করিল? ম্যালেরিয়া! কোথায় গেলে ম্যালেরিয়াকে

শরীরবেশে দেখা পাই! একবার যদি দেখিতে পাই, তবে রামতনু ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর বুক চিরিয়া রক্ত শোষণ করিয়া খাইতে পারে! রামতনুর দেহে এরূপ শক্তি এখনও আছে! এই বলিয়া রামতনু দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে নিজ কেশরাশি আকর্ষণ করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। রামতনুর এই মুহূর্ত্তে সহস্র মদমত্তহস্তীর বল দেহে প্রবেশ করিয়াছে। রামতনু মাতাকে শয্যাশায়ী দেখিয়া কখন পাগলের ন্যায় শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছে, কখন বালকের ন্যায় আকুল হইয়া রোদন করিতেছে, কখন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতেছে।

পাঠক! কৃষ্ণমোহন, দুর্গাপ্রসন্ন, শরৎকুমারী ও রামতনুর আজ কি অবস্থা, তাহার বর্ণনাপেক্ষা অনুমান সহজ! সকলেরই কঠোর পরিশ্রমে ও অনাহারে তিন দিবস গত হইয়াছে; জননী-স্নেহের শীতল স্নিগ্ধ ছায়া ব্যতীত কাহারও আর দাঁড়াইবার স্থান নাই,—স্নান ও পানাহারের জন্য সকলেই কত আশা করিয়া জননী-স্নেহের স্নিগ্ধ ছায়ায় জুড়াইতে আসিয়াছে। সকলেই শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। সকলেই ভাবিয়া আসিতেছে, জননীর স্নেহ-আদর যত্নে ক্লান্তি শ্রান্তি ভুলিয়া যাইবেন,—কয়দিনের কত শোচনীয় ঘটনার কথা জননীকে শুনাইবেন। কিন্তু এ কি! বুঝি চিরদিনের জন্য সকলের সকল সুখই অকূল দুঃখ-সাগরে

ভাসিয়া যায়। আর বুঝি কাহারও কোন কথা জননী শুনিবেন না—আর বুঝি সারাবাটীবাসীর দুঃখের কথা শুনিয়া জননী অশ্রুজল ফেলিবেন না—ইহজীবনে জননী বুঝি আর কাহাকেও পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য করুণ হৃদয়ে কাতর ভাবে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবেন না! আর বুঝি জননী কখন কাহাকেও প্রাণ দিয়াও পরের দুঃখ মোচনের জন্য স্নেহভরে মুখচুম্বন করিয়া উৎসাহবাক্যে বার বার মস্তকে আশীর্ব্বাদবাক্য সিঞ্চন করিতে অগ্রসর হইবেন না। জানি না, ভগবান আমাদের আশ্রয়ের জন্য ভবিষ্যতে কোথাকার বনভূমে কোন্ বৃক্ষতল নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছেন।

সকলেরই এক চিন্তা! সকলেই ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারময় দেখিতেছেন! কৃষ্ণমোহন জননীর চিন্তায় যেরূপ বালকের ন্যায় চারিদিকে চাহিয়া রোদন করিতেছেন, শরৎকুমারী ও রামতনুর অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। কে কাহাকে সান্ত্বনা দিবে? সকলেই উপস্থিত বিপদে মুহ্যমান। দুর্গাপ্রসন্ন ভবিষ্যতের নিবিড় অন্ধকারে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। জননীর অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইয়া আসিতেছে! ভাবী ভীষণ বিপদ সমাগত জানিয়া সকলেই সশঙ্কিত,

সকলেই স্পন্দনরহিত হইয়া জননীর চারিদিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। আজ চারিদিনের মধ্যে জননীর জ্ঞান হইল না। সকলেই জননীর সঙ্গে জ্ঞান হারাইয়াছে, কাহারও মুখে একটি কথা নাই। সকলেই স্ব স্ব চিন্তা-সাগরে নিস্পন্দ হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।

এ কি! হঠাৎ সকলেরই মুখে একই সময়ে এমন আনন্দের চিহ্ন কেন? সকলেরই হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে; সকলেই ভাবিতেছে, এতক্ষণে আমাদের ন্যায় নিরাশ্রয় জনগণের করুণ ক্রন্দন বুঝি ভগবানের কর্ণে পৌঁছিয়াছে। দেখিতে দেখিতে জননীর চেতনা আসিল। কাহার মন্ত্র-বলে জননী চারিদিনের পর যেন সুস্থদেহে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

জননী ডাকিলেন,—“বাবা কৃষ্ণমোহন! বাবা রাম-তনু! দুর্গাপ্রসন্ন! মা শরৎ!” সকলেই মা! মা! করিয়া জননীর ক্রোড়ের কাছে মুখ লইয়া গেলেন।

জননী বলিলেন,—“বাবা! তোমরা আমার তিন পুত্র! শরৎ আমার গর্ভজাতা কন্যা অপেক্ষাও অধিক! আমার বড় সাধ, প্রাণে বড় আশা ছিল, আমার এই সুখের শান্তি-উদ্যানে কৃষ্ণমোহনের গলে তোমরা পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিবে, দেখিয়া নয়ন সার্থক করিব। সে সাধ আমার পূর্ণ হইল না। শরৎ। বড় কষ্ট, অনেকদিন তাঁহার চরণ

ছাড়িয়াছি! পতি-দেবতার চরণে এইবার চির আশ্রয় লাভ করিব। শরৎ! তোমাদের কাছে কৃষ্ণমোহন রহিল, আমার অন্তিমের বাসনা পূর্ণ করিও। শরৎ! আমার নববধূ আগমনের মঙ্গলশঙ্খধ্বনি যেন স্বামীপার্শ্বে বসিয়া শুনিতে পাই। বাবা রামতনু! তুমি আমার কৃষ্ণমোহন অপেক্ষাও অধিক, তোমার কিছু করিতে পারিলাম না। বাবা! আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সংসারে দীন-সেবাব্রত উদ্‌যাপন কর, দীন হীন রোগাতুরগণ যেন তোমাদের সবল সুস্থ বাহুর উপর মস্তক রাখিয়া রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া যায়! বাবা দুর্গাপ্রসন্ন! তুমি আমার কৃষ্ণমোহনের পার্শ্বে ব'স, একবার প্রাণ ভরিয়া তোমাদের মুখ দেখি। তোমার ভাই ভগিনীগুলির ভার, অনাথ রুগ্ন, দীন, দরিদ্রের সঙ্গে যেন চিরদিন বহন করিতে সক্ষম হও, ইহাই আমার অন্তিমের আশীর্ব্বাদ। বাবা দুর্গাপ্রসন্ন! দরিদ্রের অশ্রুজল মুছাইতে নিজ স্বচ্ছন্দতাকে যে তোমরা তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছ, ইহা দেখিয়া আমি সুখে মরিতেছি। বাবা, ভগবান যেন এই কর্ত্তব্যকার্য্য তোমাদের জীবনের সঙ্গী করিয়া দেন। মা শরৎ, আমি চলিলাম, কিন্তু সকলের ভার তোমায় দিয়া যাইতেছি। ক্ষুধায় অন্ন—পিপাসায় জল লইয়া অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে সকলের মুখে তুলিয়া দিও। রামতনু আমার বড় অভিমানী। শরৎ, রামতনু যেন

আমার অভাবে কাঁদিয়া না বেড়ায়। কৃষ্ণমোহন, কর্ত্তার চিতার পার্শ্বে চিতা সাজাইয়া তোমার জননীর দেহ দগ্ধ করিও। বাবা, আমার শেষ অনুরোধ, একটি লক্ষ্মীরূপিণী বধূ গৃহে আনিয়া কর্ত্তার পুণ্যের সংসার রক্ষা করিও। বাবা কৃষ্ণ—দুর্গা—রামতনু—"আরও কি বলিতেছিলেন আর বলা হইল না।

জননী কৃষ্ণমোহনের ক্রোড়ে শেষ একবার রামতনুকে ডাকিয়া তনুত্যাগ করিলেন। হায়, সব ফুরাইল! কৃষ্ণমোহনের সুমধুর মা মা রব চিরতরে নিস্তব্ধতার সঙ্গে মিশিয়া গেল। রামতনু ভূমে লুণ্ঠিত হইয়া মা মা রবে গগনভেদী চীৎকার করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন!

নবম পরিচ্ছেদ।

"ঠাকুর-ঝি, এত রাত্রে কি রান্না হইবে ভাই ?"

একটি বিংশতিবর্ষবয়স্কা বধূ রন্ধনগৃহ হইতে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রে কি রান্না হইবে ভাই ?"

শুভ্রবসন-পরিহিতা একটি বিধবা উত্তর করিল, "ভাবিতে হইবে না বৌ-রাণী, রামতনু দাদা জাল লইয়া পচাগেড়ে গিয়াছে, এখনই একটা রুই মাছ আসিয়া পড়িবে। তুমি ঝোল অম্বল রাঁধিবার আয়োজন কর।"

অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনের ভিতরে হাসিতে হাসিতে বধূ উত্তর করিল, "ঠাকুরঝি আকাশে জাল পাতিতেছ না কি ? মাছ তোমার পচাগেড়ে, আমি ঝোল অম্বলের জোগাড় করিব ? ঠাকুরঝি, তোমরা ভাই-বোনে সব পার, তোমাদের অসাধ্য কার্য্য জগতে কিছুই নাই। আমার অতটা ক্ষমতা হয় নাই।"

ইহাদের রহস্য কোথায় গিয়া দাঁড়াইত বলা যায় না। রামতনু একটা দশসের রক্তিমবর্ণ রোহিত মৎস্য সেই সময়ে হঠাৎ লইয়া উপস্থিত হওয়ায়—ইহাদের কথাবার্ত্তা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না।

বৈদ্য-বাটীর শ্মশান ঘাট।

কৃষ্ণমোহন প্রজ্জ্বলিত চিতার সম্মুখে গম্ভীর ভাবে বসিয়া মাঝে মা
এক একখানি শুষ্ক কাষ্ঠ জ্বলন্ত চিতার উপর ফেলিয়া দিতেছেন

পাঠক! ইঁহাদিগকে কি চিনিতে পারেন? বিধবাটিকে চিনিলেও বধূটিকে বোধ হয় চিনিতে পারিবেন না। বধূটী আমাদের কৃষ্ণমোহনের সহধর্ম্মিণী, আর বিধবা আমাদের শরৎকুমারী।

কৃষ্ণমোহনের মাতার মৃত্যুর পর প্রায় দশবৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণমোহনের ইচ্ছা ছিল, তিনি বিবাহ করিবেন না, স্বাধীনভাবে থাকিয়া দেশের ও দশের সেবা করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবেন। জননীর অন্তিম সময়ের আদেশ এবং দুর্গাপ্রসন্ন, রামতনু ও শরৎকুমারীর সমবেত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কৃষ্ণমোহন বিবাহ করিয়াছেন। প্রায় সাত বৎসর গত হইল, বিবাহ হইয়াছে। জননীর অন্তিমকালের আশীর্ব্বাদ-বাক্য সফল হইয়াছে। বধূটি যথার্থই লক্ষ্মীরূপিণী! শরৎকুমারী সর্ব্বদা বলিত, "বৌরাণী! আমাদের ঘরটা অন্ধকার হইয়াছিল, লক্ষ্মী-ঠাকুরাণীর পদার্পণ হওয়ায় গৃহ আলোকে ভূষিত হইয়াছে।" প্রকৃতই বধূটি অতি সুন্দরী, রং দুধে-আলতায় গোলা না হইলেও শ্যামবর্ণাপেক্ষা উজ্জ্বল, কিন্তু অঙ্গ-সৌষ্ঠবে লক্ষ্মী-প্রতিমাকেও হারাইয়া দেয়। বাহির অপেক্ষা ভিতরটি আরও সুন্দর! সহধর্ম্মিণীর স্নেহ, ভক্তি, সরলতা, দয়া, লজ্জা ও দেব-দ্বিজ-অতিথির প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি দেখিয়া কৃষ্ণমোহন মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিতেন এবং করযোড়ে

প্রণাম করিয়া ভগবানের অপার করুণার কথা বারবার স্মরণ করিতেন। কৃষ্ণমোহন সর্ব্বদাই ভাবিতেন, ভগবানের দয়ায় মনের মত সহধর্ম্মিণী পাইয়াছি। শরৎকুমারীর সংসর্গে ও উপদেশে বধূটির মনের মলিনতা অল্পদিনেই ধৌত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং বিনা আয়াসে উপযুক্ত ক্ষেত্রে কৃষ্ণমোহন ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া অঙ্কুর দেখিতে পাইয়াছিলেন। শরৎকুমারীর সাহায্য না পাইলে বোধ হয় কৃষ্ণমোহন এত শীঘ্র সহধর্ম্মিণীর হৃদয়ে ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইতেন না।

রাত্রি প্রায় দুইপ্রহর অতীত, সকলেই আহারাদি করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময় ১২।১৪ জন অতিথি আসিয়া কৃষ্ণমোহনের বাটিতে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণমোহনের আতিথেয়তা দেশ প্রসিদ্ধ ছিল। কৃষ্ণমোহনের গৃহে আসিলে কেহ কখন অভুক্ত ফিরিতে পারিত না। অতিথিগুলি অনেক দূর হইতে আসিতেছেন। সমস্ত দিন স্নানাহার হয় নাই, পথে কোথাও থাকিবার উপযুক্ত স্থানও পান নাই। এত রাত্রে আর কোথায় যাইবেন, কৃষ্ণমোহনের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহির্বাটিতে রামতনু নিদ্রা যাইতেছিল, উঠিয়া ভক্তিভরে মাদুর বিছাইয়া বসিতে দিয়া শরৎকুমারীকে ডাকিল। শরৎকুমারী বলিলেন,—"রামতনু দাদা! তুমি অগ্রে অতিথিদিগকে জিজ্ঞাসা

করিয়া আইস, তাঁহাদের আহারাদি হইয়াছে কি না?”

শরৎকুমারীর কথা শেষ হইতে না হইতে রামতনু লাফাইয়া বাহিরে গিয়াই পুনরায় দুই লম্ফে শরতের কাছে উপস্থিত হইল! রামতনু ধীরে ধীরে চলিতে জানিলেও কোনও কাজের সময় না লাফাইয়া চলিতে পারিত না।

শরৎকুমারী শুনিলেন, অতিথিদের আহার হয় নাই। রামতনু বলিল, “শরৎ! তুই ভাঁড়ার ঘর হইতে জাল খানা দে, আমি পচাগেড়েতে একবার যাই।” রামতনু বাহির হইয়া গেল, শরৎকুমারী বৌরাণীকে উঠাইলেন। গৃহে অতিথি সমাগত শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণমোহন ব্যস্ত হইয়া বহির্বাটীতে আসিলেন। বৌরাণী নিমিষের মধ্যে রন্ধন-গৃহে অন্ন ডাল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন. কিন্তু এত রাত্রে ব্যঞ্জনের কোন ব্যবস্থা করিতে না পারায়, শরৎকুমারীর সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত পরামর্শ করিতেছিলেন।

পাঠক! পচাগেড়ের নাম শুনিয়া হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছেন! পচাগেড়ে একটি ক্ষুদ্র ডোবা ছিল বটে, কিন্তু কৃষ্ণমোহন পঙ্কোদ্ধার করিয়া তাহাকে একটি সরোবরে পরিণত করিয়াছেন। কৃষ্ণমোহন অতি আদরের “পচা গেড়ে” নামটি ইচ্ছা করিয়াই এখনও বজায় রাখিয়াছেন। এইটি কৃষ্ণমোহনের অন্দরের পুষ্করিণী। ম্যালেরিয়ার বৎ-

সরের পর নির্ম্মল পানীয় জলের অভাবে কৃষ্ণমোহন এই পুষ্করিণীটি খনন করিয়াছেন। পচাগেড়ের কাকচক্ষুর ন্যায় জল—জলে বড় বড় রোহিত, মৃগেল খেলা করিত। চতুর্দ্দিকে নানা ফলফুলের গাছ। শরৎকুমারী ও বধূর যত্নে নানারূপ ফলফুল, শাক, তরকারি উৎপন্ন হইত। কৃষ্ণ-মোহন, রামতনু বা দুর্গাপ্রসন্নকে এ সম্বন্ধে কিছুই দেখিতে হইত না। দশ বারসের ওজনের মৎস্যগুলিকে কৃষ্ণমোহন ক্ষুদ্র মৎস্য মনে করিতেন। অতিথি গৃহে আসিলে মৎস্য ধরিতে কৃষ্ণমোহনের নিষেধ ছিল না। আমরা শুনিয়াছি, কৃষ্ণমোহনের এই পচাগেড়েতে দুই তিন মণ ওজনের রোহিত মৃগেল সর্ব্বদাই খেলা করিত। শরৎ-কুমারী ও বৌরাণী হাতে করিয়া তাহাদিগকে দুইবেলা ভাত খাওয়াইতেন। কৃষ্ণমোহনের সেই পচাগেড়ে এখনও আছে, কিন্তু এখন আর রোহিত মৃগেল খেলা করে না—ফল-ফুলের বাগানও নাই—পচাগেড়ে এখন একটি ক্ষুদ্র ডোবার আকারে পূর্ব্বস্মৃতি বুকে করিয়া রহিয়াছে। জানি না, কালে—"পচাগেড়ে"র স্মৃতিটুকুও থাকিবে কি না?

রামতনু মাছটা ফেলিয়া দিয়াই গোশালার দিকে ছুটিল এবং এক ভাঁড় দুগ্ধ আনিয়া শরৎকুমারীর হস্তে দিল।

বৌরাণী অল্প সময়ের মধ্যেই ডাউল, মৎস্যের ঝোল, অম্বল ইত্যাদি রন্ধন করিয়া পাত্রে অন্নব্যঞ্জন সাজাইয়া ফেলিলেন। শরৎকুমারী অতিথিদের জন্য পান ও আহারের স্থানাদি করিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, বৌরাণীর সমস্তই প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে।

শরৎকুমারী বৌরাণীর পায়ের কাছে একটি ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "বৌরাণি! রাত্রিকালে নিদ্রা-সুখের ব্যাঘাত দিয়া গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, পরিশ্রমটাও মন্দ হয় নাই। অপরাধ মার্জ্জনা করিবার আশায় অধিনী গললগ্নকৃতবাসে মহাশয়ার সমীপে দণ্ডায়-মানা।"

"ঠাকুরঝি! তুমি ভাই আর যা কর অমন করিয়া প্রণাম করিও না, ইহাতে বড়ই তোমার উপর রাগ হয়।" এই বলিয়া বৌরাণী মুখ ভার করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন।

"ভাই! আর যা কর, আমার উপর রাগ করিও না।" এই বলিয়া শরৎকুমারী নতজানু হইয়া করযোড়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমাদের গৃহের লক্ষ্মী, দাদার হৃদয়েশ্বরী, ভাবীবংশধরের জননী, আমার প্রাণের বৌরাণী, আনন্দময়ী, হাস্যময়ী, প্রেমময়ী, দাদার গৃহ-আলোকরা ধন, তুমি রাগ করিলে যে শরৎকুমারীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িবে।"

শরৎকুমারীর বক্তৃতা শেষ না হইতেই কৃষ্ণমোহন ডাকিলেন,—"শরৎ! অতিথিদের আহারের উদ্যোগ হইয়াছে কি?"

"হাঁ দাদা, সকলকে লইয়া আসুন।" এই বলিয়া শরৎকুমারী অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণমোহন অতিথিদের সম্মুখে বসিয়া পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন।

অতিথিগণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আহা! কি সুন্দর ব্যবস্থা! অতিথিদের প্রতি কি আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা! এরূপ সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন আর কখন ভোজন করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। স্বয়ং অন্নপূর্ণা আসিয়া বুঝি পাক করিয়াছেন। যেমন কর্ত্তা, তেমনই ভগিনীটি! আবার গৃহিণী বুঝি ইহাদের অপেক্ষাও ভাল; অল্প সময়ের ভিতর এরূপ সুন্দর অন্নব্যঞ্জন রন্ধন সাধারণ স্ত্রীলোকের কার্য্য নহে। মনিবের উপযুক্ত ভৃত্য রামতনু! যেদিকে দেখি, সেই দিকেই সুন্দর! আহা! এই সংসার-আশ্রম বুঝি পারিজাত-সুগন্ধি, শান্তিপূর্ণ অমরাবতী।

অতিথিগণ পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়া তৃপ্তি পূর্ব্বক আহারাদি সমাপন করিলেন। আহারাদি শেষ হইতে রাত্রি তৃতীয়প্রহর অতীত হইয়া গেল। সুকোমল শয্যোপরি শয়ন করিয়া কৃষ্ণমোহনের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য

করযোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে অতিথিগণ সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

রজনী শেষ হইয়াছে জানিয়া কৃষ্ণমোহন পুষ্পচয়নের জন্য বহির্গত হইতেছেন; শরৎকুমারী ও বধূ ফুলগাছ-গুলিতে জল দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় দুর্গাপ্রসন্ন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

"এত বিলম্ব হইল কেন দুর্গাপ্রসন্ন?" এই বলিয়া কৃষ্ণ-মোহন স্নেহভরে দুর্গাপ্রসন্নের পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিলেন।

"সারাবাটীর সমস্ত মাঠ আজ ঘুরিরা আসিলাম, সেই জনাই রাত্রি শেষ হইয়া গেল! সমস্ত জমি শুষ্ক, মৃত্তিকা পাষাণবৎ কঠিন হইয়া গিয়াছে। কার্ত্তিক মাসের অর্দ্ধেক গত হইল, একবিন্দু বারিপাত হইতেছে না। সারাবাটীতে যে কয় ঘর লোকের বাস, অন্নাভাবে তাহারাও বুঝি মারা যায়! এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইলেই ক্ষেত্রের ধান্যগুলি পাকিয়া উঠে। বুঝি ভগবান গৃহস্থের সে আশা পূর্ণ করিবেন না!"

কৃষ্ণমোহন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"দুর্গাপ্রসন্ন! ইহার একটা সদুপায় করিতে হইবে।"

"সেই জন্যই ঘুরিতে ঘুরিতে রজনী শেষ হইয়া গেল। পয়সা ব্যয় করিয়া ক্ষেত্রে জলসেচন করিবার ক্ষমতা অধিকাংশ লোকেরই নাই। তারপর সারাবাটীর

অধিকাংশ কৃষকই ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। জলাভাবে ক্ষেত্রের ধান্য ক্ষেত্রেই শুষ্ক হইয়া যাইবে, জলসেচন করিয়া শস্য রক্ষা করিবার ব্যয় তাহারা কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে কৃষ্ণমোহন?" এই বলিয়া দুর্গাপ্রসন্ন ভ্রাতার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কৃষ্ণমোহন দুর্গাপ্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কোন্ ব্যক্তির ক্ষেত্র রক্ষা করা আশু প্রয়োজন দেখিয়া আসিলে?"

রামতনু পশ্চাৎ হইতে এক এক জনের নাম উল্লেখে জলাভাবে শুষ্কপ্রায় ধান্যক্ষেত্রের হিসাব বলিয়া ফেলিল। কৃষ্ণমোহন মনে মনে বলিলেন, ধন্য রামতনু! বহু পূর্ব্ব হইতে দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষেত্রগুলির প্রতি তুমি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছ!

কৃষ্ণমোহন, দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনু তিনজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যাহারা অর্থাভাবে জীবন-রক্ষার সম্বল ধান্যক্ষেত্রগুলি জলসেচন দ্বারা রক্ষা করিতে অক্ষম, তাহাদের ধান্য রক্ষার ভার নিজেরা গ্রহণ করিবেন এবং প্রভাত হইতেই জলসেচন আরম্ভ করিবেন। তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখিলেন, নিঃস্ব ব্যক্তিদের ধান্যক্ষেত্রের সংখ্যা চারিশত বিঘার অধিক; ইহা ব্যতীত কৃষ্ণমোহনের নিজ ষাটি বিঘার অধিক ধান্যক্ষেত্র

জলাভাবে মারা যাইতে বসিয়াছে! কৃষ্ণমোহন প্রথমে অপরের ধান্যগুলিই রক্ষা করা প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিলেন। কৃষ্ণমোহন রামতনুকে বলিয়া দিলেন, সকলকে বলিয়া আসিও।

রামতনু আহ্লাদে দুই লম্ফে একখানি কোদালি স্কন্ধে লইয়া কামারডাঙ্গার পুষ্করিণীতে জলসেচনের উদ্যোগ করিতে লাগিল।

কোন পুষ্করিণীতে বিন্দুমাত্র জল নাই। বৃষ্টি অভাবে সমস্ত পুষ্করিণীই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কামারডাঙ্গার পুষ্করিণী হইতে সারাবাটীর মাঠে জল লইয়া যাইতে হইবে। সারাবাটীর মাঠ কামারডাঙ্গার পুষ্করিণী হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত।

কামারডাঙ্গা ও কামারডাঙ্গার পুষ্করিণী এখনও বর্ত্তমান আছে। এখানে শ্রীমন্ত কামার নামক একঘর কর্ম্মকারের বাস ছিল। শ্রীমন্ত কর্ম্মকার সঙ্গতিপন্ন লোক ছিল। একবার শ্রীমন্তের একটি পুত্রের কঠিন পীড়া হয়, জীবনের আশা ছিল না। বহু কবিরাজ চিকিৎসা করিয়া জীবনে সন্দিহান হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণমোহনের চিকিৎসাগুণে শ্রীমন্তের পুত্রটি আরোগ্য হইলে শ্রীমন্ত এক দিন কৃষ্ণমোহনের পায়ের উপর ছেলেটিকে রাখিয়া বলিল, "পুত্রের বিনিময়ে আপনাকে কিছু দিব এমন আমার সাধ্য

নাই। আমার বসতবাটীর সংলগ্ন এই কয় বিঘা জমি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ দান করিলাম, আমার এই তুচ্ছ দান দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।" সেই দিনেই শ্রীমন্ত কর্ম্মকার এই কামারডাঙ্গা লেখাপড়া করিয়া কৃষ্ণমোহনকে দান করিল। এই কামারডাঙ্গার বাৎসরিক আয় প্রায় ১৫০৲ টাকার উপর ছিল। কামারডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ বংশ ও পুষ্করিণীর মৎস্যের আয়ে একটি ক্ষুদ্র সংসার স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইত। এখনও সেই কামারডাঙ্গা অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, কিন্তু সে শ্রী নাই। এই ধার্ম্মিক শ্রীমন্ত কর্ম্মকার ম্যালেরিয়ার বৎসরে সবংশে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে; তাহার বংশে আর কেহ নাই, কেবল কামারডাঙ্গাই তাহার নামের স্মৃতি আংশিক রক্ষা করিতেছে মাত্র।

এই কামারডাঙ্গার পুষ্করিণীতে যথেষ্ট জল ছিল।—কৃষ্ণমোহন কামারডাঙ্গার পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া গিয়া সারাবাটী মাঠের ধান্য রক্ষা করিবার জন্য স্থিরসঙ্কল্প হইলেন।

হুস্ হুস্ শব্দে কামারডাঙ্গার পুষ্করিণী হইতে জল উঠিতেছে। একদিকে কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্ন, অন্য দিকে রামতনু ও প্রায় ৩০ জন সারাবাটীর কৃষক! ত্রিশজন কৃষকের মধ্যে দুই দণ্ডের অধিক কেহই

সিওনি * ধরিয়া জল উঠাইতে পারিতেছে না। দুইটি সিওনিতে হুস্ হুস্ শব্দে একবারে জল উঠিতেছে।

কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্নের সঙ্গে যে সিওনি ধরিতেছে, সেই দুই দণ্ডের পর হাঁপাইতে হাঁপাইতে কর্দ্দমের উপর শয়ন করিয়া চারিদণ্ড বিশ্রাম করিতেছে। কেবল রামতনু কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে ৪।৫ দণ্ড দ্রুতহস্তে জল উঠাইতে সক্ষম হইতেছে, কিন্তু রামতনুকেও বার বার বিশ্রামের জন্য অবসর লইতে হইতেছে। প্রভাত হইতে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্ন একভাবেই হুস্ হুস্ শব্দে জল উঠাইতেছেন, ক্লান্তি নাই—বিরাগ, বিশ্রাম নাই। কৃষ্ণমোহন দুর্গাপ্রসন্নকে বলিলেন, "তুমি স্নানাহার করিয়া আইস, অপর সকলেও আহারাদি করিয়া আসুক, সেচন বন্ধ করা চলিবে না। জলস্রোত বন্ধ হইলেই শুষ্ক মৃত্তিকা সমস্ত জল শোষণ করিয়া লইবে; রামতনু আমার সঙ্গে থাকুক।" এইরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমী বীরপুরুষ আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায় কি?

---

* বংশ দ্বারা নৌকার আকারে নির্ম্মিত। ইহার দ্বারা কলসের ৭।৮ কলস জল একবারে উত্তোলিত হয়।

দশম পরিচ্ছেদ।

"বৌ-ঠাকরুণ! ক্ষুধার্ত্ত অতিথি সমাগত, চারিটি অন্নদান করুন!"

দুর্গাপ্রসন্ন কঠোর পরিশ্রমে ক্ষুধাতুর হইয়া আহার করিতে আসিয়াছেন; কিন্তু বৌ-ঠাকরুণকে দুইটা কথা না বলিলে দুর্গাপ্রসন্নের প্রাণে শান্তি হয় না! দুর্গাপ্রসন্ন, কৃষ্ণমোহন উভয়েই প্রায় সমবয়স্ক; উভয়ে উভয়ের নাম ধরিয়া ডাকে, কেহ কাহাকেও দাদা বলিতে পারে না। কৃষ্ণপ্রসন্ন দুর্গাপ্রসন্ন অপেক্ষা দুই চারি দিনের বড়, এজন্য জ্যেষ্ঠের সম্মান কৃষ্ণমোহনই পাইয়া থাকেন। বৌরাণী দুর্গাপ্রসন্নকে সহোদর অপেক্ষা ভালবাসে, পুত্রাধিক স্নেহ করে, জননীর ন্যায় আদর যত্ন করে। বৌরাণী দেবরকে না খাওয়াইলে জল গ্রহণ করিতে চায় না। দুর্গাপ্রসন্ন বৌ-ঠাকুরাণীকে জননী অপেক্ষাও ভক্তি করে; বধূ শরৎ-কুমারীকে প্রায়ই বলে, "ঠাকুর ঝি! সত্যযুগে সীতা-দেবী লক্ষ্মণকে দেবররূপে পাইয়াছিলেন, আর আমি কলি-যুগে লক্ষ্মণের মতই একটী দেবর-রত্ন পাইয়াছি। আমার

গর্ভে পুত্র না হইলেও দুঃখ নাই, দেবর হইতে আমার পুত্রের অভাব পূরণ হইবে।"

দুর্গাপ্রসন্ন আহার করিতে বসিয়াছেন, শরৎকুমারী ভ্রাতার পার্শ্বে বসিয়া আদেশের প্রতীক্ষায় একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, বৌরাণী পরিবেশন করিতেছে।

দুর্গাপ্রসন্নের আহার, সে এক বিরাট ব্যাপার! হুপ্ হাপ সুপ্ সাপ্, উপর্য্যুপরি অন্নের গ্রাস মুখে উঠিতেছে; দেখিতে দেখিতে পর্ব্বত প্রমাণ থালার অন্ন নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। আজ দুর্গাপ্রসন্নের ক্ষুধার তেজ অত্যধিক বাড়িয়াছে। প্রভাত হইতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, ত্রিশজন বলবান্ মজুর একত্রিত হইয়া যাহা করিত, তদপেক্ষা অধিক জল দুর্গাপ্রসন্ন পুষ্করিণী হইতে উত্তোলন করিয়াছেন; তাই আজ থালার অন্নরাশি দেখিতে দেখিতে যোগমন্ত্রবলে ফুৎকারে উড়িয়া যাইতেছে।

"সোনা ভাইটি! একটু বসিয়া খাও—পায়সান্ন একটু খাইতে হইবে।"

বৌ-রাণী আজ নূতন খর্জ্জুর-গুড়ের পায়েস রন্ধন করিতেছে, দুর্গাপ্রসন্ন একটু না খাইলে বৌ-রাণীর কি মনে সুখ হয়?

বৌ-রাণীর কথা দুর্গাপ্রসন্নের কানে পৌঁছিল না। কৃষ্ণমোহনের জন্য দুর্গাপ্রসন্ন ব্যস্ত, পূর্ব্বের ন্যায় দ্রুতই

দুর্গাপ্রসন্নের অন্নের গ্রাস মুখে উঠিতেছে ; একবার উঠিতে পারিলে হয়। কর্ম্মবীর আহারে বসিয়াছেন তবু মন পড়িয়া আছে কামারডাঙ্গার পুষ্করিণীতে। ভাই কৃষ্ণমোহন এখনও আহার করেন নাই, দুর্গাপ্রসন্নের কি আহারের সুখ আছে? একাকী কেহ কখনও ভোজন করেন না—কাজেই দুর্গাপ্রসন্নের আহারে সুখ হইবে কেন?

কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্ন উভয়ে পরস্পরকে যেরূপ ভালবাসিত, সেরূপ ভ্রাতৃপ্রেম আজ-কাল সহোদর ভ্রাতাতেও দুর্লভ! উভয়ের উভয়ের প্রতি স্নেহ, ভাল-বাসা, যত্ন সহোদর অপেক্ষাও অধিক ছিল। আজকাল কোন কোন নীচাশয় ব্যক্তি অর্থ বা বিষয়ের জন্য ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনোমালিন্য ঘটাইয়া দেয়। ভ্রাতার সহিত নিজের কিছু প্রভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না! এক রক্তমাংস, এক মাতার গর্ভে উৎপন্ন, এক স্তনদুগ্ধে জীবনধারণ, এক-ক্রোড়ে উভয়ে মানুষ হইয়াছে। সঙ্কীর্ণচেতা মানব ক্ষুদ্র স্বার্থ ও অর্থের দাস হইয়া সেই প্রাণসম ভ্রাতা হইতে পৃথক হইতে চায়! যদি ভ্রাতাকেও পর ভাবিবে, তবে জগতে তোমার আপনার কে? তোমার জনক-জননী যাঁহাদের ঋণ কখনও তুমি শুধিতে পারিবে না ;—তোমাকে এবং তোমার ভ্রাতাকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, তোমার জনক-জননীর প্রতি ইহাই কি যথেষ্ট সম্মানের

নিদর্শন ?॥ অর্থ পার্থিব বস্তু, স্বার্থপরতা নরকের কীট অপেক্ষাও ঘৃণ্য। ভ্রাতৃপ্রেম পার্থিব জগতে স্বার্থপরতা মিশ্রিত হইয়া থাকিতে পারে না! ভ্রাতৃপ্রেম পার্থিব জগতের অনেক উচ্চে অবস্থিত। সকলকে আপনার করিতে না পারিলে—সকলকেই আপনার ন্যায় ভাবিতে না পারিলে আত্মার উন্নতি হয় না, জীব মুক্ত হইতে পারে না। মুক্তি সকল জীবেরই যদি বাঞ্ছনীয় হয়, তবে জগতকে আপনার চক্ষে না দেখিয়া ভাইকে পর করিতে চাও কোন্ প্রাণে? পার্থিব বিষয়-বৈভব যদি ভাইকে দিয়া প্রাণধারণ করিতে না পার, তবে কি তুমি আত্মার উন্নতির আশা কখন করিতে পারিবে? জগতে ত্যাগেই সুখ, ভোগে কেহ কখন সুখী হইতে পারে না। ভোগ-স্পৃহা কখন কাহারও মিটে না,—মিটিবে না—মিটিতে পারে না। আমার সহোদর ভ্রাতা আমাকে বঞ্চিত করিয়া যদি সুখী হন, তাঁহার সুখে আমিও সুখী; কিন্তু তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া আমি কখন সুখী হইতে পারিব না। মানব! একদিন যাহা তোমাকে আমাকে জন্মের মত ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহা না হয়, জীবিতকালেই পিতামাতার আদরের ধন—প্রাণের সহোদরকে ছাড়িয়া দিলাম, ইহাতে দুঃখ বা ক্ষোভ কি? মানুষ যদি স্বন-রম্ব ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একদিন জগতকে বিলাইয়া

যাইতে পারে, তবে তুমি আমি ভাইকে বিলাইতে পারি না? ক্ষুদ্র স্বার্থ বা তুচ্ছ অর্থের মোহে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের উৎপত্তি হয়, ভ্রাতৃবিচ্ছেদধর্ম্ম ও ভগবানের চক্ষে গর্হিত কার্য্য। জগতে যাহা গর্হিত, যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহাতেই পাপ এবং পাপেই মানবের মৃত্যু,—আত্মার অবনতি হয়। ভ্রাতৃবিচ্ছেদে পিতামাতার আত্মা কখন সুখী হয় না; তাঁহারা কুপুত্র বোধে যন্ত্রণায় অভিশাপ প্রদান করেন। পিতা মাতার সেই অভিশাপের প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় পুত্র জ্বলিয়া যায়। পৈত্রিক বা স্বোপার্জ্জিত অর্থ যদি জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠকে ছলে, বলে, কৌশলে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং ভোগ করিতে যাই, যদি সন্তান সন্ততির জন্য প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়া যাই, পিতামাতার আত্মা ইহাতে কথনই তৃপ্তিলাভ করিবে না। তাঁহাদের অভিশাপে—ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচারে বিষয় বৈভব বা সন্তান সন্ততি ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় কোথায় কালস্রোতে ভাসিয়া যাইবে। লোক-চক্ষুর সম্মুখে জগতে এরূপ শত শত ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে। সংসারকে চির আগার মনে করিয়া, যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডিতে ঘুরিয়া মরে, তাহাদের মরুভূমি সদৃশ তপ্ত বালুকাময় হৃদয়ে ভ্রাতৃ-প্রেমের অনাবিল অমৃতময় স্নেহাবলী স্থান পায় না। ভ্রাতার ন্যায় মিত্র, ভ্রাতার ন্যায় দুঃখে দুঃখী, ভ্রাতার

ন্যায় সঙ্গের সাথী জীবনব্যাপী অনুসন্ধানের ফলে জগতে দ্বিতীয় মিলিবে না। পিতামাতার পবিত্র রক্তবিন্দু যাহার দেহে প্রবাহিত, তাহাকে যে স্বার্থবশে পর ভাবিতে পারে, তাহার জগতে কেহ আপনার আছে বলিয়া কে বিশ্বাস করিবে? তাহার ন্যায় কৃতঘ্ন ঘৃণিত হেয় জীব ভগবানের রাজ্যে আর আছে কি না, কে বিশ্বাস করিবে? যে পিতামাতার কৃতঘ্ন সন্তান স্বার্থবশে প্রাণের সহোদরকে পর ভাবিতে পারে, তাহার পুত্র কলত্রের প্রতি স্নেহ ভালবাসা বা পুত্র-কলত্রকে আপনার ভাবা মিথ্যা কথার ভাণমাত্র। পবিত্র প্রেম বা স্নেহ এরূপ নীচ অন্তঃকরণে কখন তিষ্ঠিতে পারে না! সুদুর স্বার্থ সাধনের জন্যই সে পুত্রকে স্নেহ করে, স্বার্থবশেই সে পত্নীকে ভালবাসিয়া থাকে! স্বার্থের কিঞ্চিৎমাত্র ব্যাঘাত ঘটিলেই স্নেহ ভাল-বাসা অন্তর্হিত হইয়া হৃদয় দানবের লীলাভূমি হইয়া উঠিবে। ভ্রাতৃপ্রেম বা ভ্রাতৃস্নেহের এমনই প্রভাব, জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ সহস্র শত্রুতাচরণ করিলেও জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠের স্নেহ ভক্তি হৃদয় হইতে কখনই অন্তর্হিত হয় না। ভগবানের নিয়মে কোন্ অজানিত শক্তিবলে হৃদয় কোণে লুকাইত থাকে,—হৃদয়ের অন্তস্তলে কোন্ গুপ্তস্থানে সেই স্নেহ ভক্তি ভাল বাসা ফল্গুনদীর ন্যায় নীরবে বহিতে দেখা যায়। প্রাণের প্রাণ সহধর্ম্মিণীকেও ঘটনা ও অদৃষ্টবৈগুণ্যে প্রেম ও

স্নেহবর্জ্জিত হইয়া ত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু সহোদরকে পর ভাবিয়া ত্যাগ করিতে দেখা গেলেও কখন স্নেহবর্জ্জিত হইতে দেখা যায় নাই। ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ বহু দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভ্রাতৃপ্রেম সম্বন্ধে এই স্থলে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

হুগলি জেলার কোন গ্রামে এক কায়স্থ বাস করিতেন। এই ব্যক্তি ব্যবসা দ্বারা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি জমিদারী বাগান, পুষ্করিণী ও নগদ লক্ষাধিক মুদ্রা রাখিয়া যান। ইহাঁর দুই সন্তান, জ্যেষ্ঠ কাশীনাথ, কনিষ্ঠ বিশ্বনাথ। পিতার মৃত্যুর পর দুই ভ্রাতার কয়েক বৎসর সদ্ভাবেই অতীত হইল; কিন্তু বিষয়কীট যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, স্বার্থরূপ ভীষণ দানব তাহাকে ত্যাগ করিতে চায় না! কয়েক বৎসরের মধ্যেই দুই ভ্রাতায় বিষয় বিভাগ লইয়া বিষম বিবাদ আরম্ভ হইল। পল্লীগ্রামের ভ্রাতৃ-কলহ, তাহার উপর দুই পয়সার সংস্থান আছে, নিষ্কর্ম্মা মাধু খুড়ো সাধু খুড়োর দল আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে উভয় ভ্রাতার স্কন্ধে চাপিয়া ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদানলে ইন্ধন প্রদান করিতে লাগিল। প্রতি পল্লীগ্রামেই এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই গ্রামেও এরূপ লোকের অভাব ছিল না। দুই ভ্রাতার

পৈত্রিক ভিটা লইয়া বিবাদের সূত্রপাত হইল। বিশ্বনাথ বলিল, "বাপের পৈত্রিক ভিটা আমি লইব, উপযুক্ত মূল্য অপেক্ষাও অধিক মূল্য প্রদান করিতেছি।" কাশীনাথ বলিল, "মূল্যের চতুর্গুণ মুদ্রা আমি দিতেছি, পৈত্রিক গৃহ ত্যাগ করিব না।" মাধু খুড়োর দল বিশ্বনাথকে বলিল, "বাবা! তুমি কি বাপের বেটা নও, তুমি কেন পৈত্রিক ভিটা ছাড়িয়া বাপের নাম ডুবাইবে, এরূপ কার্য্য কদাচ করিও না।" সাধু খুড়োর দল কাশীনাথকে বলিল, "বাবা! পৈত্রিক বাস্তু ত্যাগ করা বড়ই অমঙ্গলজনক, জীবন পণ করিয়া বাপের ভিটায় বাস করিবার চেষ্টা কর।" সাধু খুড়োর দূরদর্শিতা মাধু খুড়ো অপেক্ষাও অধিক; তাই কাশীনাথকে ধীর অথচ গম্ভীরভাবে বলিল, "বাবা! তোমায় বাল্যকাল হইতে ভালবাসি, তোমাদের মুখ দেখিয়াই আমার সুখ! স্বার্থের জন্য মন্দ যুক্তি কখন দিব না। যাহা পরামর্শ দিব, তোমার মঙ্গলের জন্য। তোমার পিতা আমাকে ভাই বলিয়া কতই স্নেহ আদর করিতেন, তাঁহার ছেলেকে আজ বাস্তু হইতে তাড়াইয়া দিবে, প্রাণ থাকিতে এ দৃশ্য দেখিতে পারিব না। এই বাস্তুভিটাতে বসিয়া সুখসচ্ছন্দে বাস করিতেছ, ইহা দেখিয়া যদি মরিতে পারি, তবে মৃত্যুতে সুখ হইবে।" বলিতে বলিতে সাধু খুড়োর চক্ষু দিয়া

দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। কাশীনাথ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "খুড়া, তোমার আশীর্ব্বাদ থাকে ত বাপের ভিটা পাইব।"

দুই ভ্রাতায় তুমুল মকদ্দমা বাধিয়া গেল। সাধারণতঃ আইন আদালত ও উকিল মোক্তারের কবলে পতিত হইলে কাহারও রক্ষা নাই। চেন ঝুলাইয়া গাড়ী হাঁকাইয়া যাহারা বিচারালয়ে প্রবেশ করেন, কিছুদিন পরেই দেখিবেন,—ছিন্ন বসনে অঙ্গ ঢাকিয়া তাঁহারা লজ্জা নিবারণ করিতেছেন। বামহস্ত পশ্চাতে ফিরাইয়া ব্যবহারাজীবের দেহি দেহি রব—আদালতের চাপরাসি হইতে উচ্চ নীচ কর্ম্মচারীর তোষামোদ ও নানা উপায়ে মনস্তুষ্টি, কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প ইত্যাদিতে জলের ন্যায় অর্থের অপচয় হেতু লক্ষপতিও দুই দিনে পথের ভিখারী হইয়া পড়ে। দুঃখের বিষয়, যে ক্ষুদ্র মকর্দ্দমাগুলি ব্যবহারাজীবগণ সামান্য চেষ্টায় মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা সেই মকর্দ্দমায় আইনের কূট তর্ক ও ফাঁকি বাহির করিয়া ব্যবসায় উন্নতি করিতে অগ্রসর হন। সুখের বিষয়, উন্নতহৃদয় প্রকৃত দেশহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যবহারাজীবের সংখ্যা অধিক বলিয়াই অনেক মধ্যবিত্ত লোক ব্যবহারাজীবদের সাহায্যে আপোষে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া পিতৃপুণ্যে পরিত্রাণ পাইতেছেন।

নিজেও রাখিব না, পরকেও দিব না, ভূতের শ্রাদ্ধে ব্যয় করিব, এই জেদ বশতই আমাদের দেশে দিন দিন মকর্দ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

কাশীনাথও দুই বৎসরের মধ্যে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মকদ্দমায় উকিল, মোক্তার ইত্যাদির পূজায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িল!

উভয় ভ্রাতার আর অন্নের সংস্থান নাই, জমিদারি নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, বিষয়াদি কতক বিক্রয়, কতক বন্ধক পড়িয়াছে।—অলঙ্কার-পত্র সমস্তই গিয়াছে—অবশিষ্ট পৈত্রিক বসতবাটীখানি আছে। জ্যেষ্ঠ কাশীনাথ অপেক্ষা কনিষ্ঠ বিশ্বনাথের অবস্থা আরও শোচনীয়। উভয় ভ্রাতা সাক্ষী লইয়া জেলা কোর্টে মকর্দ্দমা করিতে গিয়াছিল, মকর্দ্দমা দিনান্তর হওয়ায় সকলেই স্ব স্ব গৃহে আসিতেছে।

জ্যেষ্ঠ কাশীনাথ আসিতে আসিতে দেখিতে পাইল, রাস্তার অপর দিকে একজন হোটেলওয়ালা ব্রাহ্মণ একটা লোককে প্রহার করিতেছে। চারিদিকে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া কেহ বলিতেছে,—"বেটাকে পুলিসে দাও," কেহ বলিতেছে, "তোমার পয়সা আর আদায় হইবে না, অতএব প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দাও," এইরূপ অযাচিত উপদেশ প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে চিরবাধিত করিতেছে।

ব্রাহ্মণ লোকটার গলদেশে মলিন তৈলসিক্ত একখানা গামছা বেষ্টন করিয়া বামহস্তে দৃঢ়রূপে আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রহার করিতে উদ্যত হইতেছে এবং গালাগালি করিতেছে। জানি না, কেন কাশীনাথের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া দেখিল, তাহারই কনিষ্ঠ বিশ্বনাথের এই শোচনীয় পরিণাম। কাশী-নাথ মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পথের উপর বসিয়া পড়িল।

কনিষ্ঠকে মকর্দ্দমায় হারাইবার জন্য যে কাশীনাথ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে—যে কাশীনাথ কনিষ্ঠকে জেলে দিবার জন্য অঞ্জলি অঞ্জলি টাকা ব্যয় করিয়াছে—যে কাশীনাথ কনিষ্ঠকে গৃহত্যাগ করাইবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে—যে কাশীনাথ কনিষ্ঠের মস্তকে লাঠি মারিয়া মাথা ফাটাই-বার জন্য লাঠিয়ালগণকে শত শত মুদ্রা গণিয়া দিয়াছে, বলিতে পার পাঠক। সেই কনিষ্ঠের দুর্দ্দশা দেখিয়া আজ তাহার প্রাণ কাঁদে কেন?

ঐ দেখ পাঠক! কাশীনাথের সপ্তসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে। কাশীনাথ ভাবিতেছে, আমার ভাই—যাহাকে আমি একদিন বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছি, যে ভাইকে আমারই জনক-জননী কত আদরে লালন-পালন করিয়া বড় করিয়াছে, তাহারই এই দুর্দ্দশা! ক্ষুদ্র বিষয় সম্পত্তির

জন্য আমিই ভ্রাতাকে এই শোচনীয় দশায় ফেলিয়াছি। হায়! কেন আমি কনিষ্ঠকে পৈত্রিক ভিটা ছাড়িয়া দিই নাই। যে হোটেলের ব্রাহ্মণ আমাদের কর্ম্মচারীর পাচকের যোগা নয়, তাহার হস্তে আমার কনিষ্ঠের এই লাঞ্ছনা!

কাশীনাথ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া জানিল—সাক্ষীগণের আহারাদির হিসাবে ব্রাহ্মণের পাঁচসিকা বিশ্বনাথের নিকটে পাওনা আছে, কয়েক বার তাগাদা করিয়া পায় নাই। ব্রাহ্মণের ভয়ে কনিষ্ঠ অন্য পথ দিয়া যাতায়াত করিত, আজ হঠাৎ সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহার এই দুর্দ্দশা।

কাশীনাথ ব্রাহ্মণের প্রাপ্য প্রদান করিয়া বিশ্বনাথের হাত ধরিয়া একটি নির্জ্জন বৃক্ষতলে গিয়া বসিল। দুই ভ্রাতার বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে,—ভালবাসা, স্নেহ, ভক্তি যাহা এতদিন উভয় ভ্রাতার হৃদয়-কন্দরে লুক্কাইত ছিল, উথলিয়া উঠিল; কাহারও মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইতেছেনা। কনিষ্ঠ ভাবিতেছে, পূজনীয় পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ সহোদরকে আমি যে মনঃকষ্ট দিয়াছি,—তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ বিষয়ের জন্য তাঁহার চরণে যে দারুণ অপরাধ করিয়াছি,—তাহার বুঝি প্রায়শ্চিত্ত নাই। জ্যেষ্ঠের হৃদয় আত্মতাপানলে হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। কাশীনাথ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া ভাবিতেছে, কুচক্রী দুষ্টলোকের উত্তেজনায় হিংসাপরায়ণ

কুটিল লোকের প্ররোচনায়—কনিষ্ঠের হৃদয়ে যে ব্যথা দিয়াছি,—ইহার প্রায়শ্চিত্ত বুঝি তুষানলেও হইবে না।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ ভাবেই অতিবাহিত হইবার পর কাশীনাথ বিশ্বনাথকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"ভাই, অর্থাভাবে যে তোমায় এত কষ্ট হইয়াছে তাহা আমি জানিতাম না।"

বিশ্বনাথ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দাদা, পয়সার অভাবে দুই দিন সপরিবারে অনাহারে আছি।"

কাশীনাথ কনিষ্ঠের মস্তক চুম্বন করিতে করিতে বলিল,—"বিশু, আমাকে ক্ষমা কর ভাই, অধম হইলেও আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই।"

"দাদা! আমিই আপনার কাছে অপরাধী. জ্যেষ্ঠের আদেশ পালন করি নাই, সেই মহাপাপে আমার এই লাঞ্ছনা। যে গৃহ লইয়া আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা এতদিন বুঝিতে পারি নাই যে, সে গৃহ আপনার। এখন জ্যেষ্ঠের স্নেহাশ্রয়ে থাকিয়া সর্ব্বদা আপনার আজ্ঞা পালনে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিব। এতদিনে বুঝিলাম, জ্যেষ্ঠের অপার স্নেহের সহিত এ জগতে কিছুরই তুলনা নাই।" বিশ্বনাথ কাশীনাথের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কাশীনাথ ভাইকে বক্ষঃস্থলে উঠাইয়া অগ্রসর হইতে

হইতে বলিল, "ভাই, গৃহ তোমার বা আমার নয়, এত দিনে বুঝিলাম যে, জ্যেষ্ঠের সহিত সহিত কনিষ্ঠের কোনই প্রভেদ নাই! আমাদের একদেহ, এক আত্মা, এক রক্ত-মাংস, ও অস্থি;—আমরা একপিতামাতার সন্তান।"

পাঠক! কাশীনাথ ও বিশ্বনাথের ঘটনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, ভ্রাতৃপ্রেম বা ভ্রাতার স্নেহ-ভালবাসা স্বার্থ বা পার্থিব বিষয় সম্পত্তি হইতে উচ্চে—অনেক উচ্চে অবস্থিত।

অনেক স্বার্থপিশাচ শিক্ষিতাভিমানী ভদ্রনামধারী ব্যক্তি ন্যায় ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া থাকেন, একজন কঠোর পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে, আর অপর অক্ষম ভ্রাতারা এবং তাহাদের স্ত্রীপুত্রেরা বসিয়া খাইবে, ইহা কিরূপে ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে? কোন হিন্দুসন্তানেরই এই শ্রেণীর ব্যক্তির কথার উত্তর দিবার প্রবৃত্তি নাই। তবে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, হিন্দুর একান্নবর্ত্তী সংসারের মহৎ ও উচ্চ মধুর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের একান্তই অভাব। যাহারা নিজ উদর-গহ্বর ও স্ত্রী-পুত্রের সুখ-স্বচ্ছন্দতা লইয়া পাগল, যাহারা নিজ নিজ স্বার্থচিন্তা লইয়াই নরকের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য অহরহঃ ব্যস্ত, তাহারা নিতান্ত দীন ও কৃপার পাত্র সন্দেহ

নাই। কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন যে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় অসদ্ভাব না ঘটিলেও স্ত্রীলোকের দ্বারা একান্নবর্ত্তী সংসার নষ্ট হইয়া যায়। স্ত্রীলোকের দ্বারা সংসার নষ্ট বা ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটে, এ কথা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারেন না। ভ্রাতৃপ্রেম বা ভ্রাতার প্রতি স্নেহ স্ত্রীলোকের ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে, ইহা প্রকৃতই অসম্ভব!

স্বার্থপরতাবশে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাইয়া সেই গুরুতর অপরাধ স্ত্রীলোকের উপর অর্পণ করা নিতান্তই কাপুরুষতা, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরুষ-হৃদয়ে রমণী-বাক্যের প্রভাব অত্যধিক হইলেও ভ্রাতৃপ্রেমের উপর এই প্রভাব বিস্তার করিবার ক্ষমতা স্ত্রীলোকের নাই। হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া স্ত্রীর বাক্যে যে ব্যক্তি ভ্রাতৃস্নেহে জলাঞ্জলি দিতে পারেন, তাঁহার হৃদয়ে স্ত্রীবাক্য অপেক্ষা স্বার্থপরতাই প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। যাহার সহিত চিরদিন প্রত্যেক রক্তবিন্দুর ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধ, যাহাকে দেখিলে পিতামাতার প্রেমময়, স্নেহময় মূর্ত্তি মানস-পটে উদিত হয়, স্ত্রীবাক্যে কেহ কখন এরূপ আত্মীয়কে নিজ মন্ত্র হইতে দূরে রাখিতে পারে না। [illegible] স্বার্থের তাড়নাতেই সময়ে সময়ে মানুষ পশুর অধম হইয়া পড়ে,— স্বার্থবশে লোক করিতে পারে না এরূপ

গর্হিত কার্য্য জগতে নাই। সোনার সংসার স্বার্থের জন্যই প্রেতের লীলাভূমি হইয়া উঠে। এই স্বার্থবশেই ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের অঙ্কুর স্বার্থময় সংসারে অঙ্কুরিত হয়—কালে ফলে ফুলে শোভিত হইয়া বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়া উঠে। জল সেচনাদি দ্বারা কোন কোন স্ত্রীলোক এই বিষবৃক্ষ অল্প-দিনেই ফলফুল-সমন্বিত প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত করে, কেহ বা বৃদ্ধি হইতে না দিয়া অঙ্কুরেই বীজ উত্তোলন করিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়। প্রথমোক্ত রমণী দানবের পার্শ্বে দানবী হইলেও স্বামীই ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, শেষোক্ত রমণী স্বামীর সহধর্ম্মিণীরূপে শান্তি, ধর্ম্ম, পুণ্যে সংসার আলোকিত করিয়া স্বামীর পার্থিব ও পারলৌকিক মঙ্গল বিধান করেন। এইরূপ ধার্ম্মিক রমণী সকলেরই প্রণম্য। সহোদর নিজ দেহের একটি প্রধান অঙ্গবিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিজ অঙ্গের উপর সহধর্ম্মি-ণীর আঘাত কেহই সহ্য করিতে পারে না। নিজ অঙ্গ যদি কেহ কর্ত্তন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে বলে, কোন্ আত্মঘাতী ব্যক্তি তাহা করিতে প্রস্তুত হয়? যে সহধর্ম্মিণী অঙ্গবিশেষের অপচয় করিতে বলে, এরূপ স্বামীঘাতিনী হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকাই কর্ত্তব্য। যে হতভাগ্য স্বামী স্ত্রীবাক্যে নিজ অঙ্গ কর্ত্তন করিতে চায়, তাহার অপরাধ অপেক্ষা স্ত্রীর অপরাধ গুরুতর হইতে পারে না, সুতরাং

স্ত্রীবাক্যে যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটে, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত। এরূপ গুরুতর কলঙ্ক-কালিমা স্ত্রীঅঙ্গে লেপন করা সংকীর্ণহৃদয়, লঘুচেতা, অদূরদর্শী, লজ্জাহীন পুরুষেরই শোভা পায়।

এই স্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, শরীরের অঙ্গবিশেষ ছেদন করিলে অঙ্গহীন হইতে হয় বটে, কিন্তু সময় বিশেষে হস্তপদ ইত্যাদি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন না করিলে জীবন রক্ষা হয় না। কোন অঙ্গ ক্ষত রোগে দূষিত বা বিষাক্ত হইলে অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা সেই অঙ্গ চিরদিনের জন্য দূরে নিক্ষেপ করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। সহোদর যদি কুপথগামী হয়, যদি স্বীয় দুষ্কার্য্য দ্বারা পিতৃপিতামহের নামে কলঙ্ক লেপন করিতে অগ্রসর হয়;—যদি সঙ্গদোষে বহু কষ্টের উপার্জ্জিত অর্থ বিলাসবাসনা চরিতার্থের জন্য ক্ষয় করিতে প্রস্তুত হয়, যদি দেহ মন কলুষিত করিয়া কলুষিতা কলঙ্কিনীর কুহকিনী মায়ায় আবদ্ধ হইয়া সহোদরের মর্ম্মপীড়ার কারণ হয়—যদি পিতৃসদৃশ জ্যেষ্ঠের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়—যদি ভ্রাতাকে সৎপথে আনিবার সহস্র চেষ্টা ও উপদেশ ব্যর্থ হইয়া যায়, যদি জ্যেষ্ঠের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়, তবে সে স্থলে দেহের এই দূষিত অঙ্গ পরিত্যাগ করা কি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে না? প্রকৃতই এরূপ অবস্থায়

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু এই অবস্থায় সহোদর নিতান্তই কৃপার পাত্র। ভগবানের করুণা ভিক্ষা ব্যতীত সহোদরকে এই ভীষণ অবনতির পিচ্ছিল পথ হইতে রক্ষা করিবার অন্য উপায় নাই। যাহাদের হৃদয়ে নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃপ্রেম প্রবল, তাহারা সহজেই ভ্রাতাকে এই শোচনীয় মৃত্যুমুখ হইতে ভগবানের কৃপায় রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, দূষিত অঙ্গ বোধে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার আবশ্যক হয় না। যদি ভ্রাতৃপ্রেমে স্বার্থপরতা স্পর্শ না করে, তবে স্ত্রীলোকের প্ররোচনায় বা কুটীলা স্ত্রীর সহস্র চেষ্টায় ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ কখনই ঘটিতে পারে না, একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায়। এই সম্বন্ধে বহু ঘটনার মধ্যে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করিব।

এক পল্লীগ্রামে চারি সহোদর বাস করিতেন। ইহারা জাতিতে সদ্‌গোপ। ইহাদের পিতা কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বৃদ্ধের অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও চারিটি পুত্রকে অতি কষ্টে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। নিজে অহোরাত্র পরিশ্রম করিতেন, কিন্তু ছেলেগুলি যাহাতে সচ্চরিত্র, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হয়, এই ইচ্ছা বৃদ্ধের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকিত। বৃদ্ধ বড়ই উদার, সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক ও মিতব্যয়ী ছিলেন। চারি ভ্রাতায়

সদ্ভাব দেখিয়া বৃদ্ধ কালক্রমে সুখ-শান্তিতে নশ্বরধাম পরিত্যাগ করেন। চারি সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষিকার্য্য ও সংসার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহে থাকিতেন; অপর তিন ভ্রাতা কেহ ব্যবসা, কেহ চাকরির জন্য বিদেশে বাস করিতেন। বিদেশে যে যাহা উপার্জ্জন করিতেন, কেহ এক কপর্দ্দকও নিজের কাছে রাখিতেন না, প্রতি মাসে দাদার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। নিজ নিজ আহারাদির যথাযোগ্য ব্যয় ব্যতীত কেহই এক কপর্দ্দক বৃথা ব্যয় বা সঞ্চয় করিতেন না। যখন নিতান্ত পক্ষে বিদেশে কাহারও কিছু অর্থের প্রয়োজন হইত, দাদাকে লিখিয়া পাঠাইতেন; জ্যেষ্ঠের অনুমতি না পাইলে ব্যয় করিতে সাহসী হইতেন না। জ্যেষ্ঠ পত্রের উত্তরে জানাইতেন, "ভাই! যখন এই ন্যায্য ব্যয় নিতান্তই না করিলে চলিতে পারে না, তখন আমার অনুমতি না লইয়াও অনায়াসে টাকা লইতে পারিতে, আমাকে জানাইবার আবশ্যক ছিল না; তুমি অগৌণে ব্যয় করিবে।" জ্যেষ্ঠ সর্ব্বদা ভগবানের চরণে ভ্রাতাদের মঙ্গল-কামনা করিয়া ভাবিতেন, "আমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলেই এরূপ ভাইগুলি পাইয়াছি। অপর তিন ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের চরণ ধ্যান করিয়া ত্রিসন্ধ্যা ভক্তিভরে বার বার প্রণাম করিতেন। জ্যেষ্ঠের অপার স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া

তাঁহারা বিদেশবাস-যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতেন। সম্বৎসর পরে মা আনন্দময়ীর আগমনের দিনে তাঁহারা জ্যেষ্ঠের চরণ-তলে একত্রিত হইতেন, এই আহ্লাদেই তাঁহারা এক বৎসর বিদেশে যাপন করিতেন।

জ্যেষ্ঠ চারিটী বধূকে সমানভাবে স্নেহ যত্ন করিতেন। যখনই কাহারও কোন জিনিষের আবশ্যক হইত, সম-মূল্যের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া বিভাগ করিয়া দিতেন। ভ্রাতৃবধূগুলি তাঁহার কন্যা বা ভগিনী অপেক্ষাও প্রিয় ছিল। যদি কখন কাহার একটু অসুখ হইত, জ্যেষ্ঠ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতেন এবং বার বার জ্যেষ্ঠবধূর নিকট ভ্রাতৃজায়ার সংবাদ লইতেন। জ্যেষ্ঠবধূ দেবর-পত্নীদিগকে নিজ সহোদরা অপেক্ষাও অধিক স্নেহ, যত্ন করিত। নিজের বসনভূষণগুলি দেবরপত্নীগণকে ব্যবহার করাইয়া মনে মনে আনন্দানুভব করিতেন।

সকলের মন সমান নহে, প্রকৃতিও সকলের সমান হইতে পারে না। কন্যার নির্ম্মল স্বভাব বা হিংসা কপটতা অনেকটা পিতা মাতা বা বংশের উপর নির্ভর করে। কনিষ্ঠা ও মধ্যমা বধূর অন্তঃকরণ অতি সংকীর্ণ ও হিংসা-বিষে পূর্ণ ছিল। সুতরাং কনিষ্ঠার সহিত মধ্যম বধূর প্রণয় অত্যধিক ছিল। তাহারা একশয্যায় শয়ন, একত্রে পান ভোজন এবং সর্ব্বদা একসঙ্গেই থাকিতে ভালবাসিত।

জেষ্ঠ্যা বধূ মধ্যম ও কনিষ্ঠা বধূর সদ্ভাব দেখিয়া বড়ই প্রীত হইত; ভাবিত, ইহারা দুইটি ভগিনীর ন্যায় একসঙ্গে থাকিতে ভালবাসে, ভগবান ইহাদিগকে চিরসুখিনী করুন।

সংসারের কার্য্য অধিকাংশ জ্যেষ্ঠা বধূই সম্পন্ন করিত। রন্ধন-গৃহের যাবতীয় কার্য্যের ভার জ্যেষ্ঠা বধূর উপরেই ছিল। জ্যেষ্ঠা বধূ ইহাতে মনে মনে আনন্দানুভব করিত। সন্ধ্যা হইলেই কোন দিন কনিষ্ঠা বধূ মধ্যমা বধূর গৃহে, কোন দিন মধ্যমা বধূ কনিষ্ঠার গৃহে প্রবেশ করিয়া নানা কথার অবতারণা করিয়া নিজেরাই মীমাংসা করিতে বসিত। কথাপ্রসঙ্গে প্রতিদিনই ইহাদের অধিক রাত্রি হইত। জ্যেষ্ঠা বধূ আদর করিয়া লইয়া গিয়া ভোজনে বসাইত। তিন বধূ আহার করিতে বসিত। জ্যেষ্ঠা বধূ আদর করিয়া কাহারও মস্তকের কেশরাশি কপোল দেশ হইতে সরাইয়া দিয়া কেশগুলি অযত্নের জন্য স্নেহপূর্ণ মিষ্ট ভৎ'সনা করিত। কাহাকেও মলিন বস্ত্র পরিধানের জন্য রহস্য বাক্যে লজ্জা দিত, কাহাকে আরও একটু দুগ্ধ দিয়া অবশিষ্ট অন্নগুলি ভোজনের জন্য মাথার দিব্য দিত। তিন বধূর প্রতি জ্যেষ্ঠার স্নেহ ভালবাসার তুলনা ছিল না।

মধ্যম ভ্রাতা মেদিনীপুর জেলায় এক প্রসিদ্ধ জমি-

দারের নায়েব ছিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা জজকোর্টের পেস্কার ছিলেন। ইহাদের পিতার গুরুদেব বৃদ্ধের অনুরোধে একজন সম্ভ্রান্ত শিষ্যকে সুপারিশ পত্র দেওয়ায় কনিষ্ঠ বিনা চেষ্টায় এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেজ ভ্রাতা মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি বড় মহাজনের গদীতে প্রধান কর্ম্মচারী ও অংশীদার ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইহাদের অপেক্ষাও বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু ভ্রাতাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি কৃষিকার্য্যাদি ও সংসারের ভার লইয়া গৃহেই থাকিতেন। পৈত্রিক ক্রিয়াকলাপ, অতিথি অভ্যাগতের সমাদর, স্ত্রীলোকদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার জ্যেষ্ঠের উপর সমর্পণ করিয়া অপর ভ্রাতারা নিশ্চিন্তমনে বিদেশে অর্থোপার্জ্জন করিতেন। জ্যেষ্ঠ যে কেবল এই সমস্ত কার্য্য লইয়া গৃহে থাকিতেন তাহা নহে; অপর ভ্রাতারা যে অর্থ প্রতিমাসে জ্যেষ্ঠের নিকটে প্রেরণ করিতেন, তাহা সঞ্চয় করিয়া স্বগ্রাম হইতে একক্রোশ দূরে একখানি জমিদারী ক্রয় করতঃ বিবিধ চেষ্টায় জমিদারীখানির আয়ও অত্যধিক বৃদ্ধি করিয়াছেন। আশ্বিনমাসে মহামায়ার পূজায় ভ্রাতারা গৃহে আসিবেন,—এক বৎসরের পরে ভ্রাতাদের মুখ দর্শন করিয়া সুখানুভব করিবেন, এই আনন্দে জ্যেষ্ঠ দুই মাস পূর্ব্ব হইতেই বিভোর থাকিতেন। জ্যেষ্ঠাবধূর আন-

ন্দের সীমা থাকিত না,—প্রাণের দেবরেরা গৃহে আসিতেছে, কে কোন্ জিনিষটি অধিক ভালবাসে—কাহার কোন্ জিনিষটি প্রিয়, এই চিন্তায় বড়বধূ রাত্রে সুখস্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত। প্রভাতে বড়বধূর স্বামী গৃহিণীর স্বপ্নের কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিতেন। সময়ে সময়ে আনন্দাশ্রুতে জ্যেষ্ঠের বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া যাইত। একবার জ্যেষ্ঠাবধূর কঠিন পীড়া হয়। নিয়ত দুইজন চিকিৎসক রোগীকে দেখিবার জন্য যাতায়াত করিতে-ছেন, এমন সময় জ্যেষ্ঠ সংবাদ পাইলেন, কর্ম্মস্থানে মধ্যম ভ্রাতার কয়েক দিন জ্বর হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ সংবাদ পাইবা-মাত্র জগৎ অন্ধকার দেখিলেন,—বিপদের উপর বিপদ বুঝিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন? কিঞ্চিৎ অর্থ এবং গামছাতে একখানি বস্ত্র বন্ধন করিয়া অবিলম্বে ভ্রাতার কর্ম্মস্থানে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং জ্যেষ্ঠাবধূকে কাতরভাবে এই সংবাদ জানাইলেন। জ্যেষ্ঠাবধূ একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'আমাকে দেখিবার অনেক লোক আছেন, আমার জন্য আপনার কোনই চিন্তা করিতে হইবে না,—দেবরকে দেখিবার বিদেশে কেহই নাই। আপনি যাইবার আর বিলম্ব করিবেন না। দেবরের সুস্থ সংবাদ পাইলেই আমি আরোগ্য লাভ করিব।" যথাসময়ে জ্যে

মধ্যমের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহার কয়েক দিবস জ্বর হইয়াছিল, উপস্থিত সুস্থ হইয়া পথ্য পাইয়াছে! জ্যেষ্ঠাবধুর সংবাদ শুনিয়া মধ্যম ভ্রাতা চিন্তাকুল হৃদয়ে জ্যেষ্ঠকে নানারূপ অনুরোধ করিয়া সেই দিনেই গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। দেবরের সুস্থ সংবাদে জ্যেষ্ঠবধূর পীড়া অল্পদিনেই আরোগ্য হইয়া গেল। জ্যেষ্ঠাবধূ রোগ শয্যায় পড়িয়া কত গ্রাম্য দেবতাকে মানস করিতে লাগিলেন। এই বৎসরে আশ্বিন মাসে যখন দেবরেরা গৃহে আসিলেন, তখন জ্যেষ্ঠাবধুর দেবতার মানস ও পূজা আর শেষ হইতেছে না। কোথাও চিনির নৈবেদ্য, ষোড়শোপচার, কোন দিন সত্যনারায়ণের পূজা, কোন দিন বিপদতারিণীর পূজা ও কথা,—এই লইয়া জ্যেষ্ঠাবধূ ব্যস্ত হইয়া রহিলেন।

দেবর বলিল,—"বৌদিদি! এবার কি মানসিক শোধের জন্যই আমাকে গৃহে আনাইয়াছিলেন?"

"দেবতারাই তোমাকে আরোগ্য করিয়াছেন, ভাই!" এই বলিয়া জ্যেষ্ঠাবধূ গ্রাম্য শীতলা দেবীর পূজার ফুলটি দেবরের মস্তকে ছুঁয়াইল—দেবরকে এতক্ষণ দেখিতে না পাওয়ায় ফুলটি হাতে লইয়া জ্যেষ্ঠাবধূ চতুৰ্দ্দিকে দেবরের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

দেবর বৌদিদির চরণে প্রণাম করিয়া বলিল,—

"বৌদিদি! তোমার স্নেহ যাহাকে অহরহঃ বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাকে কি কোন বিপদ স্পর্শ করিতে পারে? আমার বৌদিদির অপার স্নেহই আমাকে বিপদে ও সম্পদে রক্ষা করিতেছে।"

বৌদিদির চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু দেবরের অলক্ষ্যে গড়াইয়া পড়িল।

কুসুমে কীট—চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায় এই শান্তিপূর্ণ সংসারে নীরবে এক অশান্তির সৃষ্টি হইতেছিল, কনিষ্ঠ ও মধ্যম বধূর হৃদয়ে হিংসা-বহ্নি ধিকি ধিকি করিয়া এত দিন জ্বলিতেছিল; এই অনল হৃদয় হইতে কণ্ঠে—কণ্ঠ হইতে মুখে—মুখ হইতে এবার শান্তিপূর্ণ সংসারে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সেজবধূকে স্বদলে আনিবার জন্য ইহারা বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। হিংসা-জর্জ্জরিত হৃদয়ে নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া, আজ ইহারা সেজবধূকে নিজের দলে আনিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে!

ছোটবধূ বলিল,—"সেজ দিদি! তোমার ভাই সংসার-জ্ঞান কিছুই নাই। ইহারা উপার্জ্জন করিয়া যথাসর্ব্বস্ব দিতেছে, আর আমরা পরের গলগ্রহের ন্যায় দাসীর ন্যায় পরিশ্রম করিয়া দুইবেলা দুই মুঠা খাইতেছি।"

"গলগ্রহ কেন ভাই! বড়দিদি আমাদিগকে নিজের

সহোদরা অপেক্ষাও অধিক যত্ন করে।" এই বলিয়া সেজ-বধূ চারিদিকে চাহিতে লাগিল, পাছে বউদিদি কোন কথা শুনিতে পান—পাছে তাঁহার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে আঘাত লাগে।

কনিষ্ঠা ও মধ্যম বধূ এখন স্নেহ মমতা ও চক্ষুলজ্জার বাহিরে আসিয়াছে। যে কালসর্প এতদিন হৃদয়ে পুষিয়া উপযুক্ত আহার দিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহাকে কি আর হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে পারে? সময় বুঝিয়া সে ফণা উত্তোলন করিয়া কালকূট বর্ষণ করিতেছে। বধূদের সাধ্য নাই সে বিষ হইতে নিস্তার পায়। মধ্যমবধূ উত্তেজিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি ভাই, চাকরাণীর ন্যায় থাকিতে পার, আমাদের কিন্তু অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। যথাসর্ব্বস্ব উঁহাদের হস্তে,—আমাদের একটি পয়সার আবশ্যক হইলে ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে। এরূপ ঘৃণিত জীবনে ফল কি?"

"চুপ কর ভাই! যদি বড় দিদি কিছু শুনিতে পান, কি মনে করিবেন?"—এই বলিয়া সেজবৌ বাহিরে আসি-বার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

"দিদি! তুমি সব কথা না শুনিয়াই চলিয়া যাও কেন ভাই?" এই বলিয়া কনিষ্ঠাবধূ হাত ধরিয়া জোর করিয়া সেজবৌকে বসাইল।

মধ্যমবধূ বলিল,—"আচ্ছা, আমাদের অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? সংসারের টাকা কড়ি, বিষয় সমস্তই বড় কর্ত্তার হাতে,—বড়দিদি সংসারে যাহা করিবেন তাহাই হইবে;—তাঁহার উপর আমাদের একটি কথা কহিবারও ক্ষমতা নাই। আমাদের স্বামীরা বারমাস বিদেশে কত কষ্টই সহ্য করিতেছেন। আমরা কি তাঁহাদের কষ্টোপার্জ্জিত পাঁচটা টাকাও মাসে স্বহস্তে খরচ করিবার পাত্রী নহি?"

সেজবৌ এই হিংসা-জর্জ্জরিত হৃদয়ের কথাগুলি শুনিয়া চমকিতা হইয়া উঠিল,—কি বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। বলিল,—"আচ্ছা ভাই, এখন আমি যাই, বড়দিদি রান্নাঘরে জলখাবার প্রস্তুত করিতেছেন, খেঁদা উঠিয়া কাঁদিবে, তাহাকে লইয়া আসি।"

খ্যাঁদা বড়বধূর একমাত্র পুত্র। সেজবধূর আদরের ধন,—খ্যাঁদা কাকাদের কণ্ঠের হার! নয়নের মণি!

সেজবধূর কথা শুনিয়া কনিষ্ঠা ও মধ্যমাবধূ বিদ্বেষ ও উপহাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা ভাই! তুমি অতটা বড়দিদির তোষামোদ কর কেন? তোমার বড়ই হীন স্বভাব, পরের তোষামোদ করিয়া, দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্নের জন্যই কি এই গৃহে ঢুকিয়াছিলে?"

সেজবধূ পূর্ব্ব হইতে ইহাদের কথায় প্রাণে আঘাত

পাইয়াছিল, কিন্তু নিজে কখন কাহার প্রাণে আঘাত দিয়া কথা কহিতে ভালবাসে না; তাই সেস্থান হইতে চলিয়া যাইবার জন্য, বার বার চেষ্টা করিতেছিল! কনিষ্ঠা ও মধ্যমাবধূর শেষোক্ত কথাগুলি শুনিয়া সেজবধূর বড়ই রাগ হইল। অভিমান ও ক্রোধে সেজবধূর বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল,—জলভারাক্রান্ত হইয়া চক্ষু দুটি ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। বক্ষের স্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

সেজবৌ দুঃখের সহিত বলিতে লাগিল,—"ভাই! তোমরা আজকাল কেন এত মন্দ ভাবে কথা বল? ইহাতে আমার বড় দুঃখ হয়। যে দিদি আমাদিগকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছেন,—যাঁহার স্নেহ যত্ন জননী বা সহোদরা অপেক্ষাও অধিক;—আমাদের একটু অসুখ হইলে যিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শিয়রে বসিয়া থাকেন,—সেই জননীতুল্যা জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে স্নেহ ভক্তি করিলে, কি তোষামোদ করা হয়? এই ঘর কি পরের ঘর? দিদি কি আমাদের পর, যে তোষামোদ করিয়া পরের ঘরে ভাত খাইতেছি। উঁহারা বড়—আমরা ছোট, ভগবান আমাদিগকে আজ্ঞাপালন করিতে পাঠাইয়াছেন। ইহাতে কি হীনতা প্রকাশ পায়? জ্যেষ্ঠা আজ্ঞা করিতেছেন, আমরা কনিষ্ঠা আজ্ঞা পালন করিতেছি। সংসারে

আজ্ঞা করা অপেক্ষা আজ্ঞা পালনে অধিক সুখ। আমাদের দায়িত্ব মাত্র আজ্ঞা পালন করা; কিন্তু যাঁহারা আজ্ঞা করেন, তাঁহাদের দায়িত্ব আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। যাঁহারা সংসারে বড় হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের ভগবান-প্রদত্ত এমন কতকগুলি শক্তি থাকে, যাহা কনিষ্ঠের থাকে না—থাকিতে পারে না। সংসারে একজনের উপর নির্ভর করিয়া থাকায় যে সুখ, সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করিলে সে সুখ কখনই পাওয়া যায় না। মাথার উপর সুখ দুঃখ ভাবিবার কেহ না থাকিলে, সংসার [illegible] বলিয়া মনে হয়। দিদি আমাদের সকলের বড়, ঠাকুর—দিদি অপেক্ষাও বড়! ইঁহাদের আজ্ঞা যদি পালন না করি, তবে সংসারে কাহাকে লইয়া থাকিব?” এই বলিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে সেজবধূ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই ঘটনার পর দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন আর সংসারে সে সুখ শান্তি নাই। কনিষ্ঠা ও মধ্যমাবধূর হিংসাপূর্ণ দৃষ্টি ও ব্যবহারে কেহই সুখ শান্তিতে থাকিতে পায় নাই! ভ্রাতৃবধূদের ব্যবহারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সর্ব্বদাই ক্ষুণ্ণমনে কালযাপন করিতেছেন। জ্যেষ্ঠাবধূর আহার নিদ্রার সুখ নাই, সর্ব্বদাই বিমর্ষ ভাব। কত বিদ্রূপ—কত শ্লেষ বাক্য দ্বারা জ্যেষ্ঠাবধূ বিদ্ধ হইতেছেন;

একটি কথার উত্তরও কখন দেন নাই। সর্ব্বদাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, "হে ভগবান! ভগিনী দুটি নিতান্তই অবোধ, ইহাদিগকে সুমতি দিন।"

আমার সোনার সংসার,—লক্ষ্মণের ন্যায় দেবর, রামের ন্যায় ধার্ম্মিক স্বামী, যাঁহারা আমার শ্বশুরের বংশধর, নয়নের মণি, ভগবান আমাকে কোন অভাবেই রাখেন নাই, তবু এই শান্তির সংসারে অশান্তি হয় কেন? দেবরগুলির সন্তান হইলেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়। জ্যেষ্ঠাবধূ এইরূপ চিন্তাতে এখন দিন যামিনী অতিবাহিত করিতেছে।

আরও এক বৎসর চলিয়া গেল। কনিষ্ঠা ও মধ্যমা বধূ এখন জ্যেষ্ঠাবধূর সামান্য একটি কথা লইয়া তুমুল বিবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কর্ত্তারও আর ভ্রাতৃবধূদের কাছে সম্মান নাই। ভ্রাতৃবধূরা এখন কর্ত্তার মুখের উপর জবাব দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কর্ত্তার সম্ভ্রম ভ্রাতৃবধূদের নিকট এখন ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে।

গত তিন বৎসর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠগণের মুখ চাহিয়া সকল লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন; মান অপমান সমান জ্ঞান করিয়া সংযমী যোগীর মত পূর্ব্বের ন্যায় ধীরভাবেই সংসার রক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ অতিশয় অসহ্য

হইয়া উঠিল। ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে—মানুষের শক্তিরও একটা সীমা আছে। একদিন জ্যেষ্ঠ আহার করিতে বসিয়াছেন,—জ্যেষ্ঠাবধূ রন্ধনান্তে সকলকে পরিবেশন করিতেছেন,—সেজবৌ রন্ধনগৃহে অন্যকার্য্যে ব্যাপৃত আছে। কর্ত্তার তিন বৎসরের শিশু খ্যাঁদা নিদ্রা হইতে উঠিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। পুত্রের ক্রন্দনে পিতার অন্ন মুখে উঠিতেছে না। কনিষ্ঠা ও মধ্যমাবধূ গৃহে বসিয়া খোসগল্প করিতেছে, তত্রাচ এত চীৎকারেও খ্যাঁদাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কেহ বাহির হইতেছে না। কর্ত্তা অনেকক্ষণ বসিয়া এই ব্যাপার দেখিলেন। শান্তির সংসারে ভাবী ভীষণ বিপ্লবের আশঙ্কা বুঝিয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না—আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কর্ত্তাকে আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতে দেখিয়া জ্যেষ্ঠাবধূর বড়ই দুঃখ হইল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। অঞ্চলে নয়নাশ্রু মুছিতে মুছিতে জ্যেষ্ঠাবধূ অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিল,—"মেজবৌ, তোমরা ঘরে বসিয়া আছ, একবার খোকাকে কোলে লইলে না—ইনি আহারে বসিয়া উঠিয়া পড়িলেন, ইহা কি সকলের পক্ষে ভাল ?"

জ্যেষ্ঠাবধূর মুখ হইতে কথা কয়টি বাহির হইবামাত্র কনিষ্ঠা ও মধ্যমবধূ গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া ক্ষুধিত

বাঘিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইল।

জ্যেষ্ঠাবধূ বধূদ্বয়ের কর্কশ চীৎকারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অতি নম্রভাবে স্নেহসূচক স্বরে বলিল,—"আমি কোন মন্দ কথা বলি নাই, রাগ কর কেন? যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, চুপ কর। ইনি আহারে বসিয়া অভুক্ত অবস্থায় উঠিয়া পড়িলেন, ইহা কি চক্ষে দেখা যায়?"

"আরো বলিবার কি আছে, বলিতে বিলম্ব কর কেন? আমরা ঘরে বসিয়া আছি, ইহা তোমাদের স্ত্রীপুরু-ষের অসহ্য। ঘর হইতে বাহির করিয়া দাও, আমরা পথে গিয়া দাঁড়াই! সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াছ, এইবার গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়া স্ত্রীপুরুষে ছেলে লইয়া সুখে ভোগদখল কর। এই বলিয়া উভয় বধূতে হাত মুখ নাড়িয়া কর্ত্তা গৃহিণীকে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠাবধূ অশ্রু মুছিতে মুছিতে রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিল। একটি কথাও জ্যেষ্ঠাবধূর মুখ হইতে বাহির হইল না। কনিষ্ঠা ও মধ্যমা বধূর স্বর ক্রমশঃ সপ্তমে উঠিতে লাগিল দেখিয়া সেজবধূ আর সহ্য করিতে পারিল না। দিদির অপমান—স্বামীর মাথার মণি জ্যেষ্ঠ ঠাকুরের প্রতি অপ-মানসূচক গালাগালি সেজবধূর একবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। সেজবধূ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—

"ভাই! তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই কর,—পৃথক হইতে চাও তাহাই হও; তোমাদিগকে কেহ নিষেধ করে না; জ্যেষ্ঠ ঠাকুরের প্রতি এরূপ ইতরের ন্যায় গালাগালি প্রয়োগ করিতে তোমাদের কি একটুও লজ্জা সরম হইতেছে না?"

"তুই তোষামোদ করিয়া কুকুরের মত যেমন আছিস তেমনই ভাবে থাক্, তোকে কথা কহিবার জন্য আমরা ডাকি নাই। ইতরের সহিত কথা কহিবার আবশ্যকতা নাই।" এই বলিয়া বাঘিনীদ্বয় সেজবধূর উপর পড়িল। বড়বধূ তাড়াতাড়ি সেজবধূকে টানিয়া ক্রোড়ের কাছে বসাইয়া বলিল,—"লক্ষ্মী দিদি! ঝগড়া করিও না। উহারা যদি অবোধ হয়, তুমিও কি উহাদের সঙ্গে অবোধ হইবে? তোমার বড়দিদির অনুরোধ রাখ, একটিও কথা কহিও না। উহাদের রাগ পড়িয়া গেলেই উহারা নিজেই নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিবে। তখন অনুতাপে উহারা জর্জ্জরিত হইবে। আমি ত উহাদিগকে কোনই মন্দ কথা বলি নাই: বলিবই বা কেন? উহারা কথাটা মন্দভাবে লইয়া ছেলমোনুষের মত রাগ করিতেছে।"

সেজবধূ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দিদি! উহাদের অভিপ্রায় পৃথক হওয়া, তাহাই উহাদিগকে হইতে দাও। তুমি এমন করিয়া নিত্য অপমান সহ্য করিয়া,—

নিত্য পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ঠাকুরকে অপমানিত করিয়া কেমন করিয়া উহাদের সহিত একত্রে সংসার করিবে?" সেজ বধূ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, জ্যেষ্ঠাবধূ তাড়াতাড়ি সেজবধূর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল ;—

"ছি দিদি! অমন কথা মুখে আনিও না। আমরা কাহার সহিত পৃথক হইব? আমার লক্ষ্মণের ন্যায় দেবর-দিগকে মন হইতে পৃথক করিতে পারিব না, ছেলে-মানুষের মত এমন কথা আর বলিও না? উহারা অবোধ, উহাদের কথায় রাগ করিয়া কি এই সোণার সংসার ভাসাইয়া দিব? কিছুদিন আমি অন্য স্থানে গিয়া থাকিব। উহারা নিজের সংসার নিজে করিবে, সে ত সুখের কথা দিদি! উহাদের উপর রাগ করিয়া সোণার দেবরদিগকে আমি কখন পর ভাবিতে পারিব না!"

জ্যেষ্ঠ নীরবে দাঁড়াইয়া সকল কথাই শুনিলেন,—সকল ব্যাপারই দেখিলেন। একটি কথাও তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না। তিনি নিস্পন্দ হইয়া ভাবিতেছেন, আর এই সংসারে থাকা আমার কর্ত্তব্য নহে। আমরা এক্ষণে গৃহত্যাগ করিয়া গেলে সংসারে শান্তি আসিলেও আসিতে পারে। হায়! আমার সোণার ভাই তাহাদের স্ত্রী এরূপ দানবী হইল কেন? আজ তিন বৎসর অনেক অপমান সহ্য করিয়াছি, বধূদের সুমতির জন্য ত্রিসন্ধ্যা

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছি; ভগবান আমার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। কাজেই সংসারের মঙ্গলের জন্য আমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে।

জ্যেষ্ঠ অনাহারে শয্যায় শয়ন করিয়া সমস্ত দিন অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিলেন। নানা চিন্তার পর তিনি কাশীধামে যাইয়া কিছুদিন বাস করাই স্থির করিলেন। সন্ধ্যার পর তিনি কাশীধামে গমনের সমস্ত আয়োজন ও বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

"আপনার চরণে ধরিয়া বলিতেছি, একবার এত-উতলা হইবেন না।"

খাঁদাকে বামক্রোড়ে লইয়া দক্ষিণ হস্তে স্বামীর চরণ ধরিয়া জ্যেষ্ঠাবধূ কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীকে উপরিউক্ত কথাগুলি বলিল।

"দেখ বড়বৌ! সংসারে আমার চিরদিনই আস্থা নাই। আমার প্রথমা স্ত্রী বসন্তের মৃত্যুর পর আমি আর বিবাহ করিব না, ইহা সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার নিকট মানবের সহস্র চেষ্টা ভাসিয়া যায়। আমার অদৃষ্টে খাঁদার মুখকমল দেখা আছে, তাই বুঝি ভগবান জোর করিয়া সংসারে প্রবেশ করাইয়াছেন। ভাই আমার প্রাণ;—ভ্রাতার স্নেহেই আমি বাল্যকাল হইতেই সুখী! বড়বৌ! অপমান লাঞ্ছনা আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

শান্তির জন্য লোকে আত্মীয় পরিজন লইয়া সংসার গঠন করে,— সেই শান্তি-সুখই যখন আমার অদৃষ্টে নাই, তখন আর সংসার আশ্রমে থাকিয়া ফল কি!”

“আপনার মনের কষ্ট আমি সকলই বুঝিয়াছি। আপনাকে আমি কি বুঝাইব? দেখুন, আমরা যদি চলিয়া যাই, সংসারটা একবারে ভাসিয়া যাইবে। দেবরেরা কি মনে করিবে? তাহাদিগকে একটা সংবাদ পাঠাইয়া যাহা করা কর্ত্তব্য তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করুন। বধূদিগের সহস্র অপরাধ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। বিনাদোষে আপনি দেবরদিগকে অভিমান বা ক্রোধের ফলভাগী কেন করিতেছেন?”

বড়বধূর কথাগুলি শুনিয়া জ্যেষ্ঠ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। বড়বধূর কথাগুলি তাঁহার যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। তিনি সহোদরদিগকে নিতান্ত মর্ম্মাহত হৃদয়ে পত্র লিখিতে বসিলেন। একখানি পত্র লিখিয়া সেই পত্রের অনুলিপি তিন ভ্রাতাকেই যখন ডাকযোগে প্রেরণ করিবার জন্য তিনখানি পৃথক পৃথক খামের মধ্যে বন্ধ করিতেছেন, সেই সময়ে জ্যেষ্ঠাবধূ একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সেই মর্ম্মভেদী নিশ্বাসশব্দে তাঁহার অন্তঃস্থলের বেদনা কত গভীর কর্ত্তা তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি সজল নয়নে পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন।

পত্র।

"প্রাণের ভাই !

"সর্ব্বদা ভগবানের নিকট তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, তোমরা কুশলে আছ। আজ যে পত্র লিখিতেছি,—এরূপ পত্র আর কখন লিখি নাই, সুতরাং এই পত্র পাঠে আমার ন্যায় তোমরাও মর্ম্মাহত হইবে সন্দেহ নাই। গত তিন বৎসর আমি যে অপমান, মনোকষ্ট ও অশান্তি হৃদয়ে সহ্য করিতেছি, তাহা এতদিন তোমাদিগকে জানিতে দিই নাই। তোমরাও আমার ন্যায় মনোকষ্ট পাইবে, অশান্তিভোগ করিবে, এই ভাবিয়া গত তিন বৎসর সকল যন্ত্রণাই নীরবে সহ্য করিয়াছি। কিন্তু ভাই, আর না জানাইলে পিতার বহুকষ্টের সোনার সংসার বুঝি ছারখার হইয়া যায়। তিনবার তোমরা বাটিতে আসিয়াছ, অতিকষ্টে হৃদয়ের যাতনা চাপিয়া রাখিয়া তোমাদের মুখ দেখিয়া সকল কষ্টই ভুলিয়া গিয়াছি। এক একবার দুঃখের কথা নির্জ্জনে প্রাণের ভ্রাতাদের কাছে প্রাণ খুলিয়া বলিব ভাবিয়াছি, কিন্তু তোমাদের মুখের হাসি শুষ্ক হইয়া যাইবে বলিয়া, বলিতে সাহস করি নাই। কনিষ্ঠা ও মধ্যম মাতাকে ভগবান সুবুদ্ধি দিবেন এই আশা করিয়া তিন বৎসর তোমাদের মুখ চাহিয়া অশান্তি-অনল বুকে জ্বালিয়া সংসারে বাস করিতেছিলাম।

প্রাণাধিক ভ্রাতৃগণকে লইয়া সংসারে সুখশান্তিভোগ করা ভগবানের বুঝি আর অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে আমি ৺কাশীধামে থাকিয়া সর্ব্বদা ভগবান বিশ্বেশ্বরের চরণে তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিব বাসনা করিয়াছি। আমি আশা করিতে পারি, প্রাণের ভ্রাতারা কখন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহিবে না।

"আমি আবার এই গৃহে প্রবেশ করিব ইহা বোধ হয় ভগবানের অভিপ্রেত নহে। আমি যতদূর চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, আমরা পুনর্ব্বার গৃহে আসিলে সংসারের সুখ শান্তি অক্ষুন্ন থাকিবে না। স্বর্গীয় পিতৃদেবের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে,—আমি গৃহে থাকিয়া যে জমিদারি ও অন্যান্য সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি, সকলি তোমাদের—আমার কিছুই প্রয়োজনে লাগিবে না; তোমাদের উপার্জ্জিত অর্থের একপয়সাও আমি সংসারে ব্যয় করি নাই। কনিষ্ঠকে আমি প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসি, ভ্রাতৃস্নেহের চিহ্নস্বরূপ আমি তাহার নামে একটি কারবার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। ইহা ব্যতীত আমার নিজ বুদ্ধি, পরিশ্রম বা চেষ্টায় যাহা কিছু করিয়াছি, সকলই প্রাণাধিক সহোদরের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের জন্য। খঁ্যাদা আমা অপেক্ষাও তাহার কাকাদের আদরের ধন। তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তা আমা অপেক্ষা তাহার কাকাদেরই অধিক। এবার পূজার সময় গৃহে আসিলে

একবার কাশীধামে গমন করিয়া তোমাদের এই হতভাগ্য দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিস্মৃত হইও না—সেই আনন্দে সকল কষ্ট ভুলিয়া তোমাদের আশাপথ চাহিয়া থাকিব।

"তোমার দাদা।"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্র যথাসময়ে তিন ভ্রাতার হস্তগত হইল। পত্র পাঠ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্য, স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। যে ভাই জ্যেষ্ঠের একটু কষ্টের কথা শুনিলে অস্থির হইয়া পড়ে;—যে ভাই দাদার সুখের জন্য জীবনদান করিতেও কুণ্ঠিত হয় না—যে ভাই কাহাকেও জ্যেষ্ঠের প্রতি একটি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনিলে ক্রোধান্ধ হইয়া সেই মুহূর্ত্তেই প্রতিফল দিতে ইতস্ততঃ করে না,—যে ভাই জ্যেষ্ঠের মন সন্তুষ্ট ও তাঁহাকে সুখে রাখিবার জন্য সহস্র দুঃখ কষ্ট ও বিপদকেও পরমসুখ জ্ঞান করে, সেই পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ নিজ নিজ স্ত্রীর হস্তে এই লাঞ্ছনা, এই দুর্দ্দশা! এই স্ত্রী! যে স্ত্রী স্বামীকে কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে চায়, সে কি সহধর্ম্মিণী নামের যোগ্যা? স্ত্রী ভালবাসা, সোহাগ ও আদর পাইবার অধিকারিণী হইলেও কি স্বামীর হৃদয়ের পঞ্জরখানি লইয়া হিংসা-প্রবৃত্তিবশে দূরে নিক্ষেপ করিবার অধিকারিণী। তিন ভ্রাতারই আজ একই চিন্তা—একই উদ্বেগ।—

সকলেই আজ জগৎ অন্ধকার দেখিতেছে—দাদার যে অমূল্য স্নেহ সংসারের সহিত জড়িত ছিল, সেই স্নেহ-বন্ধন যেন শিথিল বলিয়া ভ্রাতৃগণ শিহরিয়া উঠিতেছে। জ্যেষ্ঠের হৃদয়ে যে দুঃখ-শেল বিদ্ধ করিয়াছে, সে যেই হউক, তাহার সমুচিত প্রতিফলের জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিল।

দাদার চরণ-দর্শনের জন্য তিন ভ্রাতাই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। তিন ভ্রাতায় পরস্পর পত্রের দ্বারা একদিনই বাটী গমনের দিন নির্দ্দিষ্ট করিল এবং নিম্নলিখিত পত্রের দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিজেদের বাটী আগমনের সংবাদ জানাইল।

"দাদা! আপনার পত্র পাঠে আপনার শ্রীচরণ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি। দুই সপ্তাহের মধ্যেই আমরা স্ব স্ব কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া গৃহে যাইব। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের কোন কথা কহিবার ক্ষমতা নাই, কথা কহা ঘোরতর পাপ মনে করি। কিন্তু আপনার স্নেহের ভ্রাতাদের একান্ত প্রার্থনা, যেন গৃহে গিয়া শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিত না হই! যদি কাশী গমনই স্থির হইয়া থাকে, তবে আমরা গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিব। আপনার পত্র পাঠে বুঝিয়াছি, কনিষ্ঠা ও মধ্যম বধূ পৃথক হইতে চান—তাহাতে সংসারের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে করি না। আপনি কোনরূপ মনোকষ্ট না

করিয়া তাহাদের পৃথক আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। আপনার চরণ-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকিলাম।"

"আপনার আজ্ঞাবহ ভ্রাতা—

শ্রী............

কনিষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতা নিজ নিজ পত্নীদিগকেও নিম্নলিখিত পত্রের দ্বারা তাহাদের পৃথক হওয়ার বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

"শ্রীমতী.........

"পূজনীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্রে জ্ঞাত হইলাম, তোমরা সম্প্রতি আমাদের সংসারে থাকিতে অনিচ্ছুক। যদি পৃথক হইলেই সুখী হও, তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। তোমরা পৃথক হইতে কালবিলম্ব না করিলেই সুখী হইব।"

"শ্রী........"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পত্রখানি পাইয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু ভ্রাতাদের গৃহাগমনের সংবাদ হৃষ্টচিত্তে জ্যেষ্ঠা বধূকে জ্ঞাত করাইলেন। জ্যেষ্ঠাবধূ হর্ষ-বিষাদে দেবরগণের গৃহাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কনিষ্ঠা ও মধ্যমা বধূ পত্র পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহারা আশা করে নাই যে, এত শীঘ্র

এবং এত সহজে তাহাদের ইপ্সিত সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইবে। তাহাদের আশা সফল হইতে দেখিয়া মনের আনন্দে গৃহাদি বিভাগের বন্দোবস্ত মনে মনে করিতে লাগিল। কে কোন্ গৃহটি লইবে, কাহার কোথায় রন্ধনশালা হইবে, কাহার কোন্ স্থানে ধান্যের গোলা হইবে, এই সমস্ত চিন্তা করিতেই সেদিন অতীত হইয়া গেল।

জ্যেষ্ঠা বধূ রন্ধনাদি করিয়া কনিষ্ঠা ও মধ্যম বধূকে আহারের জন্য বারবার অনুরোধ করিলেও তাহারা আহার করিতে কিছুতেই সম্মত হইল না। পরদিন কনিষ্ঠা ও মধ্যম বধূ পৃথক রন্ধনাদি করিয়া আহার করিল। জ্যেষ্ঠা বধূর সেদিন কেবল ক্রন্দনেই অতিবাহিত হইল; অপমান হইবার ভয়ে বধূদ্বয়কে সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না।

দুই সপ্তাহ এই ভাবেই অতীত হইল। একদিন বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় ভ্রাতৃদ্বয় বাটীতে পৌঁছিল। কনিষ্ঠা ও মধ্যমা বধূ পৃথক পৃথক উপাদেয় খাদ্যাদি পাক করিয়াছে—জ্যেষ্ঠা বধূও দেবরদের জন্য হর্ষ-বিষাদে রন্ধন করিতেছে! জ্যেষ্ঠা বধূর রন্ধন আজ ভাল হইতেছে না—হয় ত কোন ব্যঞ্জনে দুইবার লবণ দিতেছে—কোন ব্যঞ্জনে লবণ দিয়াছে কি না মনে পড়িতেছে না!

ঝোলে লবণ দিয়াছে কিনা সেজ বধূকে জিজ্ঞাসা করিতেছে; অন্যদিকে অম্বলের জল শুষ্ক হইয়া ধূমরাশি উত্থিত হইতেছে। পায়সান্নে দুগ্ধ ঢালিতে গিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল! এমন সময় দেবরেরা গৃহে প্রবেশ করিল।

ভ্রাতারা প্রথমেই জ্যেষ্ঠের চরণে প্রণাম করিয়া পদধূলি মস্তকে লইল। খাঁদার আজ আনন্দের সীমা নাই, আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে কাহার ক্রোড়ে উঠিবে স্থির করিতে পারিতেছে না; "এইতে" "ঐতে" করিতে করিতে খাঁদার ছোট মস্তকে বিষম গোলাযোগ উপস্থিত হইল। কাকারা খাঁদাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া জ্যেষ্ঠা বধূকে প্রণাম করিতে গমন করিল। জ্যেষ্ঠাবধূ আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া চক্ষের জলে দেবরদের মুখ কমন ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না। খাঁদা আনন্দে মাতার নিকট হইতে তৈলভাণ্ড তুলিয়া কাকাদের মাথায় মাখাইতে গিয়া সমস্ত তৈলটা ভূমে ফেলিয়া দিয়া "ঐ যা!" বলিয়া এক কাকার গলা বেষ্টন করিয়া ক্রোড়ে উঠিয়া পড়িল! কাকারা খাঁদার পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিয়া শাসন করিল—খাঁদা গুরুতর শাসনে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে দুই হস্তে গলাটি আরও দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিল।

বহুদিন পরে দেবরেরা জ্যেষ্ঠা বধূর হস্তের অন্ন-ব্যঞ্জন আহার করিয়া মনের আনন্দে কত কথাই জ্যেষ্ঠা বধূকে

বলিতে লাগিল। রাত্রেও চারিভ্রাতায় একত্রে বসিয়া আহার করিল—বড় বধূর আজ আনন্দের সীমা নাই, কিন্তু কনিষ্ঠা ও মধ্যম বধূ এই আনন্দে যোগ না দেওয়ায় তাহার মন ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। জ্যেষ্ঠা বধূ উভয় বধূকে কত সাধ্য সাধনা করিল,—কত বুঝাইল, কিছুতেই তাহাদের মন ফিরাইতে পারিল না। তাহারা দলিতা ফণিনীর ন্যায় মনে মনে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

কনিষ্ঠা ও মধ্যম বধূ নিজ নিজ গৃহে বসিয়া রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিল—কখন স্বামীর উপর অভিমান—কখন ক্রোধ—কখন দুঃখ—কখন অঞ্চল বিছাইয়া মৃত্তিকায় শয়ন—এই রূপেই রজনী অতিবাহিত হইল—সমস্ত রাত্রির মধ্যে গৃহদ্বারে কাহারও পদশব্দও শ্রুত হইল না!

এদিকে জ্যেষ্ঠা বধূর গৃহে আজ চাঁদের হাট বসিয়াছে। জ্যেষ্ঠা ও সেজ বধূ গৃহের এক কোণে ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছে; অন্য দিকে চারি ভ্রাতায় মনের আনন্দে কত কথাই কহিতেছেন।—খাঁদা গৃহের চতুর্দ্দিকে ইংরাজি-বাঙ্গলা-সংস্কৃত-মিশ্রিত এক অপরূপ ভাষায়—ধীর গম্ভীর ভাবে কত কথার আবৃত্তি করিতে করিতে কখন সেজ কাকীর ক্রোড়ে ঢিপ্ করিয়া পড়িয়া অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিতেছে—কখন মাতৃ-অঞ্চল বাম হস্তে ধরিয়া

টলিতে টলিতে কাকার অঙ্গুরীটি অঙ্গুলি হইতে খুলিয়া নিজ অঙ্গুলিতে পরিতেছে! আবার সেটা ভাল লাগিল না—সেজ কাকার রুমালখানি কাড়িয়া আনিয়া কাকীর মুখটি মুছাইয়া দিতেছে। সেজ কাকী অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে খ্যাঁদার মুখচুম্বন করিল—সে চুম্বনে খ্যাঁদার বুঝি মন উঠিল না—দৌড়িয়া আসিয়া সেজ কাকার মুখের উপর মুখ দিয়া তাহাকেও মুখচুম্বন করিতে ইঙ্গিত করিল।

রাত্রি ক্রমেই অধিক হইতে লাগিল, জ্যেষ্ঠা বধূ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৃহে যাইয়া শয়ন করিবার জন্য ভ্রাতৃগণকে বার বার অনুরোধ করিলেন। সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া মধ্যম ভ্রাতা খ্যাঁদার নূতন পোষাক বাহির করিয়া খ্যাঁদাকে পরাইতে বসিল। কনিষ্ঠ একছড়া গিনির নিমফল বাহির করিয়া বড় বধূর হস্তে দিয়া বলিল,—"দেখ দেখি বৌ দিদি! এইটি পরিলে আমার খ্যাঁদাকে কেমন দেখাইবে?" সেজ ভ্রাতা একছড়া সুন্দর "বিনোদিনী" নেকলেস পোর্টম্যাণ্টোর ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া বড়বধূর পায়ের কাছে রাখিয়া বলিল, "বৌ দিদি! তাড়াতাড়িতে আপনার জন্য বেশী কিছুই এবারে আনিতে পারি নাই, গরিব দেবরের উপর রাগ না করিয়া এইটি গলায় দাও!"

মধ্যম ভ্রাতা নেকলেসটির গঠন ও শিল্পনৈপুণ্যে

অতীব মুগ্ধ হইয়া বলিল,—"নেকলেসটির গঠন বড়ই সুন্দর হইয়াছে, কোথায় গড়াইয়াছিলে ?"

সেজ ভ্রাতা বলিল, "কলিকাতার বিখ্যাত জুয়েলার্স মণিলাল কোংর ফারমে।"

নানা কথাবার্ত্তা ও আনন্দে পূর্ব্বদিক ফর্সা হইয়া গেল, সকলেই মনের সুখে নানা প্রকার গল্পগুজব করিয়া সমগ্র রজনী বিনিদ্র অবস্থায় অতিবাহিত করিল, কাহারই আর সে রাত্রে নিদ্রা হইল না।

চারি পাঁচ দিন এইরূপ আনন্দেই গত হইয়া গেল। চারি ভ্রাতায় অহোরাত্র একত্রেই কালযাপন করিতেছে! রাত্রে গৃহমধ্যে শয়ন করিবার জন্য জ্যেষ্ঠাবধূর সহস্র অনুরোধ ও চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। কনিষ্ঠা ও মধ্যম বধূ বিপরীত ফল দেখিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিতে লাগিল।

একদিন প্রাতে উঠিয়া কনিষ্ঠা বধূ বড়বধূর নিকটে গিয়া বলিল,—"দিদি! আমায় বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিতে বল, আমি এক দণ্ড আর এস্থানে থাকিব না।"

জ্যেষ্ঠা বধূ বলিল,—"কি করিব দিদি! গৃহে থাকিবার জন্য আমি এত অনুরোধ করিতেছি,—কতরূপে বুঝাইতেছি, কিছুতেই সে কথায় কর্ণপাত করে না, আমি ইহাদের মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

কনিষ্ঠা বধূ প্রত্যহ বারবার জ্যেষ্ঠা বধূকে পিত্রালয়ের

কথা বলিতে লাগিল, শেষে না পাঠাইলে আত্মঘাতী হইবার ভয় দেখাইল।

একদিন কনিষ্ঠের কর্ণে এই কথা যাইবামাত্র বলিল, "বৌ দিদি, একথা এতদিন দাদাকে বলেন নাই কেন?"

জ্যেষ্ঠা বধূ বলিল, "উহাদিগকে পাঠাইয়া কি করিয়া থাকিব ভাই!"

কনিষ্ঠের বহু অনুরোধ উপরোধে জ্যেষ্ঠ ভাই সম্মত হওয়ায় সেই দিনেই পাল্কী করিয়া কনিষ্ঠা বধূকে পিত্রালয়ে পাঠান হইল। মধ্যম বধূর পিতৃ ও মাতৃকুলে কেহই ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, সুতরাং তিনি অভিমানে একটা আবদার করিতে সাহসী হইতে পারিলেন না। কেহ ছিল না বলিয়া ফেলিয়াছি, একথা শুনিলে মধ্যম বধূ হয়ত আমাদের উপর ঝঙ্কার করিয়া উঠিবে, কাজেই বলিতে হইল, একটি ভাই আছে, তিনি গঞ্জিকার পয়সার জন্য থালা ঘটিটার প্রতি মাঝে মাঝে সুদৃষ্টি দানে পল্লীর গৃহস্থকে আপ্যায়িত করেন।

কনিষ্ঠা বধূর পিত্রালয়ের পরিচয়টা পাঠক শুনিয়া রাখুন। কনিষ্ঠা বধূর পিতা নাই, মা ও দুইটি ভাই আছে। খুড়াই ইহাঁদের অভিভাবক। যখন বলিতে বসিয়াছি, সত্য কথাই বলা ভাল। কনিষ্ঠা বধূর মাতার কলহ-প্রবৃত্তি বড়ই প্রবল। যাহারা পুত্র কন্যা লইয়া ঘর

করে, তাহারা গালাগালির ভয়ে ইহার মাতার ছায়া স্পর্শ করিতে কেহ সহজে স্বীকৃত হয় না। হিংসারূপ কালফণী সর্ব্বদা জাগ্রতভাবে ইহার হৃদয়ে বিরাজ করে। কন্যার স্বামীগৃহে এতগুলি লোক একান্নে আছে ইহা তাহার একবারেই অসহ্য। কন্যার ভাসুর ও দেবরগুলি যদি পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণী হইত, তাহা হইলে বোধ হয় এতদিন ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া দিয়া কন্যাসহ সুখে নিদ্রা যাইতেন। ভাই দুটি বৃক্ষের ডালে ডালে এবং হাডুডু খেলা লইয়াই অধিকাংশ সময় যাপন করে। বাহিরের কলহ গৃহে আনিয়া মাতাকে উপহার দিতেও ইহারা সিদ্ধহস্ত।

চারি ভ্রাতায় পূর্ণ একমাস মনের আনন্দে একত্রে যাপন করিলেন। এবার কার্য্যস্থলে না যাইলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। এতদিন নানা আনন্দে সাংসারিক একটি কথাও হয় নাই। রাত্রি প্রভাত হইলেই ভ্রাতারা স্ব স্ব কার্য্যস্থলে গমন করিবে। দুইদিন পূর্ব্ব হইতেই জ্যেষ্ঠাবধূ বিদায়ের স্নেহাশ্রুবর্ষণ করিতেছে! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও আজ দুইদিন ভাল করিয়া আহার করিতে পরিতেছেন না। বড় বধূ মুখখানি ম্লান করিয়া আপন গৃহে বসিয়া আছে, দেবরেরা একে একে সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভ্রাতাদের পার্শ্বে

আসিয়া বসিলেন। নানারূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

জ্যেষ্ঠা বধূ বলিল, "আমার ভগিনী দুইটির সঙ্গে একবার কথাবার্ত্তা কহিলে না, ইহা কি ভাল হইল?"

দেবরেরা উত্তর করিলেন, "বউদিদি! আমাদের মাথার দিব্য রহিল, উহাদের কথা যদি কখন আর ভুলিয়াও আমাদের কাছে উত্থাপন করেন।"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাংসারিক দুই একটি কথা ও কাশী-যাত্রার কথা ভ্রাতাদিগকে বলিবেন মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, বধূ দুইটির প্রতি আরও কি গুরুতর দণ্ড হইবে, মনে করিয়া কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। প্রভাতে ভ্রাতারা দুর্গানাম জপ করিয়া বিদেশে যাত্রা করিল।

আবার পূজার সময় ভ্রাতারা গৃহে আসিল; পূর্ব্বের ন্যায় সকলের আনন্দ অপেক্ষা খাঁদার আনন্দ অধিক। এইরূপে ৩ বৎসর গত হইয়া গেল। কনিষ্ঠা বধূর পিত্রালয়ে দুর্দ্দশার সীমা নাই! যাহা কিছু ছিল, তিন বৎসরে পিত্রালয়ে নিঃশেষ হইয়া—অলঙ্কারও দুই একখানি বন্ধক পড়িয়াছে! ভ্রাতাদের অনুগ্রহে বাক্স হইতে ২।১ খানি অলঙ্কার অন্তর্হিত হইয়া স্থানীয় সুদি কিম্বা পোদ্দারের দোকানে শোভা পাইতেছে। কনিষ্ঠাবধূর মাতা দেবরের অন্নেই প্রতিপালিত—পুত্র দুটিও রত্নবিশেষ, সুতরাং আজ কাল

কন্যাকে গলগ্রহ বলিয়াই মনে করিতেছে। প্রথমতঃ জননী ভাবিয়াছিল, জামাতা উপায়ক্ষম—কন্যার মাস-হরার বন্দোবস্ত শীঘ্রই হইয়া যাইবে। কন্যা জামাতাকে আজ ৩ বৎসর কত অনুনয় বিনয় করিয়া পত্র লিখিয়াছে—শাশুড়ীও কত বুঝাইয়া গুছাইয়া বারবার লিপি প্রেরণ করিয়াছে—কন্যার সই বকুলফুল কনিষ্ঠাবধূর হইয়া বিচ্ছেদের হা-হুতাশপূর্ণ কত প্রেম-পত্র প্রেরণ করিয়াছে, কোন ঔষধেই পীড়ার প্রতীকার না হওয়ায় সকলেই হার মানিয়া গিয়াছে। কনিষ্ঠা বধূর এখন ক্রন্দনে দিনযাপন হইতেছে। অহরহঃ হৃদয়ে বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা অনুভূত হইতেছে। কনিষ্ঠা বধূর পিত্রালয়ে বাস এখন কারা-যন্ত্রণা অপেক্ষাও অধিক। কনিষ্ঠা বধূ আজ দুই মাস এক বস্ত্রেই কাটাইতেছে। কনিষ্ঠা বধূর মাতা অনেক-বার দেবরকে একখানি বস্ত্রের কথা বলিয়াছে, দেবর মনোযোগ দেন নাই। কনিষ্ঠাবধূ এখন অনুতাপে দগ্ধ হইয়া সর্ব্বক্ষণ ভাবিতেছে, হায়! আমি জ্যেষ্ঠ ঠাকুরের অপমান করিয়াছি—সহোদরা অপেক্ষা পূজনীয়া জ্যেষ্ঠা-দিদিকে কত অকথ্য ভাষায় তীক্ষ্ণশেলে হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছি, সেই পাপের আমার এই প্রায়শ্চিত্ত! একদিন কনিষ্ঠা বধূর কাকী মুখের উপর বলিল,--"তোমার কাকার আয় অধিক নহে, মা! কি করিয়া বার মাস সকলকে

প্রতিপালন করিবে। তোমার স্বামী যখন ত্যাগ করিল,—বারমাস তোমার ভার কে লইবে বল?" কনিষ্ঠা বধূ এই কথা শুনিয়া মরমে মরিয়া গেল!— কিন্তু জঠর যন্ত্রণা বড়ই কষ্টকর। অন্ন দুটি উদরে না পড়িলে ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য হয় না, তাই সে লজ্জা শরম ত্যাগ করিয়া একমুঠা অন্ন উদরে দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। ক্ষুধায় মরিয়া গেলেও দ্বিতীয়বার অন্ন চাহিতে পারিত না—কোন দিন অনশনে, কোন দিন অর্দ্ধাশনে, কনিষ্ঠাবধূ দিন-যাপন করিতে লাগিল!

মধ্যম বধূর দুরবস্থা কনিষ্ঠার ন্যায়ই ঘটিয়াছে! মধ্যম ভ্রাতা কার্য্যস্থলে পৌঁছিয়া মধ্যমবধূর মাসিক ব্যয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দাদাকে ও জ্যেষ্ঠবধূকে মাথার দিব্য দিয়া পত্র লিখিয়াছে, যেন তাহাকে পৃথক ভাবেই রাখা হয়। যদি কখন শুনে যে, মধ্যমবধূকে সংসারে লওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ইহজীবনে দাদাকে বা বৌদিদিকে মুখ দেখাইবে না, চিরদিনের জন্য সংসার হইতে স্বয়ং বিদায় হইবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জানিতেন যে, মধ্যম ভ্রাতার প্রতিজ্ঞা কখন ভঙ্গ হয় না, কাজেই তিনি মধ্যম বধূকে সংসারে লইতে পারেন নাই। তবে দেবরকে গোপন করিয়া জ্যেষ্ঠবধূ যে স্নেহ-যত্ন করিত, তাহা প্রকাশ না করাই ভাল।

ভ্রাতারা এই ঘটনার পর তিন বৎসরে তিনবার বাটিতে আসিয়াছে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠবধূ সহস্র চেষ্টা করিয়াও কনিষ্ঠ ও মধ্যমের মন ফিরাইতে পারেন নাই। মধ্যমবধূর গৃহপানে অন্যমনস্ক হইয়াও মধ্যমভ্রাতা কখন দৃষ্টিপাত করেন নাই। গতবারে তাহারা যখন গৃহে আসিয়াছিল, তখন খ্যাঁদা এক তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দিয়াছিল। জ্যেষ্ঠাবধূ দেবরদিগকে আহার করাইয়া এক ডিবা তাম্বুল লইয়া দেবরদের হস্তে দিতেছে, এমন সময় খ্যাঁদা দৌড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "মা! তুমি কি দুষ্ট; এত বেলা হ'ল, এখনও মেদ কাকাকে ভাত দিয়ে এলে না—মেদ কাকার মুখটি শুকাইয়ে গেছে!"

জ্যেষ্ঠাবধূ দেবরদের কাছে লজ্জায় পড়িয়া গেল। জ্যেষ্ঠবধূর মুখ লাল হইয়া উঠিল—মধ্যম দেবর কি অনর্থ ঘটাইবে ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না—"তোর মেজ কাকী রন্ধন করিয়া নিজের ঘরে খাইতেছে, আমি কেন ভাত দিয়া আসিব?" এই বলিয়া জ্যেষ্ঠাবধূ খ্যাঁদার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতে গেল।

"মা তুমি মিথ্যা কথা বলতে শিখেছ!—মেজ কাকীকে রোজ তুমি ভাত দিয়া আস, আজ কেন দেবে

না ?” এই বলিয়া খ্যাঁদা ডিবা হইতে একেবারে তিনটা পান তুলিয়া মেজ কাকার মুখে গুজিয়া দিল।

মধ্যম দেবর সমস্তই বুঝিতে পারিল—ভাবিল, বৌদিদির স্নেহ-ভালবাসা ও সহানুভূতিতে পত্নীর পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে না। জ্যেষ্ঠাবধূ যদি স্নেহপ্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে পাপিষ্ঠার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত ! দেবরের অনুরোধ সত্ত্বেও কোমলপ্রাণা, উন্নত-হৃদয়া বৌদিদি স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন নাই। ইহাতে মধ্যম দেবর মনে মনে দুঃখিত হইল। বৌদিদিকে কোন কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিয়া বস্ত্র, ছড়ি ও ছাতাটি বগলে লইয়া জ্যেষ্ঠের চরণে প্রণাম করিল। জ্যেষ্ঠ কারণ বুঝিতে না পারায় আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

মধ্যম ভ্রাতা অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিল,—“দাদা, আজ হইতে মনে করিবেন, আপনার মধ্যম ভ্রাতা এ জগতে আর নাই! এ সংসারে আর কখন মধ্যম ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবেন না— বাল্যকাল হইতে এই অধম ভ্রাতার জন্য বহু কষ্ট পাইয়াছেন—আমি জ্ঞানত কোনও অপরাধ শ্রীচরণে করি নাই ; যদি অজ্ঞানে করিয়া থাকি নিজ উদারতা গুণে অধমকে ক্ষমা করিবেন।”

জ্যেষ্ঠাবধূ প্রলয়কাণ্ডের সূচনা বুঝিয়া দৌড়িয়া

আসিল! বহু কষ্টে অনেক বুঝাইয়া মধ্যম দেবরকে সান্ত্বনা করিল! মধ্যম ছাড়িবার পাত্র নহে, নিজ মস্তকে হাত দিয়া জ্যেষ্ঠা বধূকে শপথ করাইল। জ্যেষ্ঠাবধূ বলিল, মধ্যম বধূ দশ দিন অনশনে থাকিলেও আর কখন এমন কাজ করিবে না। মধ্যম বধূ ব্যাপার দেখিয়া মনে করিল, পৃথিবী তোমার গর্ভে তোমার কন্যাকে স্থান দাও, এত কষ্ট—এত অপমান আর সহ্য হয় না। সেই হইতে জ্যেষ্ঠাবধূ মনের কষ্ট মনে চাপিয়া মধ্যম বধূর কোন সংবাদই লইত না। মধ্যম বধূ জীবনধারণের জন্য এক দিন রন্ধন করিয়া তিন দিন পর্য্যুষিত অন্ন আহার করিত। রুক্ষ কেশ—মলিন বস্ত্র, প্রতিবাসী স্ত্রীলোকেরাও মধ্যম বধূর সহিত ভাল করিয়া কথা কহিত না, মনে মনে হাসিত! পূর্ব্বে পাড়ায় যে সব স্ত্রীলোক মধ্যম বধূর কত প্রকারে মনস্তুষ্টি করিবার চেষ্টা করিত, তাহারা এখন এক-বার ফিরিয়াও চাহে না! স্বামী ত্যাগ করিয়াছে, ভাবিয়া পাড়ার সমবয়স্ক বধূরা নাসিকা কুঞ্চিত করিত, দৈবাৎ দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চলিয়া যাইত। হায়! দুর্দ্দশায় পড়িলে সকলেই বিমুখ হয়। মধ্যমবধূ মনে করিত স্বামীর ভালবাসায় যে হতভাগিনী বঞ্চিত হইয়াছে, তাহার এখনও মৃত্যু হয় না কেন?

উভয় বধূরই দুর্দ্দশার সীমা নাই—অমৃতাপানলে

উভয়েই অহরহঃ দগ্ধ হইতেছে! পূর্ব্বের সে শ্রী নাই—সে দম্ভ অহঙ্কার নাই—উভয়ে এখন ভিখারিণীর অধম হইয়া মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া গিয়াছে!

কনিষ্ঠা বধূ পিতৃগৃহে নিজ শোচনীয় দুরবস্থার কথা জানাইয়া দিদি ও জ্যেষ্ঠ ঠাকুরের নিকট একটু আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া বার বার লোক প্রেরণ করিতেছে, মধ্যমা বধূ করুণা ভিক্ষা করিয়া দিদির চরণ ধরিয়া অহোরাত্র ক্রন্দন করিতেছে। অপরাধের তুলনায় গুরুদণ্ড হইয়াছে ভাবিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সর্ব্বদাই দুঃখিতচিত্তে কালযাপন করিতেছেন—ভ্রাতাদের মন কিছুতেই ফিরাইতে পারিতেছেন না।

কনিষ্ঠা বধূ পিতৃগৃহের যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া একবার ভাবিল, বিষভক্ষণে সকল যন্ত্রণার অবসান করি—আবার ভাবিল, বড় দিদি ও বড় ঠাকুরকে পাপ হিংসা-প্রবৃত্তির বশে অনেক অপমান করিয়াছি—দাসীভাবে তাঁহাদের চরণ সেবা করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিলে তবে এই পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয়। আত্মঘাতী হওয়া অপেক্ষা শ্বশুরগৃহে আসাই স্থির করিল।

এদিকে মধ্যমবধূ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া এখন অহঃরহ দিদির পদসেবা করিয়া দিনযাপন করিতেছে। অতি

প্রত্যূষে উঠিয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য শেষ করিয়া রন্ধনের আয়োজন করে—জ্যেষ্ঠ ঠাকুরের প্রভাতে মুখ প্রক্ষালনের জল হইতে গামছা, খড়ম, পরিধেয় বস্ত্র যখন যেটি প্রয়োজন, চক্ষের নিমেষে সাজাইয়া রাখে। জ্যেষ্ঠ-ঠাকুরের আহার হইলে প্রসাদস্বরূপ উচ্ছিষ্ট পাত্রে বসিয়া আহার করে। জ্যেষ্ঠাবধূ কোন কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলে দৌড়িয়া হাত হইতে আরব্ধ কার্য্য কাড়িয়া লয়। খাঁদার এখন মেজ কাকার কাছে শয়ন না করিলে নিদ্রা হয় না।

আশ্বিন মাস, তিন ভ্রাতায় গৃহে আসিয়াছেন; প্রথম দিন আনন্দে অতিবাহিত হইয়া গেল—কাহার কোন কথা বলিবার ছিল না। পরদিন জ্যেষ্ঠাবধূ কনিষ্ঠ ও মধ্যম দেবরকে নিকটে বসাইয়া বলিল—"আমি এখন আর সংসারে কাজকর্ম্ম করিতে পারি না, একটী দাসী রাখিয়াছি।" দেবরেরা বলিল, "বেশ করিয়াছেন বৌদিদি! আপনাকে অনেক দিন হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে, একটি চাকরাণী কিংবা রাঁধুনি রাখুন।"

"মনের মত পাই নাই, তাই এতদিন রাখিতে পারি নাই—এবারে মনের মত একটী দাসী পাইয়াছি।"

মধ্যম দেবর জিজ্ঞাসা করিল,—"বৌদিদি, চাকরাণী-টিকে মাসে কত বেতন দিতে হইবে?"

জ্যেষ্ঠবধূ বলিল—"তোমারা যা দিলে খুসি হও, তাই দিবে,—না দিলেও ক্ষতি নাই।"

"কেন বৌদিদি! স্ত্রীলোকটীর কি কেহ নাই।"

"বালাই, কেন থাকিবে না, সকলই আছে, তবে দুঃখ এই, উহার স্বামী উহাকে ত্যাগ করিয়াছে—তাই আমার কাছে আশ্রয় লইয়াছে।"

"তবে বৌদিদি, তুমি উহাকে একটু ভালবাসিও।"

"আমিত ভালবাসিবই, আর তুমি যখন ঘরে আসিয়াছ, তখন তুমিও একটু ভালবাসো।"

"আচ্ছা বৌদিদি, আমি যাইবার সময় কিছু দিয়া যাইব।"

"যা দিবে তাই এখনই দাও, আবার পাঁচ কথায় ভুলিয়া যাইবে।" এই বলিয়া জ্যেষ্ঠাবধূ তাড়াতাড়ি রন্ধন-গৃহে ঢুকিয়া মধ্যম বধূকে টানিয়া আনিল।

মধ্যম বধূকে টানিয়া আনিয়া দেখিতে দেবর উঠিয়া দাঁড়াইল।

"উঠিলে হইবে না, যাহা দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে, তাহা এখনই দাও! আমার দেবরেরা কখন মিথ্যা কহিতে জানে না, আজ কি তাহার ব্যত্যয় হইবে?"

"বৌদিদি! আমি তোমার সঙ্গে কথায় পারিব না।"

"আমার দেবরেরা মিথ্যা কথা বলে—ইহা আমি প্রমাণ করিতে চাহি না, এখনই কথার যাথার্থ্য পালন হউক।" এই বলিয়া জ্যেষ্ঠাবধূ বামহস্তে মধ্যম বধূকে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে দেবরের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল,— "আমার দাসীটি তোমার কাছে আর কিছুই চায় না— তোমার কাছে কেবল ক্ষমা চায় এবং তোমার চরণে একটু আশ্রয় ভিক্ষা চায়। আমার দেবর তাহার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য—সত্য রক্ষার জন্য—আমার দাসী-টিকে ক্ষমা করিলেই আমি সুখী হইব।"

"আচ্ছা বৌদিদি! তুমি যদি ইহাতে সুখী হও, তবে আমি ক্ষমা করিলাম।" সেজবধূ ঘর হইতে আনন্দে শঙ্খধ্বনি করিল।

ঠিক সেই সময়ে গৃহদ্বারে একখানি পাল্কী আসিয়া উপস্থিত হইল। একটি স্ত্রীলোক পাল্কী হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ পূর্ব্বক অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার বেশ মলিন,—শরীর জীর্ণ শীর্ণ,— দেখিয়া বোধ হয় স্ত্রীলোকটির কয়েক দিন আহার হয় নাই। স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া জ্যেষ্ঠা বধূ দৌড়িয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে গা তুমি?" স্ত্রীলোকটি জ্যেষ্ঠাবধূর পায়ে ধরিয়া বলিল, "বড় দিদি, আমাকে ক্ষমা কর, চরণে স্থান দাও।" বলিয়াই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। "ওগো,

তোমরা শীঘ্র এস, দেখ, ছোট বধূ এসেছে এবং কেন এমন কোচ্চে?" এই বলিয়া জ্যেষ্ঠাবধূ কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সদর বাটিতে জমিদারির টাকা গণিতেছিলেন, চীৎকার শুনিয়া টাকাগুলি ফেলিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। সকলের চেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যেই ছোট বধূর জ্ঞান হইল। জ্যেষ্ঠাবধূ তাহাকে বুকে করিয়া তুলিয়া আনিয়া শয্যার উপর সস্নেহে শয়ন করাইল।

ছোট বধূ একটু চৈতন্য লাভ করিয়া দিদির পা দুখানি ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিল,—"বড় দিদি! না বুঝিয়া অনেক অপরাধ করিয়াছি,—চিরজীবন আপনার পদসেবা করিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

"এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছি যে, আপনার স্নেহ-ভাল-বাসার তুলনা নাই! পিত্রালয়ে আমার আর স্থান নাই। আপনি ক্ষমা না করিলে আমার আর জগতেও বুঝি দাঁড়াইবার স্থান দেখি না।"

জ্যেষ্ঠাবধূ ছোট বধূর বার বার মুখচুম্বন করিয়া বলিল,—"দিদি! তোমরা আমার প্রাণের জিনিষ— তোমাদের কথায় একদিনও আমার রাগ হয় নাই, বালিকা ভগিনী মনে করিয়া সর্ব্বদা ভগবানের কাছে তোমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিতাম। তোমাকে আবার

ক্ষমা করিব কি ভগিনী! ভগবান যে তোমাদিকে সুবুদ্ধি দিয়াছেন, ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।"

খঁ্যাদা তাহার ছোট কাকার হাত ধরিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে ছোট বধূকে দেখাইয়া বলিল, —"দেখ ছোট কাকা, আমার ছোট কাকী ঘরে এসেছে— বাবাকে বলিগে, ছোট কাকীকে ভাল কাপল কিনে দেবে। ছোট কাকী আমাল ছেঁলা কাল কাপল পোলে আছে।" ছোট কাকী অতি কষ্টে উঠিয়া খঁ্যাদাকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

জ্যেষ্ঠাবধূ কনিষ্ঠ দেবরের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "ভাই! আমার অনুরোধ, তুমি ছোট বৌকে ক্ষমা কর, আমার ভগিনীর পাপের অধিক প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।"

দেবর বলিল, "বৌদিদি! তোমার অনুরোধ ঠেলিতে পারিব না—ছোট বধূকে ক্ষমা করিলাম।"

চারি ভ্রাতার সংসার আবার সোণার সংসারে পরিণত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"ঠাকুর ঝি! রাত্রি তৃতীয় প্রহর হইল, এখনও তুমি অতিথিশালা খুলিয়া বসিয়া আছ?"

"দাদারা আসিলেই শয়ন করিব ভাই! চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ভাল লাগে না, তাই কাপড় ও কম্বলগুলি গুছাইয়া রাখিতেছি!"

ঠাকুর-ঝির প্রাণের কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহাদের জন্যই প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, রাত্রে নিদ্রা হইবে কেন? কাপড় কম্বল উপলক্ষ মাত্র!

"তোমার যদি ভাই থাকিত বৌরাণী, তবে ভ্রাতা ভগিনীর ভালবাসা কত মধুর বুঝিতে পারিতে, কথায় কথায় অত ছল ধরিয়া ঠাট্টা করিতে না।"

"আহা, তা বটেই ত ঠাকুর ঝি! প্রাণের ভালবাসা না থাকিলে কেহ কি রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত এরূপ ভাবে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আশাপথ চাহিয়া তাঁহাদের জন্য বসিয়া থাকিতে পারে? ভ্রাতার প্রতি তোমার হৃদয়ের ভালবাসাটা কতদূর গভীর আমি কি আর বুঝিতে পারি না ঠাকুর-ঝি?"

"বৌরাণী! ভ্রাতা ভগিনীর যে কি মধুর সম্বন্ধ, যাহাদের ভ্রাতার ভগিনী হইয়াছে, তাহারাই বুঝিতে পারে? তুমি তামাসা করিলেও কথাগুলি সত্য! ভ্রাতার সুখ দুঃখ ভগিনীর মর্ম্মস্থলে যত শীঘ্র আঘাত করে, এত শীঘ্র বুঝি অন্য কাহারও হৃদয়ে আঘাত করিতে পারে না।"

অনাবৃষ্টিতে সারাবাটী গ্রামে যে বৎসর হাহাকার উঠিয়াছিল, তাহার পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। অনাবৃষ্টির বৎসরে কৃষ্ণমোহন, দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনুর চেষ্টায় কিরূপে সারাবাটীর কৃষকদের জীবনরক্ষা হইয়াছিল, তাহা পাঠক বিশেষ অবগত আছেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে যে কয়েকটী ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

বৈদ্যবাটীতে জহিরউদ্দিন ও তস্য পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে। জহিরউদ্দিনের পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র শরৎকুমারী, কৃষ্ণমোহন, দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনু সকলেই বৈদ্যবাটীতে আকুল হইয়া গমন করিয়াছিলেন।

সপ্তাহকাল ধরিয়া শরৎকুমারী জহিরউদ্দিনের মস্তক নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া একভাবেই বসিয়াছিলেন। জহিরউদ্দিনের পত্নীর পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল, জহিরউদ্দি-নের পীড়ার সময়ে নিকটে কেহ ছিল না। শরৎকুমারী প্রভৃতি পীড়ার সংবাদ পাইয়া বৈদ্যবাটীতে আসিয়া দেখিলেন,

মল মূত্রের উপর শয়ন করিয়া "একটু জল, একটু জল" বলিয়া জহিরউদ্দিন চীৎকার করিতেছে। শরৎকুমারী "জহিরউদ্দিনের অবস্থা দেখিয়া "বাবা, তোমার কি হইয়াছে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। জহিরউদ্দিন শরতকে দেখিয়া আহ্লাদে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল—পারিল না—উঠিতে গিয়া শয্যায় পড়িয়া গেল। শরৎকুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে জহিরউদ্দিনের মস্তক নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া অপরিস্কার বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে লাগিলেন। জহিরউদ্দিন শরৎকুমারীর মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "শরৎ! আয় মা, জন্মের মত তোর মুখটি দেখিয়া লই—তোর মুখ দেখিয়া আমার সকল যন্ত্রণা দূর হইল।"

এইরূপে সপ্তাহকাল শরৎকুমারী জহিরউদ্দিনের মস্তক নিজ ক্রোড়ে লইয়া জননীর ন্যায় মল-মূত্র পরিষ্কার ও সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সপ্তাহের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও শরৎকুমারী জহিরউদ্দিনের শয্যা পরিত্যাগ করেন নাই। কৃষ্ণমোহন প্রাণপণে জহিরউদ্দিনের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন; দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনু সেবা শুশ্রূষা, ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

সাতদিনের পর জহিরউদ্দিনের অবস্থা দেখিয়া সকলেই তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। "বাবা গো,

তুমি যথার্থই পিতার ন্যায় আমার জীবনরক্ষা করিতে গিয়াছিলে, আজ আমি তোমার জীবন রক্ষা করিতে পারিলাম না”—এই বলিয়া শরৎকুমারী আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। জহিরউদ্দিন অতিকষ্টে কৃষ্ণমোহন, দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনুকে ডাকিয়া বলিল,—“তোমরা আমার সম্মুখে দাঁড়াও, তোমাদের ন্যায় ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া মরিতে পারিলে আমার আত্মার মঙ্গল হইবে।” পরে শরৎকুমারীর মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া বলিল,—“মা! তুমি সত্য সত্যই আমার মা!” জহির-উদ্দিনের আর কথা বাহির হইল না, অতি কষ্টে শয্যার পার্শ্বে ভূমির দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, “এই স্থলে তোমার সমস্তই রহিল।” কৃষ্ণমোহন উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম গান করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে শরৎকুমারীর ক্রোড়ে জহিরউদ্দিনের আত্মা নশ্বর-দেহ ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

জহিরউদ্দিনের সমাধিস্থলে শরৎকুমারী ও কৃষ্ণমোহন দীন দুঃখীকে অকাতরে অর্থ বিতরণ করিলেন।

বৈদ্যবাটীর দোকান হইতে দ্বাদশ বৎসরের অধিককাল যে আয় হইয়াছিল,—জহিরউদ্দিন তাহার এক কপর্দ্দক নিজে ব্যয় করে নাই। এতদ্ব্যতীত তাহার গাড়ীর কারবারে আরও যথেষ্ট ছিল। জহিরউদ্দিন তাহার শয্যার

পার্শ্বে মৃত্তিকা-নিম্নে বহু অর্থ লুকাইয়া রাখিয়াছিল। শরৎকুমারীর সহিত পরামর্শ করিয়া কৃষ্ণমোহন বৈদ্যবাটির দোকানের যাবতীয় দ্রব্যাদি ও মাল পত্র এবং জহির-উদ্দিনের গাড়ীখানি বিক্রয় করিলেন; ইহাতেও অর্থের পরিমাণ অল্প হইল না। জহিরউদ্দিনের গরু দুটি বড়ই প্রিয় ছিল, এজন্য গাড়ীর গরু দুটিকে গৃহে আনিয়া বৃদ্ধ পিতা-মাতার ন্যায় কৃষ্ণমোহন সেবা করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারী প্রাতঃকালে গরুদুটিকে স্বহস্তে আহার দিয়া তবে অন্য কার্য্যে হস্তার্পণ করিতেন।

জহিরউদ্দিনের পূর্ব্বেই ক্ষীরদার মৃত্যু হইয়াছিল, ক্ষীরদার কন্যাপুত্রের শেষ কর্ত্তব্য-কার্য্য শরৎকুমারী করিয়া-ছিলেন। ক্ষীরদা মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিল, "মা শরৎ, তুই দেবীরূপে সংসারে আসিয়াছিলি, তোর আশ্রয়ে থাকিয়া আমি যে সুখে মরিতেছি, শত কন্যা পুত্রের জননীরও বুঝি এত সুখে মৃত্যু হয় না।"

ক্ষীরদার মৃত্যুর পর কৃষ্ণমোহনের পরামর্শে শরৎকুমারী স্বামীর ভদ্রাসনবাটী একটী অনাথ দীন ব্রাহ্মণসন্তানকে দান করিয়াছেন; অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই শরৎকুমারী বিক্রয় করিয়া আসিয়াছেন। স্বামীর স্বর্গধামে আত্মার তৃপ্তির জন্য এই অর্থ দীন দুঃখীর সেবায় ব্যয় করিবেন, ইহাই শরৎকুমারীর প্রাণের বাসনা।

একদিন অপরাহ্নে কৃষ্ণমোহনের সম্মুখে বসিয়া শরৎ-কুমারী গীতা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিতেছেন। দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনু একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন—বৌরাণী একটু অন্তরালে বসিয়া স্বামীর মুখারবিন্দু-নিঃসৃত গীতামৃত বিভোর হইয়া পান করিতে-ছেন। সকলেরই হৃদয় আনন্দে ভরা, সকলেই হৃদয় সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ। সকলেই ভগবানের চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া ক্ষণিক সংসার সুখ, ধন অর্থে আসক্তি অসার বলিয়া বোধ করিতেছেন। সকলেই ভাবিতেছেন দীনসেবা মহাপুণ্য,—সংসার-আশ্রম বিলাস-ভোগের জন্য নহে;—সকলেই মনে করিতেছেন, ধর্ম্ম,—কর্ম্ম—সংসারে কেবলই কর্ম্ম করিতে হইবে। স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন কেবল কর্ম্ম কর—ফললাভে দৃষ্টি না করিয়া কেবলই কর্ম্ম করিয়া যাও! তবে আমরা বসিয়া থাকি কেন? রামতনু এই মুহূর্ত্তে একবার ভাবিয়া লইল, পদ্মা বাগ্দিনীর ভাঙ্গা চালাটা ঝড়ে সেদিন উড়িয়া গিয়াছে, দিবাভাগে সময় হইবে না, আজ রাত্রে যাইয়া ঘরটী বাঁধিয়া দিয়া আসিতে হইবে। পরক্ষণে আবার রামতনুর মনে পড়িয়া গেল, পুত্রকন্যাহীনা অশীতিপরা বৃদ্ধ গয়লানী দিদির অসুখ হইয়াছে শুনিয়াছি, বুড়ীকে রাত্রেই একবার দেখিয়া আসিতে হইবে।

কৃষ্ণমোহন বিশুদ্ধস্বরে পাঠ করিতেছেন,—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থাণ্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

দুর্গাপ্রসন্ন চক্ষু মুদ্রিত ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় ভগবানের মুখ-নিঃসৃত শ্লোকের অর্থ তন্ময় হইয়া হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, দুর্গাপ্রসন্নের হৃদয় আনন্দে বিভোর। কৃষ্ণমোহন শরৎকুমারীকে এই কয় বৎসর প্রাণপণ যত্নে শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করাইয়াছেন। শরৎকুমারী এখন গীতা ও অন্যান্য সংস্কৃত শাস্ত্রাদি ও শ্লোকের অর্থ সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারেন। বামতনু কৃষ্ণমোহনের চেষ্টায় শাস্ত্র গ্রন্থাদির তাৎপর্য্য মোটামুটি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। কৃষ্ণমোহনের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী খৌরাণী যে দিন যেটি শুনিতেন কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন; যেটী বুঝিতে না পারিতেন, শরৎকুমারী ও স্বামীর নিকট বুঝাইয়া না লইয়া ছাড়িতেন না। গীতার শ্লোকগুলির অর্থ লইয়া সকলেই ভক্তি-গদগদচিত্তে-পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতেছেন, সকলেরই হৃদয়ের ভাব আজ সংসারের ময়লা-মাটী ত্যাগ করিয়া অনেক উচ্চে গিয়া উঠিয়াছে। সকলেই ভাবিতেছেন, সংসার কি মধুর! সংসারে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কি মধুরতম! সকলেই ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, ভগবান আমাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্তি দিন, সর্ব্বদাই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াই যেন জীবনের বহুমূল্য সময় অতিবাহিত করিয়া অন্তিমে তোমার চরণে মিলিত হইতে পারি! যেন নিজের উপকারের জন্য কখন খাটিতে না হয়, যেন ভগবানের রাজ্যে পরের উপকারের জন্যই জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে পারি। ভগবান! যোগিগণ যোগাশ্রমের, সন্ন্যাসীগণ সন্ন্যাসাশ্রমের, ব্রহ্মচারীগণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যেরূপ আপনার প্রিয়পাত্র হইয়াছেন, আমরাও সংসারাশ্রমের কর্ত্তব্য-পালন করিয়া যেন পরজন্মের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারি।

প্রভো! সকল আশ্রম অপেক্ষা সংসার-আশ্রম অতি কঠিন! আমরা ইহজন্মে যেন কঠিন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি।

রাত্রি চারি দণ্ড অতীত হইয়া গেল, সকলেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ভগবৎ-প্রেমে মুগ্ধ! আরও কয়েক দণ্ড অতীত হইল, শরৎকুমারী প্রেমাশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন,—"দাদা! বলিব বলিব করিয়া আপনাদিগকে একটী কথা বলা হয় নাই; আমার হৃদয়ে একটি প্রবল বাসনার উৎপত্তি হইয়া বড়ই যাতনা প্রদান করিতেছে।"

"কি বাসনা বল না দিদি! যদি সাধ্য হয়, শরৎকুমারীর ভ্রাতারা ভগিনীর বাসনা পূর্ণ করিতে তিলার্দ্ধও বিলম্ব করিবে না।" এই বলিয়া কৃষ্ণমোহন শরৎকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শরৎকুমারী বলিলেন. "দাদা! শরৎকুমারীর ভ্রাতারা অসাধ্য কার্য্যকে ধর্ম্মভাবপরিপূরিত হৃদয়ের বলে অতি ক্ষুদ্র কার্য্যই মনে করিয়া থাকেন, তাই দীনা ভগিনীর সাহস এতদূর অগ্রসর হইয়াছে।"

দুর্গাপ্রসন্ন বলিলেন, "ভগিনী শরৎ! তোর হৃদয়ের কি ইচ্ছা বলিয়া ফেল; যদি অসাধ্য হয়, চিরজীবন চেষ্টা করিয়াও যদি তোর বাসনা পূর্ণ করিতে পারি, তাহাও করিব।"

রামতনু আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছে, শরতের এমন কি ইচ্ছা হইল, যাহা সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া চিরজীবন খাটিয়াও ভগিনীটিকে সুখী করিতে পারিবে না।

শরৎকুমারী দুঃখের সহিত রামতনুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"রামতনু দাদা, তুমি অনাথা ভগিনীটির কথায় কিছুই বলিলে না?"

রামতনু বলিল, "শরৎ! আমি তোর কাতরতাপূর্ণ কোন কথাই শুনিতে চাই না। তোর কি ইচ্ছা, তাই বল্। যদি তোর রামতনু দাদা না পারে, তবে অক্ষম দুর্ব্বল ভাই বলিয়া দুঃখ করিস্! তোর রামতনু দাদার বাহু-দুটি এখনও এত দুর্ব্বল হয় নাই যে, ভগিনীর সুখের জন্য কুঠারহস্তে বন্যজন্তু সমাকীর্ণ পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতে না পারে।"

রামতনুর অত্যধিক স্নেহ-বিজড়িত দৃঢ়তাব্যঞ্জক কথা শুনিয়া শরৎকুমারীর আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। শরৎকুমারী আর্দ্র চক্ষু অঞ্চলে মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—

"দাদা! আমি বহুদিন হইতে বাসনা করিয়াছি, একটি "অনাথ-আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত করিব। সেই আশ্রমে দীন দুঃখী আতুরগণ স্থান পাইবে; নিরাশ্রয়া বিধবাগণ আশ্রয় লাভ করিয়া ভগবানের সেবায় দিনাতিপাত করিবে;

ব্রহ্মচর্য্যহীন অশাস্ত্রীয় শিক্ষার দিনে ব্রহ্মচর্য্য পালন ও আত্মার উন্নতিকর বিদ্যা শিক্ষা করিয়া নিরাশ্রয় হিন্দু-সন্তানগণ দেহ মন ও আত্মার উন্নতি করিবে ;—দূরদেশাগত গৃহত্যাগী অতিথি সন্ন্যাসীগণ এই আশ্রমে আশ্রয়লাভ করিবে ;—প্রভাত সন্ধ্যায় এই আশ্রম ভগবানের নামগান ও বেদগানে মুখরিত হইবে ; পরসেবার কঠিন পরিশ্রমে বঙ্গ-সন্তানের বাহু যাহাতে আমাদের পিতৃ-পিতামহের ন্যায় সবল, সুস্থ ও দৃঢ় হয়, এই আশ্রমে তাহার ব্যবস্থা হইবে ; অন্ধ ও খঞ্জগণ যাহারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা এই শান্তি ছায়ায় বাস করিবে ;—যে সকল রুগ্ন ঔষধ পথ্য ও শুশ্রূষাভাবে কাতর, তাহারা এই আশ্রমে স্থান পাইবে। দাদা! ইহাই আমার বহুদিনের অন্তরের বাসনা।"

শরৎকুমারীর কথাগুলি শুনিয়া কৃষ্ণমোহন গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; এরূপ একটি আশ্রম চিরদিন কিরূপে চলিতে পারে? শরৎকুমারী ও শশীর যে অর্থ তাঁহার হস্তে গচ্ছিত আছে, তাহার সহিত নিজ সঞ্চিত অর্থ ও নিজ সম্পত্তিগুলি দান করিলেও চিরকাল এই আশ্রমের ব্যয় সঙ্কুলান হইতে পারে না। কৃষ্ণমোহন ভবিষ্যৎ চিন্তায় কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া সকল চিন্তাই ভগবানের চরণে অর্পণ করতঃ তাঁহারই উপর মীমাংসার

ভার দিয়া শরৎকুমারীর সৎসঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলেন।

কৃষ্ণমোহন বলিলেন, "শরৎ! তোমার মঙ্গল সঙ্কল্পে মঙ্গলময় ভগবান আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। যখন জগতে তাঁহারই সেবাব্রত গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেছি, তখন তাঁহারই ইচ্ছায় এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে। আমরা ক্ষুদ্র—অতি তুচ্ছ, আমরা এই কার্য্যের কেবল উপলক্ষমাত্র।"

কৃষ্ণমোহনের জননীর হস্তে শশীধোপা যে স্বর্ণ মুদ্রাগুলি রাখিয়া গিয়াছিল, সেই অর্থ কিসে ব্যয় করিলে কর্ত্তব্যচ্যুত হইতে না হয়, এই চিন্তায় সর্ব্বদা কৃষ্ণমোহন বিব্রত থাকিতেন। এই অর্থগুলি কি কার্য্যে ব্যয় হইলে শশী সন্তুষ্ট হইত, কি কার্য্যে ব্যয় করা শশীর অভিলাষ ছিল, কৃষ্ণমোহনের জননীও তাহা জানিতেন না। শরৎকুমারীর অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইলে শশীর অর্থ এই মহৎ কার্য্যে লাগিতে পারে, এই ভাবিয়া কৃষ্ণমোহন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন।

একটা নূতন কার্য্য হাতে আসিল ভাবিয়া দুর্গাপ্রসন্ন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "শরৎ, তোর এই মহৎ অভিলাষ পূর্ণ করিতে যদি চিরজীবন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া খাটিতে হয়, তাহাও আমি করিব, তোর কার্য্যে আমি জীবন পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।"

রামতনু আহ্লাদে কাঁদিয়া ফেলিল। রামতনু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "শরৎ! তোর রামতনু দাদার বাহু এখনও এত হীনবল হয় নাই যে, তোর আশ্রম-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য দুর্ব্বলের ন্যায় অপরের সাহায্য লইব।"

সে রাত্রি সকলেই বিনিদ্র অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন। এই অনাথ আশ্রমের স্থান নির্ব্বাচন, গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনাতেই রজনী প্রভাত হইয়া গেল।

সারাবাটীর পূর্ব্বপ্রান্তে কৃষ্ণমোহনের দশবিঘার অধিক পতিত জমী ছিল। পূর্ব্বে এই ভূমিতে কৃষ্ণমোহনের প্রজারা বাস করিত। ভীষণ ম্যালেরিয়ার বৎসরে প্রজাকুল প্রায় নির্ম্মূল হইয়া যাওয়ায়, এখন পতিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কৃষ্ণমোহন অনাথ-আশ্রমের জন্য এই স্থান নির্ব্বাচন করিলেন। পরদিন হইতেই কৃষ্ণমোহন, দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনু গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। অহোরাত্র গৃহনির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত, এখনও ইহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। শরৎকুমারীর চক্ষে নিদ্রা নাই, তিনি নিজ পুরাতন বস্ত্র ও বৈদ্যবাটীর দোকানের কয়েকখানি জীর্ণ কম্বল সংস্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিতেছেন। শয়নে বাস নাই বলিয়া বৌরাণী শরৎকুমারীকে বিদ্রূপ বাণে বিদ্ধ করিতেছিলেন, পাঠকগণ তাহা পূর্ব্বে শুনিয়াছেন।

দ্রুতভাবে আশ্রম-গৃহাদির নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে—বড় বড় শাল ও সেগুন কাষ্ঠ যাহা আজকাল দশজন বলবান বাঙ্গালী যুবকে তুলিতে সক্ষম হইবে না, রামতনু একা সেই সকল বহন করিয়া আনিতেছে। রামতনুর আহ্লাদের সীমা নাই। কোন্ স্থলে কোন্ খুঁটিটি দিলে দেখিতে ভাল হইবে, কোন্ স্থলে তালবৃক্ষের খুঁটি পুঁতিলে গৃহটি প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝাবাতে রক্ষা পাইবে, বড় বড় বৃক্ষের উপর উঠিয়া বৃক্ষের ডাল কর্ত্তন করিতে করিতে রামতনুর কেবল সেই চিন্তা।

কৃষ্ণমোহন দশ বিঘা ভূমিকে চারি অংশে বিভাগ করিতেছেন। পূর্ব্বদিকে রুগ্নগণের জন্য হাঁসপাতাল গৃহ হইতেছে। ইহা দুই অংশে বিভক্ত; একদিকে স্ত্রীলোক ও অন্য দিক পুরুষের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পশ্চিম দিকে অনাথা বিধবাদের জন্য বাসস্থান নির্ম্মিত হইতেছে। এই স্থলে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং শিবমন্দিরের সম্মুখে একটি নাটমন্দির হইবে। নাটমন্দিরের সম্মুখে পুষ্পোদ্যান শোভা পাইবে। উত্তর দিকে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম নির্ম্মিত হইতেছে। ইহার প্রতি কৃষ্ণমোহনের যত্ন কিছু অধিক। এই স্থলে একটি বৃহৎ পাঠাগার কৃষ্ণমোহন স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিতেছেন। পাঠাগারটি লম্বে একশত হাতের অধিক, প্রস্থে বিংশতি হস্তের ন্যূন হইবে না। পাঠাগারের

পার্শ্বে দেবপূজাও দেবপাঠাদির গৃহ এবং হোমকুণ্ড নির্ম্মিত হইতেছে। তৎপার্শ্বে হবিষ্যান্ন ভোজন ও রন্ধনের স্থান, অপর পার্শ্বে একটি সুন্দর গোশালা। এই গোশালাটি ঠিক পাঠাগারের অনুরূপ। দক্ষিণদিকের একপার্শ্বে অতিথি-শালা, অন্যদিকে অনাথ দীন দরিদ্রের থাকিবার স্থান। দরিদ্র ব্যক্তিদের আবাসগৃহগুলির পশ্চাতে রন্ধন-শালা, পার্শ্বে সারি সারি কয়েকখানি ভাঁড়ার ঘর। এই ভাঁড়ার ঘরগুলির কোন ঘরে আতপ-তণ্ডুল, কোন ঘরে সিদ্ধতণ্ডুল, কোন গৃহ আটা, ঘৃত প্রভৃতি রাখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রন্ধনশালা ও ভাঁড়ার ঘরের পশ্চাতে বড় বড় কতকগুলি ধান্যের গোলা প্রস্তুত হইতেছে। এই গোলাগুলি এত বড় যে দূর হইতে এক একটি বৃহৎ অর্ণবপোত বলিয়া অনুমান হয়। এই অনাথ-আশ্রমের চতুর্দ্দিকে প্রায় বিংশতি হস্ত পরিমাণ ভূমি উদ্যানের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। চারিদিকে নানাবিধ ফল, ফুলের বাগান প্রস্তুত হইবে। আশ্রমের অনতিদূরে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন হইতেছে। পুষ্করিণীর দুইদিকে দুইটি প্রশস্ত ঘাট, একটী স্ত্রীলোক, অন্যটি পুরুষদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। পুষ্করিণীর পাড়ের উপর আম্র, কাঁঠাল, জাম, নারিকেল প্রভৃতি নানাবিধ সুরসাল ফলের

গাছ রোপিত হইতেছে। পুষ্করিণীর দুইটি ঘাটের উপর দুইটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কৃষ্ণমোহন, রামতনু ও দুর্গাপ্রসন্ন প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। প্রত্যেকের সঙ্গেই শতাধিক মজুর ও ঘরামী কার্য্য করিতেছে। আজ কাল রাজমিস্ত্রি, ছুতার, কামার প্রভৃতিকে যেরূপ অত্যধিক পরিমাণে পারিশ্রমিক প্রদান করিতে হয়, তখন সেরূপ ছিল না। তখন সাধারণ মজুরের পারিশ্রমিক এক আনা হইতে দেড় আনা এবং ছুতার, কামার, রাজমিস্ত্রির মজুরি দুই আনা হইতে দশ পয়সার অধিক দিতে হইত না। ইহাতেই তখন তাহারা স্ত্রী পুত্র লইয়া সুস্থ শরীরে সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত! সেকালে একটা মুদ্রা পারিশ্রমিক পাইলে মজুরেরা যে কার্য্য সম্পন্ন করিত, এখন বিংশতি গুণ মুদ্রায় সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায় না। সে কালের সুখ-স্বচ্ছন্দতার কথা কল্পনা করিতে বসিলেও অপার আনন্দে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে! তখন দুই আনার চাউলে ছয়জন সবল ব্যক্তি উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতে পারিত। ঘৃত দুগ্ধ কাহা-কেও পয়সা দিয়া ক্রয় করিতে হইত না—সকল গৃহেই দুগ্ধবতী গাভী থাকায় প্রচুর পরিমাণে ঘৃত দুগ্ধ মিলিত। দুই আনার সরিসার তৈলে একটি গৃহস্থের এক মাস চলিয়া

যাইত—অধিকাংশ গৃহস্থকেই সরিসার তৈল অর্থের বিনিময়ে আনিতে হইত না, সকল গৃহস্থেরই ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে সরিসা উৎপন্ন হইত। হায়! বঙ্গভূমে সে সুখের দিন কি আর আসিবে না? আমাদের পিতৃপিতামহগণ পূর্ব্বে নগ্নপদে,—ছত্রহীন মস্তকে, মোটা বস্ত্র পরিধান করিয়া যে পথে চলিতেন, আমরা সেই সুপথ ত্যাগ করিয়া বিলাস পরিচ্ছদে আপাদমস্তক ঢাকিয়া কুপথে পরিভ্রমণ করিতেছি! বাল্যে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসে হৃদয় মন গঠিত করিয়া যে পিতৃপুরুষগণ সংসারে প্রবেশ করিতেন, বাল্যকাল হইতে বিলাস-বিভ্রমে মাতিয়া, সঙ্কীর্ণ স্বার্থে হৃদয়, মন গঠিত করিয়া, তাঁহাদের বংশধরেরা সংসারে প্রবেশ করিতেছেন। যে পূর্ব্ব পুরুষগণ জীবনধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষায় আবশ্যক দ্রব্য ব্যতীত অন্য জিনিষ স্পর্শ করিয়াও বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন না, তাঁহাদেরই বংশধরগণ বৈদেশিক বিলাসিতার মোহে মুগ্ধ হইয়া নিত্য শত শত অভাবের সৃষ্টি করিতেছেন। তাই বলিতেছি, বঙ্গসন্তানগণ, তোমরা পূর্ব্ব-পুরুষগণের সেই সত্য, ক্ষমা, তেজোময় আদর্শ-মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া বিলাসের মোহিনী মূর্ত্তিধ্যানে মৃত্যুর পথে ছুটিও না।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সেই সময়ে অর্থাৎ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবিতকালে যে গ্রামে

দুই সহস্রাধিক গৃহস্থের বাস ছিল—যে গ্রামে অন্যূন পঞ্চাশ ঘর গৃহস্থ মা আনন্দময়ীকে গৃহে আনিতেন—যে গ্রামে সন্ধ্যার পর শঙ্খ কাংসা ঘণ্টাধ্বনিতে দিগন্ত প্রতি-ধ্বনিত হইত—সেই সমস্ত গ্রাম এখন বন-জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে! গ্রামে শতাধিক ঘর কামারের বাস ছিল, সন্ধ্যার পর হাতুড়ির শব্দে কর্ণে তালা লাগিত—সেই গ্রামে গিয়া দেখুন, তাহাদের বংশধরেরা কেহ অফিসে পঞ্চদশ মুদ্রার কেরাণী, কেহ বা রেলওয়ে কোম্পানির টিকিট-বিক্রেতা। হাতুড়ি পিটিয়া যাহাদের পিতৃপিতামহগণ গোলাভরা ধান রাখিয়া প্রতি বৎসর দোল দুর্গোৎসব করিতেন, তাহাদেরই সন্তান আজ উদরান্নের জন্য পরের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতেছে। যে গ্রামে শতাধিক ঘর কুম্ভকারের বাস ছিল,—স্তূপাকার হাঁড়ি, সরা কলসী ভাঁড় হাটে বাজারে বিক্রয় করিয়া যাহারা দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী পূজা, ব্রাহ্মণভোজন ও বৎসরে দুইবার পাঠ দিতেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ আজ 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' রবে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তখন প্রত্যেক গৃহস্থের প্রাঙ্গনে ধান্যের গোলা ছিল—প্রত্যেক পল্লীগ্রামেই চতুষ্পাঠী শোভা পাইত, এখন সেইস্থানে মধ্য-ইংরাজী ও উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় শোভা পাইতেছে। তখন স্কুল ছিল না, লাইব্রেরী ছিল না—বিলাসী শিক্ষিত

বাবু অতি বিরল ছিল। এখন গ্রামে চতুষ্পাঠী নাই—ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম শিক্ষার উপায় নাই; এখন একাদশী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যার খোঁজ কেহই আর রাখে না।

যদি পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় আয়ুঃ, বল, মেধা, ও সুখ স্বচ্ছন্দতা চাও, তবে প্রতীচ্য বিলাসিতা গৃহ হইতে দূর কর, সংসারকে প্রাচ্য ভাবে—প্রাচ্য মতে আবার গঠন কর—তোমার গৃহ ধনধান্যে পূর্ণ হইবে—দেবদুর্লভ দুগ্ধ, ক্ষীর ছানা গৃহে গৃহে দেখিতে পাইবে—'হা অন্ন' 'হা অন্ন' রব ঘুচিয়া যাইবে—টাকায় অর্দ্ধমণ চাউল—পাঁচ সের সরিসার তৈল আবার এই সোণার বাঙ্গালায় সহজলব্ধ হইয়া উঠিবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণমোহন, দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনুর তিন বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে অনাথ-আশ্রমের গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। অনাথ-আশ্রমের সুন্দর দৃশ্য! শুভ্র শিবমন্দিরগুলি দূর হইতে হিমালয়ের চূড়ার ন্যায় শোভা পাইতেছে! হ্রদের ন্যায় বৃহৎ সরোবরে কাকচক্ষুর ন্যায় জল জলে রাজহংস ও জলচর পক্ষীগুলি ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানাবলীতে বসিয়া ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছেন,—পুষ্করিণী-সংলগ্ন বাগানে দেবপূজার জন্য ব্রাহ্মণগণ পুষ্পচয়নে ব্যাপৃত আছেন। আশ্রমের অন্য-দিকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদগান করিতেছেন। একদিকে সন্ন্যাসী ও দণ্ডীগণ ধ্যানমগ্নচিত্তে বিশ্বপিতার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অপার আনন্দে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। আশ্রমের পশ্চিমদিকে যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা বিধবাগণ শুভ্রবসনে দেহাবৃত করিয়া কেহ, শিব-পূজার জন্য বিল্বপত্র সংগ্রহ করিতেছে—কেহ মন্দির-প্রাঙ্গন পরিষ্কার করিতেছেন—কেহ দেবাদিদেবের পূজার

জন্য ধূপধূনা চন্দনাদি আয়োজনে ব্যস্ত আছেন। ব্রাহ্মণ বিধবারা অনাথদের জন্য রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। অপর বিধবারা গাভীগুলির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া গোসেবায় অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় করিতেছেন। বিধবাগণ নিষ্কলঙ্ক ঋষিকন্যার ন্যায় আশ্রমের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। পূর্ব্বদিগের হাঁসপাতালের দরিদ্র রোগিগণ শরৎকুমারীর যত্নে রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া আশ্রমের মঙ্গলগীতি গাহিতেছে। আশ্রমের উত্তরদিকে যুবক ও বালকগণ তপ্তকাঞ্চনদেহে গুরুর সম্মুখে বসিয়া ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিতেছে। উত্তর দিকের এই ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম যথার্থই ঋষি-আশ্রমের ন্যায় শোভা পাইতেছে। যুবতী ও বালক বালিকাগণ কটিদেশে ক্ষুদ্র গৈরিকবসন বেষ্টন করিয়া সামগীতি গাহিতে গাহিতে গুরুর পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতেছে। এদৃশ্য বড়ই সুন্দর! বড়ই মধুর! এই ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ বালক ও যুবকগণের সরল ও পবিত্র মুখচ্ছবি দেখিলে সত্য ত্রেতার আর্য্যসন্তানগণের স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক হইয়া উঠে!

আজ আশ্রম-প্রতিষ্ঠার দিন। শরৎকুমারীর তিনমাস আহার নিদ্রা নাই বলিলেই হয়, কেবল বৌরাণী জোর করিয়া একবার হবিষ্যান্নের সম্মুখে বসাইয়া দেন মাত্র। কৃষ্ণমোহন, দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনু আজ তিন মাস

দেহপাত করিয়া যে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আজ সেই আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন। রামতনু ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। রামতনু আজ একা সহস্র রামতনুর বল ধারণ করিয়াছে। ভারে ভারে ঘৃত, দুগ্ধ, সর, ছানা আসিতেছে। দুর্গাপ্রসন্ন তাহাদিগকে শ্রেণীবিভাগ করিয়া সাজাইয়া ঘর পূর্ণ করিতেছে। কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্নের প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলে তাঁহাদের পদরেণু অঙ্গে মাখিয়া চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। রাজসূয়যজ্ঞে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় কষায় বস্ত্রে আজ কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্ন শোভিত হইয়াছেন। সুপ্রশস্ত বক্ষঃস্থল স্রক চন্দনে শোভিত—ললাটে চন্দনের দীর্ঘ ফোঁটা—ধর্ম্মোন্নত হৃদয়ের পবিত্রছায়া মুখে প্রকাশিত। মৃদু মৃদু হাস্যে আশ্রম উদ্ভাসিত। আশ্রমের চারিদিকে সরল স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি। বলিষ্ঠ ও সুস্তবাহু দীনদুঃখী ও পরোপকারের জন্য আশ্রমের চতুর্দ্দিকে প্রসারিত। এক একবার ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া অনুচ্চস্বরে মুখে দয়াময়ের গুণগাথা উচ্চারিত হইতেছে। দেখিয়া লও আর্য্যসন্তানগণ, একবার প্রাণ ভরিয়া কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্নের সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া লও। যদি এই আনন্দ উপলব্ধি করিবার মত হৃদয় থাকে, তবে হৃদয়ঙ্গম কর, আজ কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্ন কি অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আর শরৎ-

কুমারী! শরৎকুমারীর বক্ষঃস্থল আনন্দধারায় প্লাবিত—শরৎকুমারী আজ জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে দিগঙ্গনারূপে আশ্রমস্থল উদ্ভাসিত করিয়া ঘুরিতেছেন। যেদিকে চাহিবেন, সেইদিকেই শরৎকুমারী! শরৎকুমারী কখন অন্ধদের গৃহে গিয়া পুত্র-কন্যার ন্যায় আদর করিয়া বসাইতেছেন,—কখন বিধবাদের কাছে গিয়া স্নেহভরা মধুর বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন—কখন অন্না-ভাবে কঙ্কালসার রমণীর ক্রোড় হইতে ক্রন্দনরত শিশু-সন্তানকে নিজ বক্ষে তুলিয়া উদর পূর্ণ করিয়া দুগ্ধপান করাইতেছেন! আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে রন্ধনশালায় গিয়া রন্ধনকার্য্যে পাচকদিগের সাহায্য করিতেছেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা ছয়মাস পূর্ব্ব হইতে লোকমুখে চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। আজ দুই দিন ধরিয়া চারিদিক হইতে বুভুক্ষু নরনারী আহার পাইবার আশায় ছুটিয়া আসিতেছে। দীন, দুঃখী আতুর, কাঙ্গাল দূর দূরান্তর হইতে আসিতেছে। শরৎকুমারী ও রামতনু সকলকে আদর করিয়া বসাইতেছেন। কাহারও সন্তানের জন্য দুগ্ধ,—কাহারও পিপাসার শীতল পানীয়,—কোন রমণীর ছিন্নবস্ত্রে লজ্জা নিবারণ হইতেছে না, তাহাকে নূতন বস্ত্র প্রদান, কাহারও অল্পবয়স্ক শিশু জঠর-জ্বালায় চীৎকার করিতেছে, তাহাকে আহার দানে সান্ত্বনা প্রভৃতি

কার্য্যে সাহায্যার্থ রামতনু আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

আশ্রমের রন্ধনশালায় আজ অভাবনীয় দৃশ্য! আশ্রমস্থলে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ নরনারীর আহারের আয়োজন হইয়াছে। দেশ বিদেশ হইতে অন্ধ খঞ্জ ও কাঙ্গালীগণ দলে দলে আসিয়া জুটিতেছে। অন্ন-ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন, দধি, ক্ষীর, ছানা, পায়েস, পিষ্টক প্রভৃতি উপাদেয় আহারীয় সামগ্রী কাঙ্গালীদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তিন শতাধিক পাচক ব্রাহ্মণ আজ কয়েকদিন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছে।

বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় আশ্রম-প্রতিষ্ঠার কার্য্য শেষ হইয়া গেল। কাশী, দ্রাবীড়, নদীয়া, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নানাদেশ হইতে শতাধিক অধ্যাপক ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আসিয়া এই মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন করাইলেন। শরৎ-কুমারী দীন, দুঃখী, আতুর, খঞ্জ, ও অনাথা বিধবাদের নামে এই আশ্রম ও আশ্রম-সংলগ্ন পুষ্করিণী উদ্যান ও ভূমি-খণ্ড দান করিলেন। আশ্রমের নামকরণের সময় একটু গোলযোগ হইল। শরৎকুমারী ও শশীর অর্থে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া "শরৎ-শশী আশ্রম" নাম দিতে কৃষ্ণমোহন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, শরৎ-কুমারীর এই নাম মনঃপূত হইল না। অগত্যা

শরৎকুমারীর ইচ্ছাক্রমে এই আশ্রমের নাম "দেবতার আশ্রম" রাখা হইল।

অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ, অতিথি, অভ্যাগতদের ভোজনাদি সম্পন্ন হইবার পর কাঙ্গালী-ভোজন আরম্ভ হইল। সকলে "শরৎকুমারীর জয়! কৃষ্ণমোহনের জয়" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তিনদিন ধরিয়া কাঙ্গালীদের আহার পাথেয় ও বস্ত্রাদি বিতরিত হইল। মুণ্ডিতকেশা শরৎকুমারী—গৈরিক-বসন-পরিহিতা শরৎকুমারী—দীন দুঃখীর জননী-স্বরূপা শরৎকুমারী—স্বামীপদধ্যানরতা শরৎকুমারী এই তিন দিন উপাদেয় মিষ্টান্নাদি, বস্ত্র, কম্বল, ও অর্থ কাঙ্গালীদিগকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। কাঙ্গালীদের আনন্দধ্বনিতে আশ্রমস্থল মুখরিত হইতে লাগিল। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অবসাদ নাই, ক্লান্তি নাই; কঠোর পরিশ্রমে শরৎকুমারীর হৃদয় এক অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিতেছে। মূর্ত্তিমতী করুণারূপিণী দেবী কখনও কমলা, কখনও অন্নপূর্ণা, আবার কখন বা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিতে সকলের অভাব অভিযোগ মোচন করিতেছেন। যাহার হৃদয় নাই, যে ত্যাগ করিতে জানে না সে ইহা বুঝিবে না সে চক্ষুষ্মান হইলেও ইহা দেখিতে পাইবে না। জগতের এই নিয়ম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ছয়মাস হইল আশ্রম প্রতিষ্ঠার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। "দেবতার আশ্রমে" এখন শতাধিক অন্ধ ও খঞ্জ প্রায় পঞ্চাশ জন বিধবা, দুই শতাধিক নিরাশ্রয় দরিদ্র ব্যক্তি এবং তিনশত জন অনাথ রুগ্ন ব্যক্তি আশ্রয় পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত বহু দেশ-দেশান্তর হইতে অতিথি, সন্ন্যাসী ও দণ্ডীগণ দুই চারি দিনের জন্য আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, আবার দেশ দেশান্তরে চলিয়া যান। দুর্গাপ্রসন্নের তত্ত্বাবধানে প্রায় দুই শতাধিক বালক ও যুবক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। শরৎকুমারীর এখন অহোরাত্র দেবতার আশ্রমেই দীন দুঃখী অন্ধ খঞ্জদের সেবাকার্য্য লইয়া থাকেন, কেবল এক একবার গৃহে যাইয়া বৌরাণীকে দেখিয়া আসেন মাত্র। রামতনু এখন দিনান্তে একবার মাত্র শরৎকুমারীর সহিত হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে এবং আতুর অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ন ব্যক্তিদের সেবা করে। কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্ন প্রত্যহ নবাগত সন্ন্যাসীদের চরণতলে বসিয়া ভগবানের নাম ও ধর্ম্ম-কথা শুনিয়া দিনযাপন করেন।

একদিন অতি প্রত্যুষে কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্ন দুই শতাধিক বালক ও যুবকের সহিত স্নান করিয়া বিভুনাম গান করিতে করিতে আশ্রমের দিকে আসিতেছেন, শরৎকুমারী দুইটি পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশুকে বক্ষঃস্থলে তুলিয়া আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, রামতনু একটি অশীতিপর অন্ধ বৃদ্ধাকে স্কন্ধে তুলিয়া অন্ধদের নির্দ্দিষ্ট গৃহে সযত্নে লইয়া যাইতেছে, এমন সময় এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর জটাজুটধারী সন্ন্যাসী "দেবতার আশ্রমে" উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর সুদীর্ঘ জটারাশি পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া ভূমি স্পর্শ করিতেছে। শ্মশ্রুদেশ জটাজালে মণ্ডিত, সুদীর্ঘ দেহ কৃশ অথচ প্রভূতবলসম্পন্ন, বয়স শতবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মুখমণ্ডল অপরূপ জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত, ক্ষুদ্র কৌপিনমাত্র পরিধান, হস্তে একটী সুদীর্ঘ চিমটা ব্যতীত আর কিছুই নাই। দেবতার আশ্রম বহু সন্ন্যাসীর পদরেণুতে নিত্য পবিত্র হইতেছে, কিন্তু এরূপ তেজোব্যঞ্জক মুখমণ্ডল—এরূপ প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি—এরূপ সরল করুণাপূর্ণ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি কোন সন্ন্যাসীতেই দৃষ্টিগোচর হয় না। সন্ন্যাসীর দিকে অধিকক্ষণ দৃষ্টি সন্নিবেশ করা কঠিন—নয়ন ঝলসিয়া যায়,—মন স্বর্গীয় ভাবে বিভোর হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে। সন্ন্যাসীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ

করিলে দৈববলসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দেখিলেই মনে হয়, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সন্ন্যাসীর নয়নাগ্রে বিরাজমান। শরৎকুমারী নির্নিমেষ নয়নে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছেন, কে এই সন্ন্যাসী? কৃষ্ণমোহন ভগবদ্‌প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যোগবলের আশ্চর্য্য শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভাবিতেছেন, কে এই সন্ন্যাসী? দুর্গাপ্রসন্ন সন্ন্যাসীকে আশ্চর্য্য শক্তি-সম্পন্ন দেখিয়া মানব-জীবন ও মানব শক্তি হেলায় হারাইতেছি, ভাবিয়া মনে মনে বলিতেছেন, তেজঃপুঞ্জ দেহ, প্রশস্ত ললাট, আজানুলম্বিত বাহু, ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা কে এই সন্ন্যাসী? রামতনু সন্ন্যাসীর সৌম্যমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া একটু চরণরেণু মস্তকে দিবার জন্য যতই হস্ত প্রসারণ করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে, পা উঠিতেছে না, সন্ন্যাসীর অদ্ভুত তেজোময় মূর্ত্তিতে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছে, ভগবানের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ দেবতার আশ্রমে আজ দয়া করিয়া আসিয়াছেন কে এই সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসী কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে আশ্রমের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া আসিলেন, একটু কীটাণু বা একটি ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডও মহাবল-সম্পন্ন সন্ন্যাসীর সুতীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। যে স্থলে নিরাশ্রয় কঙ্কালসার নরনারী অন্নাভাবে কাতর হইয়া "দেবতার আশ্রমে" আশ্রয় লইয়াছে, সন্ন্যাসী সেই স্থলে

একবার আকাশ পানে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী আবার—"দেবতার আশ্রমের" চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া গাহিতে লাগিলেন ;—

আমি তোর ঐ চরণ ভিখারী মা।
ঐ রাঙ্গা চরণ ক'রে কত যতন,
যারে হৃদে ধরেছেন ভোলা॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর,
করে ধ্যান কত যুগ যুগান্তর,
যার পায় না মা সীমা।
আমি তোর ঐ চরণ ভিখারী মা।
কত চন্দ্র কত সূর্য্য গ্রহ তারা,
দিবানিশি ভ্রমে হয়ে আত্মহারা,
তবু পায় না মা বিমল পদছায়া,
আমি তোর ঐ চরণ ভিখারী মা।
আমি না জানি পূজন
না জানি ভজন,
শক্তি হারা মা গো সব অচেতন,
দেমা মোক্ষ পদ ঘুচাও মম বেদন,
দীন সন্তানেরে ক'রো না বঞ্চনা।
জানি মা সকলি তোমারি ছলনা,

আশ্রমের অন্যদিকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদগান করিতেছেন।

নিদয়া হোলেও ডাকতে ছাড়বো না,
আমি তোর ঐ চরণ ভিখারী শ্যামা।

দেবতার আশ্রম সঙ্গীতের গম্ভীরস্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল! সন্ন্যাসী গাহিতে গাহিতে আত্মহারা হইলেন—চক্ষু দিয়া অনবরতঃ অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। পরক্ষণে সন্ন্যাসীর অট্টহাস্য রবে আবার দেবতার আশ্রম প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণমোহন, দুর্গাপ্রসন্ন, শরৎ-কুমারী ও রামতনু এতক্ষণ নির্ব্বাক নির্নিমেষ নয়নে সন্ন্যাসীর পানে চাহিয়া দেবকণ্ঠনিঃসৃত তান, লয়, মান সংযুক্ত সঙ্গীতসুধা তন্ময় হইয়া পান করিতেছিলেন। সঙ্গীত শেষ হইলে একে একে আসিয়া সকলে সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী নির্ব্বাক হইয়া সকলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত এই ভাবেই অতীত হইলে সন্ন্যাসী মধুর ভাষায় প্রগাঢ় স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন,—

"বাবা কৃষ্ণমোহন,—দুর্গাপ্রসন্ন—রামতনু! তোমা-দের পবিত্র মুখচ্ছবি দেখিয়া আজ প্রাণে বড়ই আনন্দ পাইলাম। মা শরৎ! তোমার দয়া স্নেহ সরলতামাখা মুখখানি দেখিয়া মা অন্নপূর্ণাকে স্মরণ করিয়া বার বার মনে মনে নমস্কার করিয়াছি! মা! তোরা বঙ্গভূমে

যে আদর্শ দেখাইয়া যাইতেছিস, যদি কখন বঙ্গভূমে এই আদর্শে গৃহে গৃহে এই প্রকার আশ্রম স্থাপিত হয়, তাহা হইলে বঙ্গভূমি স্বর্গভূমি হইয়া উঠিবে। বাবা কৃষ্ণমোহন! আমি একদিন হিমালয়ের নিভৃত গুহায় বসিয়া ভগবান গুরুদেবের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম. বঙ্গভূমে তাহারই আজ সূচনা দেখিতে পাইতেছি।"

কৃষ্ণমোহন করযোড়ে ভক্তিনম্রচিত্তে বলিলেন,—"সন্ন্যাসীপ্রবর! দেখিতেছি, আপনি ভবিষ্যৎতত্ত্বজ্ঞ! -ত্রিকালজ্ঞ গুরুর উপযুক্ত শিষ্য! সংসারাবদ্ধ ত্রিতাপ তাপিতকে দুই একটি প্রশ্ন করিবার অনুমতি প্রদানের করুণা হইতে বঞ্চিত রাখিবেন না!"

সন্ন্যাসী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণমোহন! তোমাদের মুখ দেখিয়া আজ আমার আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে। তোমরা আমার বড়ই স্নেহের পাত্র। যাহা কিছু বলিবার ইচ্ছা হয়, স্বচ্ছন্দে বল। গুরুদেবের কৃপায় যাহা জানি, তাহার অধিক কিছু বলিবার সাধ্য নাই।"

কৃষ্ণমোহন ব্যথিত অন্তরে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেবের মুখে কি শুনিয়াছেন দেব?"

সন্ন্যাসী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"কৃষ্ণমোহন! সেই দেবের মুখে শুনিয়াছি, অদ্য হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই বঙ্গসন্তানগণের আচার ব্যবহার,

ধর্ম্মনিষ্ঠার ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিবে—আপাতমধুর ভিন্ন দেশ-জাত আচার, ব্যবহার, জ্ঞান, ও ধর্ম্মে লোক আগ্রহ প্রকাশ করিবে। তোমাদের ভাবী বংশধরগণ পঞ্চাশ বৎসরের পর নিত্য অভাবের এতই সৃজন করিবে যে, সেই সমস্ত দ্রব্যের অভাবে তাহারা এক পদও অগ্রসর হইতে পারিবে না! কাজেই অত্যধিক ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। বঙ্গভূমে অন্নাভাবের হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইবে।"

কৃষ্ণমোহন মর্ম্মাহত হৃদয়ে সন্ন্যাসীকে কহিলেন,—

"মহাত্মন! বঙ্গভূমির যে ভবিষ্যৎ চিত্র দেখাইলেন, ইহা ঘোর অন্ধকারময়! তবে কি ভাবী বংশধরগণের আর উদ্ধারের উপায় নাই।"

সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া কৃষ্ণমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

"বাবা কৃষ্ণমোহন! বঙ্গজননীর সন্তানগণের অদৃষ্টে ইহার পর কি আছে, আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টি ততদূর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। নিবিড় অন্ধকারের পশ্চাতে—সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে একটী ক্ষীণ আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইতেছি মাত্র। এই গাঢ়তম নিবিড় অন্ধকাররশ্মি ভেদ করিয়া ঐ আলোকরশ্মি অগ্রসর হইতে পারিবে কি না, ইহা আমি ধারণাই করিতে পারিতেছি না।"

কৃষ্ণমোহন আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "সন্ন্যাসীপ্রবর! তবে কি আর্য্যসন্তানগণ অবনতির পথে ভাসিতে ভাসিতে ধ্বংসমুখেই পতিত হইবে?"

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, "বাবা কৃষ্ণমোহন! সুপ্রশস্ত শুভ্র শ্বেতপ্রস্তরে একটি ক্ষুদ্র কালিমা রেখা টানিলে যেমন সহজেই সেটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—চির ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি একটি পাপকার্য্য করিলে সহজেই যেমন সকলের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে—ধর্ম্মের সংসারে পাপ প্রবেশ করিলে সঙ্গে সঙ্গেই যেমন পাপ কার্য্যের ফলভোগ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ভারত-ভূমে আর্য্যসন্তানগণেরও সেই দশা উপস্থিত হইবে। ইহারা চির-পুণ্যাত্মা আর্য্য ঋষিগণের সন্তান হইয়া তাঁহাদেরই আচার ব্যবহারে উপেক্ষা করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিবে, সেই পাপের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়িবে।—ব্রহ্মচর্য্য, সংযম ও ধর্ম্মশিক্ষার পরি-বর্ত্তে অর্থকরী বিদ্যা আসিয়া আর্য্যভূমিকে প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। ইহারা জগতে অর্থকেই সারবস্তু মনে করিবে—কিন্তু কৃষ্ণমোহন, নিশ্চয় জানিও, যেদিন আর্য্যসন্তানগণ অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার পরিবর্ত্তে সন্তানগণকে সর্ব্বাগ্রে মন ও আত্মার উন্নতির জন্য আর্য্যঋষিগণের নীতি অনু-মোদিত ব্রহ্মচর্য্য, সংযম ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার প্রয়াস

পাইবে, সেই দিনে আর্য্য-সন্তানগণের দুঃখ, দরিদ্রতা, অবসাদ, অশান্তি দূরে যাইয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত সংসারাশ্রমে প্রাণারাম, পবিত্র শীতল স্নিগ্ধ বায়ু মৃদু-মন্দ প্রবাহিত হইবে।'' ' এই বলিয়া সন্ন্যাসী নীরব হইলেন।

কৃষ্ণমোহন বলিলেন, ''সন্ন্যাসীপ্রবর! আপনার বচন-সুধাপানে হৃদয় পুলকিত হইতেছে। বহুপুণ্যফলে এই দেবতার আশ্রমে আপনার চরণ দর্শন ঘটিয়াছে।''

সন্ন্যাসী বলিলেন,—''বাবা কৃষ্ণমোহন! তোমার হৃদয় আমা অপেক্ষাও উন্নত। তুমি সংসারে থাকিলেও তোমার আসন আমা অপেক্ষা অনেক উচ্চে! তুমি একজন আসক্তিহীন কর্ম্মযোগী! সংসারে থাকিয়া যে মহান কর্ত্তব্যপথে তুমি বিচরণ করিতেছ, আর্য্য-সন্তানগণ যদি কখন এই পথে পদার্পণ করে, তবে তাহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের ফল লাভ করিবে। তুমি সংসারে থাকিয়া ভগবানের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতেছ, আমি হিমালয়ের নিভৃত গুহায় গুরুদেবের চরণতলে বসিয়া ভগবানের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। কৃষ্ণমোহন, তুমি আমা অপেক্ষা মহান্। আমার হৃদয় ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র, তাই সংসারের শোক-তাপ হৃদয়ে সহ্য করিতে না পারিয়া, ভীরুর ন্যায় পর্ব্বতগুহা আশ্রয় করিয়াছি; তুমি বীরের ন্যায় সুখ-দুঃখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া

ভগবানের রাজ্যে তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সাধন করিয়া করুণাময়ের করুণা-কণার অধিকারী হইয়াছ। আমার দ্বারা সংসারের বুঝি কোন কার্য্যই সাধন হইতেছে না, কেবল দয়াময়ের দয়ার ভিখারী হইয়া তাঁহার চরণতলে পড়িয়া আছি। তুমি সংসারের কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়া দয়াময়ের নিকট তোমার প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতেছ। তোমাকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারি, এমন শক্তি আমার নাই। বাবা! তুমি মহৎ পিতার মহৎ সন্তান—" সন্ন্যাসী আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, থামিয়া গেলেন।

কৃষ্ণমোহন সন্ন্যাসীকে ভক্তিনম্রস্বরে বলিলেন,— "দেব! মদীয় পিতৃদেব কি আপনার বিশেষ পরিচিত ছিলেন?"

সন্ন্যাসী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার অট্টহাস্যে দেবতার আশ্রম প্রকম্পিত হইতে লাগিল—কৃষ্ণমোহন সন্ন্যাসীর এই মনোমোহন, আনন্দ বিগলিত সাত্ত্বিক মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তিভরে মনে মনে বার বার নমস্কার করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী আবার গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বাবা কৃষ্ণমোহন! তোমার পিতা আমার পথ-

প্রদর্শক গুরু! সংসারের মিথ্যা বস্তুকে সত্য মনে করিয়া ক্ষণস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর বস্তুকে চিরস্থায়ী আপনার ভাবিয়া যখন সংসার-মোহে ডুবিয়াছিলাম তখন তোমার পিতার জ্ঞান-উপদেশেই আমার হৃদয়ের মলিনতা অল্পে অল্পে দূর হইয়াছিল। ত্রিতাপে তাপিত হইয়া যখন আমার সেই প্রথম গুরুর চরণতলে মর্ম্ম-বেদনা জানাইতাম, তখন তিনি সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া হৃদয়ের মলিনতা দূর করিয়া দিতেন. সুখ দুঃখ দুটিই যে মিথ্যা পদার্থ, ইহা তিনিই আমাকে বুঝাইয়া দিতেন। ভগবানের করুণাকণা প্রাপ্তির আশায় আজ যে আমি হিমালয়ের বনভূমিতে ভ্রমণ করিতেছি, সে কেবল তাঁহারই করুণাগুণে। তিনি মরুময় হৃদয়ক্ষেত্রে জ্ঞান-ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাই আজ আমি ত্রিকালজ্ঞ গুরুদেবের চরণে স্থান পাইয়াছি। সংসার আসক্তির তীব্র বন্ধনযন্ত্রণা তাঁহারই করুণায় নিবৃত্তি হইয়াছে। সংসারের হর্ষ-বিষাদ অবশ্যম্ভাবী, শোক তাপ সংসার-ক্রীড়াগারের ক্রীড়া। বাবা কৃষ্ণমোহন! তুমি যে তোমার পিতৃপুরুষের সঞ্চিত অর্থ দেবতার আশ্রমে ব্যয় করিতেছ, ইহাতে আর তোমাকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব? আমি এখন হিমালয়শৃঙ্গে গুরুর সমীপে বসিয়া ইহাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিব, যেন কৃষ্ণমোহন, দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনুর ন্যায় সন্তান বঙ্গের গৃহে গৃহে

জন্মগ্রহণ করে, শরৎকুমারীর ন্যায় বঙ্গললনা যেন ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জননীর আসন গৃহে গৃহে অধিকার করে। বঙ্গের অন্নাভাবে রোগ দৈন্যে অপনোদন যদি কখন সম্ভব হয়, তবে শরৎকুমারীর ন্যায় শক্তিসম্পন্না জননীর ক্রোড়ে তোমাদের ন্যায় কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন তনয় শোভা পাইবে। বাবা কৃষ্ণমোহন! "দেবতার আশ্রমে" অধিক সময় নষ্ট করিবার আমার অধিকার নাই। অল্প সময়ের জন্য এখানে বাস করিবার গুরুদেবের আদেশ আছে, আমি চলিলাম।"

চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে সন্ন্যাসী পূর্ব্বদিকের পথ ধরিয়া চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসীকে আর কেহই দেখিতে পাইলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

——ঃ০ঃ——

'দেবতার আশ্রমের" নাম এখন চারিদিকে। রাজার প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে পর্য্যন্ত ভক্তিভরে "দেবতার আশ্রমের" নাম উচ্চারিত হইতেছে। যে স্থানে চারিজন লোক একত্রিত হইয়াছে, সেই স্থলেই "দেবতার আশ্রমের" কথা আলোচিত হইতেছে। কুলবধূগণের স্নানের ঘাটে "দেবতার আশ্রমের" সুখ্যাতি, বৃদ্ধারমণীর মজলিসে আশ্রমের বর্ণনা, যুবতীর স্বামী পার্শ্বে বসিয়া আশ্রমের কথা একটির পর একটী করিয়া প্রত্যহ শ্রবণ করিয়াও আশা নিবৃত্তি হয় না—নিত্য আশ্রমের কথা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। দেবতার আশ্রম তিন বৎসর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইতোমধ্যে প্রায় পঞ্চশত যুবক এই আশ্রমে শিক্ষিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে দশম হইতে দ্বাদশ বৎসরের বালকের সংখ্যাই অধিক। দেশ দেশান্তর হইতে পিতামাতা ও অভিভাবকগণ তাঁহাদের সন্তানগণকে দেবতার আশ্রমে পাঠাইতেছেন। কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্নের নেতৃত্বে বালকগণ হিন্দুত্ব ও ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে।

রজনী এক প্রহর থাকিতে যখন কৃষ্ণমোহন গৃহ হইতে আশ্রমে উপস্থিত হন, তখন আশ্রমের যুবক ও বালকগণ শারীরিক ব্যায়ামে নিযুক্ত থাকেন। একদল বালক পুষ্পোদ্যানের মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে মুখে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিতেছে, কোন দল গাভীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছে, কোন দল অন্ধ খঞ্জদের জন্য স্নানের জল উত্তোলন করিয়া রাখিতেছে; কোন দল রুগ্ন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য পথ্যাদি প্রস্তুত করিতেছে, কোন দল পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশুগুলিকে লইয়া সহোদর সহোদরার ন্যায় আশ্রমের চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিয়া কত প্রকার ক্রীড়া করিতেছে, কোন দল ধান্যের গোলা হইতে ধান্য লইয়া চাউল প্রস্তুতের জন্য বিধবা-আশ্রমের দিকে মস্তকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। সকলেরই হাস্যদীপ্ত মুখমণ্ডলে আনন্দ বিরাজমান। সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্য পালনে ব্যস্ত। শান্তি—সুখ—স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য সেই আশ্রমে পূর্ণ বিরাজ করিতেছে। অমরাবতীর বিমল আনন্দে সেই আশ্রম সদাই উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

কৃষ্ণমোহন আশ্রমে উপনীত হইয়া মধুরস্বরে সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বালক ও যুবকগণের সহিত স্নানে বহির্গত হন। এই সময় কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্ন বালকের সহিত বালকোচিত রহস্যালাপ ও যুবকগণের

সহিত নানা ধর্ম্মতত্ত্ব ও ভগবৎ-বিষয়ক কথা কহিতে কহিতে পুষ্করিণীর ঘাটে উপস্থিত হন। স্নানান্তে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া প্রেমভক্তি-পরিপূরিত হৃদয়ে ঈশ্বর উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকেন। রজনী চারিদণ্ড থাকিতে এবং সূর্য্যোদয়ের পর দিবা চারি দণ্ড পর্য্যন্ত "দেবতার আশ্রমের" দৃশ্য বড়ই নয়নাভিরাম! অতি পাষণ্ড—ঘোরতর নাস্তিক পর্য্যন্ত এই সময়ের কার্য্য দেখিলে ভগবৎপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া যায়। কি সুন্দর দৃশ্য! ভাষায় বা বর্ণনায় এ দৃশ্য বুঝাইবার নহে। দশ বৎসরের শিশুগণ কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্নের শিক্ষাগুণে মুদিতচক্ষে কোমল হস্তদুটি ঊর্দ্ধে যোড় করিয়া একমনে দয়াময় বিভুকে স্মরণ করিতেছে! নিজ নিজ জীবনের ধর্ম্মোন্নতির জন্য পিতার নিকট অজ্ঞান শিশুর অকপট ভাষায় সরলভাবে আকুল প্রার্থনা জানাইতেছে! যুবকগণ ভক্তি গদ্‌গদ চিত্তে প্রশস্ত বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত করিয়া অতি দীনভাবে বিশ্বপাতার চরণে আত্মা নিবেদন করিতেছে! সকলেরই নয়নে প্রেমাশ্রু। অপর দিকে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীগণ ওঁকারধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া কেহ বিভুনাম গান করিতে করিতে আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন! কেহ সুরলয়-সংযোগে বেদগান করিতেছেন, কেহ মনের আনন্দে গীতাদি পাঠ করিতেছেন! কোন দিকে সারি সারি হোম-

কুণ্ডে ব্রাহ্মণগণ ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছেন। সমীরণ সেই হোমগন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক মন্দ মন্দ বহিতেছে। মধুময় গন্ধে বৈদিকচ্ছন্দে সে স্থানে সর্ব্বত্রই একটী পবিত্রতা ও সংযম বিরাজ করিতেছে। বিধবা-আশ্রমের বিধবাগণ স্নানান্তে "হর হর বোম বোম" শব্দে শিবমন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন, কেহ বা অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে অঞ্জলি অঞ্জলি বিল্বপত্র চন্দনসিক্ত করিয়া ভক্তিভরে মহাদেবের মস্তকে প্রদান করিতেছেন। অন্ধ ও খঞ্জগণ পরিত্রাহি রবে বিশ্ব-পিতার চরণে পাপশান্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছে! কেহ বা ভগবানের চরণ ধ্যান করিয়া বিগলিত নেত্রে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভাসিয়া যাইতেছে। রুগ্ন ব্যক্তিগণ রোগশয্যায় পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার চরণে রোগমুক্তির জন্য কাতর প্রার্থনা করিতেছে। পিতৃমাতৃহীন ছোট ছোট অনাথ শিশুগণ আধ আধ ভাষায় দয়াময় বিভুর নাম অপর শিশুদের সহিত সুরে সুর মিশাইয়া উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতেছে। অন্নের কাঙ্গাল নিরাশ্রয় নরনারীগণ নয়নজলে হৃদয় ধৌত করিয়া একান্তমনে বিপদবারণ মধুসূদনের শরণাপন্ন হইতেছে। আশ্রমের যেদিকে চাহিবে, এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিতে পাইবে! আশ্রমের পয়স্বিনী গাভীগুলিও উর্দ্ধমুখে বুঝি ভগবানের চরণে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

আশ্রমের বিহগকুল বুঝি ঊষাগীতি গাহিতে গাহিতে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিতেছে। আশ্রমের তরুলতাগুলি বুঝি সন্ সন্ শব্দে ভগবানের অপার করুণার কথা আশ্রমবাসীকে জ্ঞাপন করিতেছে। মরি! মরি! কি সুন্দর! কি সুন্দর! যাহার চক্ষু নাই তাহার পক্ষে স্বতন্ত্র, কিন্তু যে আর্যসন্তান চক্ষুষ্মান তাহার নিকট এই দৃশ্য বড়ই সুন্দর, বড়ই মনোহর ইহার তুলনা নাই।

দিবা চারিদণ্ডের পর ঈশ্বরোপাসনা সমাপনান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৈরিক-বসনপরিহিত হইয়া বালক ও যুবকগণ অধ্যয়নে নিযুক্ত হয়েন। কৃষ্ণমোহন, দুর্গাপ্রসন্ন ও আশ্রমের অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ, বালক ও যুবক শিষ্যমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া যখন অধ্যাপনা কার্য্যে রত থাকেন, তখন আশ্রমের শোভা শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কেহ গীতা, কেহ ভাগবৎ, কেহ পাতঞ্জল, কেহ ব্যাকরণ, কেহ বা পবিত্র কণ্ঠে বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন। কৃষ্ণমোহন ও দুর্গাপ্রসন্ন শ্লোকগুলি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া শিষ্য-মণ্ডলীর ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেছেন। তাঁহাদের প্রশান্ত গম্ভীর আকৃতি দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন তাঁহারা করুণা-রসের প্রবাহসম ও সন্তোষের আধার শান্তিলতার মূল সৎপথের প্রদর্শক এবং সৎ স্বভাবের একমাত্র আশ্রয়। দিবা দ্বিতীয় প্রহরের পর অধ্যাপনার কার্য্য শেষ হইলে, কৃষ্ণমোহন

দুর্গাপ্রসন্ন ও আশ্রমের সন্ন্যাসীগণ শিষ্যমণ্ডলীকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে থাকেন। ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া কৃষ্ণমোহন শিষ্যমণ্ডলীকে সংসারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেন—এবং কি ভাবে সংসারে জীবনযাপন করিতে হইবে তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। অতঃপর শিষ্যগণ কেহ হবিষ্যান্ন, কেহ বা নিরামিষ অন্ন গ্রহণ করিয়া অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন ব্যক্তিদের সেবায় মনোনিবেশ করেন। সন্ধ্যার পর যখন আশ্রমের শিবমন্দিরে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠে তখন ব্রহ্মচর্য্যাপরায়ণ বালক ও যুবকগণ পূর্ব্বাহ্নের ন্যায় করযোড়ে ভগবৎ আরাধনায় রত থাকে। রজনী চারিদণ্ডের পর ঈশ্বরারাধনা শেষ হইলে, রজনী এক প্রহর পর্য্যন্ত শারীরিক কঠোর পরিশ্রমে রত থাকিয়া বিশ্রামান্তে দুগ্ধ ফলাদি আহার করতঃ রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় শয্যাগ্রহণ করেন! ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের বালক ও যুবকগণের এই নিয়মের কখন ব্যতিক্রম ঘটিত না। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের হবিষ্যান্নাহারী এক একটি যুবকের বাহুতে যে শক্তি ছিল, আজি-কালিকার যুবকগণের দেহে তাহার শতাংশের এক অংশ শক্তি আছে কি না সন্দেহ। আমরা এই স্থলে নিম্নোক্তরূপ বহু ঘটনার মধ্যে একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের যুবকগণের বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিব।

পূর্ব্বে ডাকাইতের অত্যন্তই প্রাদুর্ভাব ছিল। ডাকাইতগণ পত্রদ্বারা পূর্ব্বাহ্নে গৃহস্থকে নিজেদের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া ডাকাতি করিত। সেকালে পল্লীগ্রামে যাঁহাদের কিছুমাত্র ধনসম্পত্তি ছিল, তাঁহাদিগকে রাত্রে সশঙ্কিত অবস্থায় নিদ্রা যাইতে হইত ; ভয়, পাছে ডাকাতেরা তাঁহাদের ধনসম্পত্তি লুটিয়া লয়। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের বালক ও যুবকগণ প্রতিমাসে একদিন তাহাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত, কিন্তু তথায় কাহারও রাত্রিযাপন করিবার কৃষ্ণমোহনের আদেশ ছিল না। শঙ্করদেব নামক একটী ষোড়শবর্ষীয় ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের যুবক পিতামাতার চরণ দর্শন করিবার জন্য গৃহে গিয়াছিলেন। শঙ্করদেবের বাসভবন আশ্রম হইতে প্রায় নয়ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সন্ধ্যার পর পিতৃমাতৃ-চরণে প্রণাম করিয়া শঙ্কর আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছেন। শঙ্করদেব যখন অর্দ্ধপথে আসিয়াছেন, তখন রজনী চারিদণ্ড অতীত হইয়া গিয়াছে। শঙ্করদেবের পরিধানে একখানি গৈরিক বসন, স্কন্ধে দেড়হস্ত পরিমিত গৈরিক উত্তরীয়। এই উত্তরীয়খানি স্নান, গাত্রমার্জ্জন ও শীত বর্ষা রৌদ্র নিবারণে ব্যবহৃত হইত। মস্তকে দীর্ঘ রুক্ষকেশ,—প্রশস্ত বক্ষস্থল, মুখখানি প্রফুল্ল। শঙ্করদেব অর্দ্ধপথে আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা

দ্রুতপদচারণা করিতে লাগিলেন, রজনী একপ্রহরের পূর্ব্বেই তাঁহাকে আশ্রমে পৌঁছিতে হইবে। তিনি দ্রুতপদসঞ্চালনে আরও অর্দ্ধক্রোশ পথ অগ্রসর হইয়া একটি গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহের দ্বারদেশে একটী বিধবা যুবতী ক্রন্দন করিতেছেন এবং একটী পঞ্চম বৎসরের বালিকা কন্যা যুবতীর অঞ্চল ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। বালিকাটি অতি সুশ্রী। বিধবার সম্মুখে তিন চারিটী পৌঢ়া বিধবা ও সধবা স্ত্রীলোক এবং চার পাঁচটী প্রতিবাসী ভদ্রলোক। সকলেই বিধবাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেছে। শঙ্করদেব একজন প্রতিবাসীকে একটু দূরে লইয়া গিয়া স্ত্রীলোকটির ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, স্ত্রীলোকটী অল্পদিন হইল বিধবা হইয়াছেন। স্ত্রীলোকটীর স্বামী গ্রামের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার যথেষ্ট অর্থ ছিল, তিনি দরিদ্রের পিতামাতার স্বরূপ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রী ও পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যাটি ব্যতীত তাঁহার সংসারে আর কেহই নাই। স্ত্রীলোকটী অদ্য সন্ধ্যার পর একটী অপরিচিতা বৃদ্ধা রমণীর নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছেন; পত্রে লেখা আছে, অদ্য তাঁহার গৃহে ডাকাতি হইবে। বিধবা ধনপ্রাণ রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া রোদন করিতেছেন।

শঙ্করদেব গম্ভীরস্বরে প্রতিবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গ্রামের সকলে মিলিয়া কি নিরাশ্রয়া বিধবা রমণীটিকে ডাকাতদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না?"

প্রতিবাসী ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"গ্রামবাসীর এমন কি সাধ্য যে, ডাকাইতদের গতিরোধ করিতে পারে? ডাকাইতদের হস্তে কাঁচা মাথা দিতে কেহ বা অগ্রসর হইবে? সকলেরই স্ত্রী-পুত্র আছে, ঘর সংসার আছে, নিজেদের গৃহ অগ্রে রক্ষা করিতে হইবে। ডাকাতগণ কাহার গৃহ আক্রমণ করিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?"

প্রতিবাসীর কথা শুনিয়া শঙ্করদেব অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। একবার ভাবিলেন, আশ্রমে যাইয়া এই সংবাদ প্রদান করি। আবার ভাবিলেন,—আশ্রম এস্থান হইতে এখনও নিতান্ত অল্প দূর নহে, যাতায়াতে বহু বিলম্ব হইবে। যদি ইতিমধ্যে দস্যুগণ বিধবার গৃহ আক্রমণ করে, তাহা হইলে বিধবার উদ্ধারের কোনও উপায় থাকিবে না।

শঙ্করদেব মনে মনে এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন,—এদিকে রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া, প্রতিবাসীরাও একে একে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। শঙ্করদেব প্রতিবাসীদের ব্যবহার দেখিয়া বিচলিত হইয়া

উঠিলেন; বিধবাটির কাতর ক্রন্দন শুনিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না।

শঙ্করদেব বিধবার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—“মা! আপনার বিপদের কথা আমি সমস্তই শুনিয়াছি। বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া রোদন করিয়া কি করিবেন, গৃহের ভিতরে চলুন। আমি আপনাকে মা বলিয়াছি, পুত্রের দ্বারা জননীর যতটুকু উপকার সম্ভব, তাহা আমি করিব। আমার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু থাকিতে আপনার কোনও অনিষ্ট হইতে দিব না। অদ্য রজনীতে এই গৃহত্যাগ করিয়া আমি কোথাও যাইব না।”

শঙ্করদেবের স্নেহ-ভক্তি-মিশ্রিত কথাগুলি শ্রবণ করিয়া বিধবা বলিলেন, “বাবা! তুমি কে? তুমি যেই হও, তোমার মধুমাখা কথাগুলি অসামান্য উন্নত হৃদয়ের পরিচয় দিতেছে। বাবা, তুমি বালক, তোমার ন্যায় কমনীয়কান্তি বালকের মুখ দেখিয়াও দস্যুদের দয়ার উদ্রেক হইবে না?”

“মা! আমি কাহারও দয়ার ভিখারী নহি! ভগবান ব্যতীত কাহারও নিকট দয়া ভিক্ষা করিবার গুরুদেবের আদেশ নাই।” তৎপর দৃঢ়রূপে বহির্বাটীর দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া কন্যাটীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বিধবাকে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। তিনি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।

নানাবিধ কথায় আরও কয়েক দণ্ড অতীত হইয়া গেল। শঙ্করদেব অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, বিধবার গৃহে আত্মরক্ষা করিবার উপযুক্ত কোন অস্ত্রশস্ত্রই নাই। রজনীও প্রায় এক প্রহর হইতে যায়; অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। শঙ্করদেব চঞ্চল হৃদয়ে বাটীর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন, বহুদিনের একটী জীর্ণ গুলতুই গৃহপার্শ্বে শুষ্ক কাষ্ঠরাশির উপর অযত্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। শঙ্করদেব উৎসাহের সহিত গুলতুইটি হস্তে তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ বিধবার নিকট খানিকটা রজ্জু সংগ্রহ করিয়া গুলতুইটিকে কার্য্যোপযোগী করিয়া লইলেন। শঙ্করদেবের বহুচেষ্টায় গুলি কিছুতেই সংগ্রহ হইল না। শঙ্করদেব ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন, "মা! আপনার গৃহে সুপারি কতগুলি আছে, লইয়া আসুন।" বিধবার স্বামীর শ্রাদ্ধের সময় যে সুপারি আসিয়াছিল, তাহার প্রায় পাঁচসের গৃহে অবশিষ্ট ছিল; তিনি সেইগুলি লইয়া আসিলেন। শঙ্করদেব বাছিয়া বাছিয়া চারিসের সুপারি দৃঢ়রূপে উত্তরীয়ে বন্ধন করিলেন। বিধবার গৃহের চতুর্দ্দিকে কোথায় কি আছে ইতিপূর্ব্বে শঙ্করদেব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্তই জানিয়া লইয়াছিলেন। কন্যাসহ বিধবাকে গৃহে শয়ন করিবার জন্য অনুরোধ

করিয়া শঙ্করদেব গৃহের চতুর্দ্দিক একবার দেখিয়া আসি-লেন।

রজনী দেড় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, শঙ্করদেব বিধবার গৃহের পশ্চাতে একটি প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষের শিরো-দেশে বসিয়া চারিদিকে লক্ষ্য করিতেছেন, গাঢ় অন্ধকা-রের মধ্যে কোথাও কিছু দেখা যাইতেছে না। মাঝে মাঝে খদ্যোতের ক্ষীণ আলো সেই অন্ধকারকে আরো ভীষণতর করিয়া তুলিতেছিল। রজনী নিস্তব্ধ, গ্রাম সুসুপ্ত। কিয়ৎক্ষণ অতীত হইবার পর শঙ্করদেব দেখিতে পাইলেন, গ্রামের প্রান্তসীমায় পুষ্করিণীর উচ্চ পাড়ের উপর বসিয়া কতকগুলি লোক এক একটি করিয়া মশাল জ্বালিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেইস্থান মশালের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণে শঙ্করদেব দেখিলেন, জ্বলন্ত মশাল হস্তে কতকগুলি লোক বিধবার গৃহের দিকে আসিতেছে, বিবিধ রঙে রঞ্জিত হইয়া আরও কতকগুলি লোক তাহাদের পশ্চাতে আছে। শঙ্করদেব বুঝিলেন, ইহারাই নির্ম্মম-হৃদয়, নরঘাতক দস্যু, ইহারাই বিধবার সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য অগ্রসর হইতেছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই দস্যুগণ ভীষণ কোলাহল ও "রে রে" শব্দে বিধবার বাটীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল। শঙ্কর-দেব দেখিলেন, দস্যুদের সংখ্যা ত্রিশজনের কম নহে;

যমদূতের ন্যায় বিকটাকার;সকলেরই হস্তে সুদীর্ঘ বংশযষ্টি। যষ্টিগুলির অগ্রপশ্চাৎ লৌহের দ্বারা বাঁধান। দস্যুগণের কয়েকবার পদাঘাতেই বিধবার বাহির দরজা ভগ্ন হইয়া গেল। শঙ্করদেব ইতিপূর্ব্বেই উত্তরীয় দ্বারা আম্রবৃক্ষের শিরোদেশের শাখার সহিত নিজেকে উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া পরিধেয় গৈরিক বসনে গুবাকগুলি সুকৌশলে রক্ষা করিয়াছিলেন।

জয় আশায় উল্লসিত হইয়া দস্যুগণ "হো হো" "রে রে" শব্দে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেছে। বাধা দিবার উপযুক্ত সময় বোধে শঙ্করদেব দস্যুগণের নাসিকা ও মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলতুইয়ের সাহায্যে তীরবেগে সুপারি ছুড়িতে আরম্ভ করিলেন। শঙ্করদেবের লক্ষ্য ব্যর্থ হইবার নহে, দস্যুগণের কাহারও মস্তকে, কাহারও নাসিকার উপর, কাহারও চক্ষে, কাহারও কর্ণদেশে, কাহারও বক্ষঃস্থলে অতি তীব্রবেগে গুলি আসিয়া লাগিতেছে। কাহারও নাসিকার উপর উপর্য্যুপরি দুইটি গুলি আসিয়া পড়ায় নাসিকা-পথে রক্তধারা বহিতেছে, কাহারও কর্ণমূলের একই স্থানে দুই তিনটি গুলি লাগায় কর্ণমূল লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, কাহারও চক্ষে গুলির ভীষণ আঘাত লাগায় যন্ত্রণায় মৃত্তিকার উপর বসিয়া পড়িতেছে।

কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই দস্যুগণ গুলির আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। দস্যুগণ বিধবার গৃহলুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া শত্রুর অনুসন্ধানের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। দস্যুগণ চারিদিকে লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু সেই ভীষণ অন্ধকার রজনীতে কোন্ দিক হইতে গুলি আসিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না। এ দিকে শঙ্করদেবের হস্তের বিরাম নাই; তিনি দস্যুদের মস্তক ও নাসিকা লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিতেছেন—মশালের উজ্জ্বল আলোকে তাঁহার লক্ষ্যের কোনই ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না। শঙ্করদেবের একটি লক্ষ্যও ব্যর্থ হইতেছে না। উপর্য্যুপরি আঘাতে দুইজনের নাসিকা-পথ দিয়া প্রবলবেগে রক্তস্রোত নির্গত হওয়ায় তাহারা ভূমে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তখন সকলেই লুণ্ঠনের আশা ত্যাগ করিয়া পলায়নের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অপর দুই জন দস্যু দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "যে কার্য্যে আমরা আসিয়াছি, সে কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া যদি ভীরুর ন্যায় পলায়ন করি, তবে দলপতির নিকট দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এস, আমরা মশালের আলোক নির্ব্বাণ করিয়া দিই।" এই দুই ব্যক্তির কথা শেষ হইতে না হইতে উপর্য্যুপরি কয়েকটি গুলির আঘাতে তাহারা বিষম আহত হইয়া ধরাশায়ী হইল।

অপর দস্যুগণ ইহাদের কথা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ মশালের আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিল। শঙ্করদের অন্ধকারে বারবার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। দস্যুগণ গৃহে প্রবেশ করিয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। দস্যুগণকে বিতাড়িত করিতে পারিবেন মনে করিয়া শঙ্করদেব এতক্ষণ যে আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, মশালের আলোক নির্ব্বাপিত হওয়ায় এবং দস্যুগণ গৃহে প্রবেশ করিয়া আনন্দসূচক বিকট চীৎকারধ্বনি করায় তাঁহার সে আশা হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল। দস্যুগণের বিকট চীৎকারের পর শঙ্করদেব শুনিতে পাইলেন, বিধবা ও বিধবার কন্যাটি গগনভেদী রবে চীৎকার করিতেছে। শঙ্করদেব স্থির থাকিতে পারিলেন না—ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া বৃক্ষ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, ছয় সাত জন দস্যু রক্তাপ্লুত দেহে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। দুই জনের অতিরিক্ত রক্তপাত হওয়ায় তাহারা দুর্ব্বল অচৈতন্য অবস্থায় পতিত আছে। শঙ্করদেব ধীরে ধীরে দুইজন অচৈতন্য দস্যুর পার্শ্বদেশ হইতে এক গাছি লাঠী লইয়া গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় বিধবার ভীষণ ক্রন্দনধ্বনিতে চমকিত হইলেন। বিধবা অতি কাতর স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, "ওগো, তোমরা আমার

যথাসর্ব্বস্ব লইয়া যাও—আমাকে প্রাণে মার, কিন্তু আমার অঙ্গস্পর্শ করিও না—আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিও না। ষোড়শ বৎসরের ক্ষুদ্র গৈরিক-বসনধারী নিরামিষভোজী শঙ্করদেব ক্রোধে কম্পিত হইয়া শত শঙ্করদেবের বল ধারণ করিল। শঙ্করদেবের রুক্ষ লম্বিত কেশ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল—গাণ্ডিব-ধারী অর্জ্জুনের ন্যায় দৃঢ়মুষ্টিতে যষ্টি ধারণ করিয়া তিনি জন্মের মত পিতা মাতা ও গুরুদেব কৃষ্ণমোহনের চরণ ধ্যান করিয়া প্রণাম করিলেন। আবার সেই বিধবার কাতর চীৎকারধ্বনি—"ওগো, তোমরা কেন আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছ.ছাড়িয়া দাও।" শঙ্করদেব দুই লম্ফে কম্পিত-দেহে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শঙ্করদেবের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। শঙ্করদেব নিদ্রিত না জাগরিত?—তিনি কি স্বপ্নরাজ্যে? এই লোমহর্ষক ঘটনা সত্য সত্যই কি তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ঘটিতেছে? শঙ্কর-দেব ইহা নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—একজন দস্যু যুবতী বিধবাকে দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিতে যাইতেছে, অপর দুইজন দৃঢ়মুষ্টিতে বিধবার হস্ত ধারণ করিয়া আছে। বিধবা আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, "তোমরা কে আছ গো, আমাকে রক্ষা কর।"

"ভয় নাই মা, তোমার সন্তানের রক্তবিন্দু এখনও বাহুতে প্রবাহিত হইতেছে"—এই বলিয়া সজোরে আলিঙ্গনোদ্যত দস্যুর দক্ষিণ বাহুতে লাঠির আঘাত করিলেন। দস্যুর হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল, সে বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে লুণ্ঠিত হইল। অপর দস্যুগণ শঙ্করদেবকে আক্রমণ করিতে যাইতেছিল, তাহাদিগকেও ক্ষিপ্রহস্তে লগুড়াঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া ভূপাতিত করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট দস্যুগণ শঙ্করদেবের কালান্তক মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া পলাইয়া গেল। শঙ্করদেব দৃঢ়মুষ্টিতে যষ্টি ধারণ করিয়া বাটীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আসিলেন, দস্যুগণের কোন চিহ্নমাত্রও আর দেখিতে পাইলেন না। গুবাকের আঘাতে আহত হইয়া যে স্থলে কয়েক জন দস্যু ভূপতিত ছিল, শঙ্করদেব সেই স্থলে গিয়া দেখিলেন, অর্দ্ধদগ্ধ মশাল ও রক্তের চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নাই। আপদ চুকিয়া গেল ভাবিয়া, শঙ্করদেব—বিধবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, বিধবা ভয়ে, দুঃখে ও ঘৃণায় জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়া আছে, বিধবার পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যাটি মাতার শিয়রে বসিয়া রোদন করিতেছে। শঙ্করদেব কন্যাটিকে সান্ত্বনা করিয়া তাহার জননীর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

বিধবা প্রকৃতিস্থ হইয়া শঙ্করদেবকে একবার সম্মুখে বসিতে বলিলেন। শঙ্করদেব বলিলেন, "মা, আমার আর

অধিক বিলম্ব করিবার অধিকার নাই, প্রত্যুষেই আমাকে গুরুদেবের চরণ দর্শন করিতে হইবে। অদ্য রজনী বাহিরে যাপন করিয়া আমি আশ্রমের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি।"

বিধবা বলিলেন, "বাবা! তুমি আমার ধন, জীবন ও সতীত্ব রক্ষা করিয়াছ। তোমাকে বালক দেখিয়া এক একবার অবিশ্বাস হইয়াছিল যে, তুমি কি করিয়া আমাকে রক্ষা করিবে, এখন বুঝিলাম বীরবালক—উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য! তুমি গুরুর চরণ দর্শন করিতে যাইবে, আমাকে বাবা, সঙ্গে লইয়া চল, আমিও গিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিব।"

"মা! আমি আপনার ধন, জীবন, সতীত্ব রক্ষা করিয়াছি, একথা বলিয়া আমাকে লজ্জা দিবেন না। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র মানবের কিছু কারবার ক্ষমতা নাই, সকলই মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় সম্পন্ন হইতেছে। আমি গুরুর আদেশ ব্যতীত আপনাকে লইয়া যাইতে পারি না, তাঁহার আদেশ হইলে আপনি দেবতার আশ্রমে যাইয়া তাঁহার চরণ দর্শ করিতে পারিবেন।"

দেবতার আশ্রমের নাম শুনিয়া বিধবা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "বাবা! আমার স্বামীর মুখে "দেবতার আশ্রমের" নাম আমি বহুবার শুনিয়াছি! তুমি কি বাবা দেবতার আশ্রমে বাস কর?"

"হাঁ মা, আমি দেবতার আশ্রমের ব্রহ্মচর্য্য-বিভাগে বিদ্যাশিক্ষা করি। প্রাতঃস্মরণীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার গুরুদেব।"

কৃষ্ণমোহনের নাম শুনিয়া বিধবা ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"বাবা! তোমার গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আমার স্বামী মধ্যে মধ্যে দেবতার আশ্রমে যাইতেন। আমাকেও একবার লইয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু হতভাগিনী আমি—আমার কপাল একবারে পুড়িয়া গেল!" বিধবা পুনরায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

কথায় কথায় রাত্রি প্রভাত হইয়া যায় দেখিয়া শঙ্করদেব বিধবার নিকট বিদায় লইয়া গাত্রোত্থান করিলেন. এমন সময় বিধবার কন্যা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! ইনি আমাদের কে হ'ন মা?"

বিধবা কন্যার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—"মা! ইনি তোমার দাদা।"

বালিকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া শঙ্করদেবের হাত ধরিয়া বলিল,—"তবে আমার দাদা এতদিন কোথা ছিল মা? দাদা! তুমি এখনই কোথা চলে যাবে?—তুমি, আর যেতে পাবে না, আমরা তোমাকে আমাদের বাড়ী থেকে কিছুতেই যেতে দেব না।"

শঙ্করদেব বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি আবার আসিব দিদি!"

বিধবা বলিলেন, "বাবা! আমার এই গৃহে বাস করা আর নিরাপদ নহে—আমিও আশ্রমে যাইয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন বাস করিব। তোমার গুরুদেবের চরণে এই নিরাশ্রয়া বিধবার কথা যেন জানাইতে বিস্মৃত হইও না।"

শঙ্করদেব আর পশ্চাতে না চাহিয়া গৃহের বাহির হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

"দিদি! জীবনের মুহূর্ত্তগুলি বৃথা ব্যয় করিলে আমাদের ন্যায় অধম বিধবাদিগকে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়।"

"শরৎ! আশ্রমে আসিয়া অবধি তোমার নিকট শাস্ত্রের নূতন নূতন কথা শুনিয়া আমরা নবজীবন লাভ করিয়াছি।"

"শাস্ত্রের কথা আমি কি জানি দিদি! হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ অগাধ—অনন্ত! দাদা বলেন, আমি হিন্দুশাস্ত্রের শত অংশের এক অংশও পাঠ করি নাই। তিনি বাল্যকাল হইতে দিনরাত এই শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছেন। সকলেই বলেন, দাদার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এ দেশে আর নাই। দাদার কাছে যাহা কিছু শিখিয়াছি, তোমাদের আগ্রহাতিশয্য বশতঃ তাহাই তোমাদের কাছে বলিয়া থাকি।"

একদিন অপরাহ্নে "বিধবা আশ্রমের" উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে বসিয়া কতকগুলি বিধবা শরৎকুমারীকে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। শরৎকুমারী নানাবিধ শাস্ত্রীয়

কথার অবতারণা করিয়া বিধবাদিগের প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতেছেন।

একটি বয়স্থা বিধবা দুঃখিতচিত্তে শরৎকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা শরৎ! বিধবা-আশ্রমে এই যে দশম হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্কা নিরাশ্রয়া বিধবাগুলি বাস করিতেছে, ইহাদিগকে দেখিলে চক্ষু ফাটিয়া জল পড়ে। আহা! ইহারা সংসারে সুখের মুখ দেখিতে পায় নাই। ইহাদের বিবাহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বামীদর্শন আর ঘটে নাই। স্বামী যে কি বস্তু, তাহা ইহারা জানে না। ইহাদের যদি পুনর্ব্বার বিবাহ হয়, তাহাতে কি দোষ ঘটে?"

শরৎকুমারী কোনও প্রকার বিরক্ত না হইয়া বলিলেন, "ঠিক এই ভাবের কথাই একদিন আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। দাদা বলিলেন, আর্য্য সন্তানগণের ভবিষ্যৎ যেরূপ অন্ধকারময়, কালে হয় ত এইরূপ একটা মতের সৃষ্টি হইবে। আমাদের দেশে যে দিন জাতীয় দুর্ব্বলতা দেখা দিবে, সেই দিন প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ নিজ নিজ সুখ অন্বেষণেই ব্যস্ত থাকিবে। ব্রহ্মচর্য্য, পরোপকারব্রত অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে না। বিশ্বপ্রেম ও দীন দুঃখীর সেবাপ্রবৃত্তি প্রায় সকলের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। আত্ম-সুখেচ্ছা, ইন্দ্রিয়-

চরিতার্থতা, স্বার্থপরতা, ভোগ-বিলাসস্পৃহা যে দিন লোকের হৃদয়ে প্রবল হইবে, সেই দিন হয় ত মা! তোমার ন্যায় সকলেই বলিবে, আহা! ইহারা সংসারে আসিয়া সুখের মুখ দেখিতে পাইল না—নূতন একটি সংসার করিয়া দিলে সুখে কালাতিপাত করিতে পারিত। অনেকে হয় ত দেশ, কাল, পাত্রভেদে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিবে। মা! এই সব কথা কল্পনা করিতেও হৃদয় শিহরিয়া উঠে! আচ্ছা মা, বল দেখি, জগতে অধিক সুখ লাভ হয় কিসে? দাদার চরণতলে বসিয়া যে সব শাস্ত্রের কথা শিক্ষা করিয়াছি এবং নিজে শাস্ত্র-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার ইহাই মনে হয় যে, পরের সেবাব্রত গ্রহণ করিবার জন্যই নারীর জন্ম হইয়াছে। স্ত্রীলোক স্বামীর সেবা করিবে, সন্তান লালনপালন করিবে, গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে অতিথি কুটুম্বকে অন্নজল দানে তৃপ্ত করিবে। স্বামী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়-কুটুম্বের পীড়ায় সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা করিয়া নারীধর্ম্ম পালন করিবে; ইহাই হইল স্ত্রীলোকের সংসারাশ্রমে বাস করিয়া কর্ত্তব্যপালন! ইহাতেই স্ত্রীলোকের সুখী হইয়া থাকা কর্ত্তব্য। এই সুখে স্বার্থপরতা বিদ্যমান থাকিলেও স্বামী-দেবতার সেবা শুশ্রূষা করিয়া নারীজন্ম সার্থক হয়।

এ সুখেও ভাটা আছে, এসুখেও বাধা আছে, কয়জন স্ত্রীলোক চিরদিন স্বামী-সেবা করিয়া জীবনক্ষয় করিতে পারে? চিরশান্তি—চিরসুখ সংসার গণ্ডি ছাড়াইয়া আরও উর্দ্ধদিকে অবস্থিতি করে। যদি বুঝিতে পারিতাম চিরকাল স্ত্রীলোকে এই সুখভোগ করিতে পারিবে—এই সুখে ভাটা নাই—বিরাম নাই—ক্ষয় নাই—তাহা হইলে বলিতাম, স্ত্রীলোক ঘুরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার এই সুখেই লিপ্ত হউক। তাহারা পুনর্ব্বার স্বামীগ্রহণ করিয়া সংসার-কূপে প্রবেশ করুক। কিন্তু তাহা ত বহুলোকের ভাগ্যে ঘটে না মা! যাহাদের ভাগ্যে এই সুখ ঘটে, তাহারাও পরিণামে এই সুখে সুখী হইতে পারে না। দম্পতি-যুগলের বহু জন্মের পর সংসারগণ্ডিতে যখন প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসা বিকশিত হয়, তখন তাহারা সংসারগণ্ডি ছাড়াইয়া প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসার জগতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে,—তখন তাহারা নিজ সন্তানের ন্যায় অপরের সন্তানের মুখচুম্বন করে,—নিজের সন্তানের ন্যায় জগতের সন্তানকে ক্রোড়ে তুলিয়া লয়। তখনই তাহারা অপার্থিব পূর্ণানন্দ লাভ করে। প্রত্যেকেরই প্রাণ মন একদিন এই দিকে বুঝাইয়া পড়াইয়া লইয়া যাইতে সকলেরই দিন থাকিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নয় কি? বৃক্ষের একটি শুষ্ক পত্রও যখন ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভূমিতে

পতিত হইতে পারে না, তখন বিধবার বৈধব্যযন্ত্রণা কি কর্ম্মফলের নিদর্শন নহে? ইহা কি ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখন ঘটিতে পারে? জন্ম মৃত্যু কখনও ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটিতে পারে না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে যদি স্বামী-সুখ ইহজন্মে অদৃষ্টে না ঘটে, সেই পদ ধ্যান করিয়া পুনর্জ্জন্মের জন্য প্রস্তুত হওয়াই বিধবার একমাত্র কর্ত্তব্য। তুচ্ছ সুখ-লালসায় ইহজন্মেই দ্বিতীয় স্বামীর আশা করা ভ্রষ্টাচার ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহাতে কোন হিন্দু বিধবাই কখন সুখী হইতে পারে না।

জ্ঞানীরা যেরূপ এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় ব্রহ্মের কখন ধ্যান করেন না, তাঁহারা সকল দেবদেবী, মনুষ্য, বৃক্ষ পতঙ্গে সেই ব্রহ্মের ছায়া দেখিতে পান, বিধবাদেরও সেইরূপ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে স্বামীর মৃত্যু হইলে ঈশ্বরজ্ঞানে সেই স্বামীমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া জীবনযাপন করা কর্ত্তব্য। আমার গর্ভজাত সন্তান থাকিলে আমি ক্রোড়ে করিয়া বক্ষে তুলিয়া মানুষ করিয়া সুখী হইতাম। অপরের ছেলেকে নিজের ভাবিতে পারি না, ইহা যাহারা মনে করে, তাহারা নিজ স্বার্থ ও সুখ অন্বেষণের জন্যই দ্বিতীয় স্বামীর অনুসন্ধান করিয়া ইহ-পরকাল বিসর্জ্জন দেয়। ইহাদিগকে বহু জন্মেই অশান্তি-অনল বুকে করিয়া বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। আমরা কয় দিনের জন্য এই সংসার

পান্থশালায় আসিয়াছি মা? কিছুদিনের পরে সকলকেই যখন দুইদিনের পান্থশালা ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ গন্তব্য-স্থানে গমন করিতে হইবে, তখন ক্ষণস্থায়ী সুখের আশা ত্যাগ করিয়া চিরসুখের অনুসন্ধানেই প্রাণ মন নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য নহে কি? স্বামী-পদ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া পূজা করিতে পাওয়া সৌভাগ্য ও সুখের বিষয় বটে, কিন্তু তিনি ত্যাগ করিয়া গেলে—পরজন্মে মিলিত হইবার আশায় সর্ব্বক্ষণ তাঁহার চরণ ধ্যান করিয়া নিজের সুখ, দুঃখ, জীবন ও যৌবন তাঁহার চরণে উৎসর্গ করা আরও পবিত্র সুখ। প্রথম স্বামীর অভাবে যাহারা দ্বিতীয় স্বামীগ্রহণে ইচ্ছুক, তাহারা পঙ্কিল সংসারগর্ত্তের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবে, বিশ্বপ্রেম এবং স্ত্রীলোকের উচ্চ ও কর্ত্তব্য কার্য্যের সম্মুখে তাহারা অগ্রসর হইতে পারিবে না। পার্থিব সুখ ত্যাগ করিতে না পারিলে অপার্থিব চিরানন্দের কাছে কেহ অগ্রসর হইতে পারে না। নিজ গর্ভজাত সন্তান-সন্ততির জননী না হইলেও, বিধবা সংসারে বহু সন্তান-সন্ততির জননী হইতে পারেন। দুই একটি সন্তান অপেক্ষা বহু সন্তানের জননী হওয়া কি সুখের বিষয় নহে? স্বামী-মূর্ত্তি চাক্ষুষ সম্মুখে দেখিতে না পাইলেও বিধবা চিরজীবন স্বামীমূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনায় মানুষ

যেরূপ শান্তি লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়,—মৃত স্বামীর চরণ ধ্যান করিয়াও বিধবা স্বামীপদে মিলিত হইয়া অক্ষয় মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। সংসারে প্রেম, ভালবাসা, দয়া, ভক্তি, ক্ষমা, নরনারীর হৃদয়ের সারবস্তু ; এই সার সৎবৃত্তিগুলি যেদিন ভগবানের রাজ্যময় ছড়াইয়া পড়িবে—সেইদিনেই নরনারী সংসারবৃক্ষে শান্তিফল লাভ করিতে সক্ষম হইবে, নচেৎ সংসারে শান্তির জন্য বহু জন্ম ছুটাছুটি করিলেও প্রকৃত সুখশান্তি নরনারীর অদৃষ্টে কখন ঘটিবে না। মা ! সংসার-মোহে ডুবিয়া স্বার্থ-চিন্তানল অহরহঃ হৃদয়ে জ্বালিয়া রাখিলে শান্তি-সুখ কি হৃদয়ে তিষ্ঠিতে পারে ? প্রজ্জ্বলিত স্বার্থানল সরস শান্তিকে শুষ্ক করিয়া ফেলে। মানুষ সংসারে যে সুখ-শান্তিতে আত্মহারা হইয়া পড়ে, তাহা প্রকৃত নির্ম্মল সুখ-শান্তি নহে। ক্ষুধাতুর কুক্কুর যেরূপ অন্য খাদ্য সামগ্রীর অভাবে বহুদিনের মৃত কোনও পশুর একখণ্ড হাড় লইয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে শুষ্ক অস্থির ঘর্ষণে জিহ্বা ও দন্তমূল হইতে রক্তপাত করে এবং বহুক্ষণের পরে ক্লান্ত হইয়া নিজ মুখ-নিঃসৃত রক্তমিশ্রিত লালা উদরস্থ করিয়া শান্তি-সুখ ও ক্ষুধা নিবারণ করে, সাংসারিক মানবের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। বহু সহায়-সম্পদ ও অর্থশালী ব্যক্তিও সংসারে সুখ পায় না। সাংসারিক কোন অভাব না থাকিলেও

তাহাদের প্রাণ যেন সময়ে সময়ে কাঁদিয়া উঠে—ইহা অপেক্ষাও নির্ম্মল সুখ পাইবার জন্য তাহাদের প্রাণ সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া নীরব ভাষায় ক্রন্দন করে। যখন তাহাদের হৃদয় সর্ব্বক্ষণ নীরবে কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুল হইয়া পড়ে, তখন তাহারা অতুল ধন-সম্পদ, রাজ-অট্টালিকা তুচ্ছ করিয়া নির্ম্মল চির সুখের জন্য বিশ্বপিতার চরণে নিজেকে বিলাইয়া দেয়। ভগবান যদি অকাতরে এত বড় জগৎ, বায়ু, জল, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, নদ, নদী, সমুদ্র, বৃক্ষ, লতা নরনারীর সুখের জন্য দান করিয়া থাকেন,—বিশ্বপিতার সন্তোষের জন্য আমরা কি ক্ষুদ্র প্রাণ মন বিশ্বরাজ্যে তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিতে পারি না? তবে ভগবানের ইচ্ছায় স্বামীর মৃত্যু হইলে আবার একটা স্বামীর অনুসন্ধান কেন? স্বামীর চরণ ধ্যান করিতে করিতে বিশ্বরাজ্যের সুখের জন্য বিধবার ক্ষুদ্র প্রাণ বিলাইয়া দিলেই পরমানন্দ লাভ হইবে। বিশ্বরাজ্যের তুলনায় ক্ষুদ্র গণ্ডির—ক্ষুদ্র সংসার-সুখ তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ নহে কি? নর-নারীর হৃদয়ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্যই ভগবান সংসার সৃজন করিয়াছেন। ক্ষেত্র বেড়াজালে রক্ষিত না হইলে যেরূপ জীবজন্তুর অত্যাচারে ও রৌদ্রতাপে ক্ষেত্রোৎপন্ন বৃক্ষাদি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়, আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রেও তদ্রূপ পুত্র-কলত্র স্নেহ ও মায়া জালে ঘিরিয়া

রাখিয়াছে। জল, বায়ু, রৌদ্র, তাপ ব্যতীত বৃক্ষাদি যেরূপ জীবিত থাকিতে পারে না,— প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসার বিকাশ ব্যতীত আমাদের হৃদয়েও সুফলের আশা করা যায় না। অমৃত-ফলের আশায় নরনারীর হৃদয় সর্ব্বদাই কাঁদিতেছে। এই ক্রন্দনধ্বনি জন্মজন্মান্তর ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেহ শুনিতে পায়—যে নিতান্ত বধির, পাপ মলিনতায় যাহার হৃদয় ডুবিয়া আছে, সেও এক একবার এই অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া থাকে। জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফলে যে শুনিবার মত শুনিতে পারে, সেই অমৃত ফলের অধিকারী হইয়া অক্ষয় চিরশান্তি ভোগ করিতে পায়। মা! সংসারে আমরা চির আবাস নির্ম্মাণ করিতে আসি নাই—সংসারক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্যই বিধাতা বিধবার সৃজন করিয়াছেন। জ্ঞান, ধর্ম্ম, পরোপকাররূপ ধর্ম্মবীজ হৃদয়ে বপন করাই বিধবার কর্ত্তব্য। পতিদেবতা হারাইয়া অপর পুরুষকে স্বামীর আসনে বসাইয়া বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করা বিধবার কর্ত্তব্য নহে—"

শরৎকুমারী আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একটি বিধবা যুবতী পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যার হস্তধারণ করিয়া শরৎকুমারীর সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! শরৎ দেবী কোথায় আছেন?"

দেবতার আশ্রমে অনাথ, দীন, দুঃখী ও বিধবাগণ

শরৎকুমারীকে কেহ "দেবী" কেহ বা "শরৎ দেবী" বলিয়া ডাকিত।

শরৎকুমারী বিধবা ও বিধবার কন্যাটির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেন মা! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?"

"মা! আমি অনেকদূর হইতে দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছি।"

"আসুন মা, যাহাকে অনুসন্ধান করিতেছেন, সে দেবতার আশ্রমের একজন নগণ্য সেবিকা, আপনার সম্মুখেই রহিয়াছে।" এই বলিয়া শরৎকুমারী বিধবার হস্ত ধারণ করিয়া কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইয়া শিব মন্দিরের পশ্চাতে তুলসীমঞ্চের সম্মুখে যাইয়া বসিলেন।

বিধবা, বিবাহের পর হইতে স্বামীর মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা সকরুণভাবে বর্ণনা করিয়া শঙ্করদেবের বীরত্বের পরিচয় ও নিজ ধন প্রাণ রক্ষার কথা শরৎকুমারীর নিকট আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিলেন। শরৎকুমারী শঙ্করদেবের উপর যার-পর-নাই সন্তুষ্টা হইয়া কহিলেন, "মা! শঙ্কর তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিয়াছে শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন আশ্রমের প্রত্যেক সন্তান কর্ত্তব্যপালন করিতে কখন সঙ্কুচিত বা ভীত না হয়।" বিধবা কন্যাটির মুখপানে চাহিয়া

কহিলেন, "মা! ইহার পিতার মৃত্যুর পর হইতে সংসার আমার বিষবোধ হইতেছে; কেবল কন্যাটির মুখপানে চাহিয়া স্বামীর আদরের ধন কন্যাটির কষ্ট হইলে প্রভু পাছে হতভাগিনীর উপর বিরক্ত হন এই ভাবিয়া, তাঁহার সংসারাশ্রমে কন্যাটীকে রক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু মা, দস্যুগণের কুদৃষ্টি হতভাগিনীর উপর পড়িয়াছে, সংসারে থাকা আর নিরাপদ নহে। আমি আমার স্বামীর যাবতীয় সম্পত্তি সানন্দে স্বেচ্ছায় দেবতার আশ্রমে দান করিতে ইচ্ছুক। এখন প্রার্থনা, এই যৎসামান্য অর্থ দেবতার আশ্রম-ভাণ্ডারে গ্রহণ করিয়া কন্যাটি সহ হতভাগিনাকে দেবতার আশ্রমে স্থান দান করুন।"

শরৎকুমারী কৃষ্ণমোহনকে ডাকাইয়া সমস্ত কথা জানাইয়া বিধবাকে সযত্নে দেবতার আশ্রমে স্থান দান করিলেন। বিধবার বহুদিনের মনস্কামনা পূর্ণ হইল।

অল্পদিনের মধ্যেই বিধবার কন্যাটি শরৎকুমারীর প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিল। শরৎকুমারী বালিকার নাম রাখিয়াছেন তুলসী। শরৎকুমারী এক একদিন আদর করিয়া বলিতেন, "তুলসী, আমি তোকে তুলসী-মঞ্চের নিকট কুড়াইয়া পাইয়াছি।" তুলসী এখন একদণ্ডের জন্যও শরৎকুমারীর কাছ ছাড়া হয় না। শরৎকুমারী যখন ধ্যাননিমীলিত নেত্রে শিবমন্দিরে পূজা করিতে বসেন,

তুলসীও তাঁহার পার্শ্বে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকে; শরৎকুমারী যখন রোগীদের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হন, তুলসী পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সাহায্য করে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তুলসী গীতা ও ভাগবতের অধিকাংশ শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। প্রাতঃস্নানান্তে তুলসী একখানি ক্ষুদ্র গৈরিক বসন পরিধান্ করিয়া শরৎকুমারীর সহিত যখন রুগ্ন নরনারীর গাত্রে ক্ষুদ্র কোমল হস্ত দুটি স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করে, তখন রুগ্ন নরনারীগণ সরলা বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া যায়। তুলসী কখন একস্থানে বসিয়া থাকিতে ভাল বাসিত না। দেবতার আশ্রমের কোন না কোন বিভা-গের কার্য্য লইয়া সে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত হইয়া থাকিত। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের বালক ও যুবকগণ শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছে, তুলসী একপার্শ্বে বসিয়া মনে মনে তাঁহাদের সঙ্গে শ্লোকগুলি উচ্চারণ করিতেছে। সন্ন্যাসীগণ বেদ পাঠ করিতেছেন, তুলসী সেখানেই গিয়া বসিয়া আছে। বিধবাগণ শিবপূজার জন্য বিল্বপত্র আহরণ করিতেছে, তুলসী বিল্বপত্র আনিয়া তাহাদের সাজি পূর্ণ করিয়া দিতেছে। আবার শরৎকুমারীকে দেখিবামাত্র দৌড়িয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া গোশালার দিকে লইয়া যাইতেছে। শরৎকুমারী অনাথ আশ্রমের শিশুগুলির জন্য দুগ্ধ দুইতে

গেলেন, তুলসী নবদূর্ব্বাদলগুলি আহরণ করিয়া গাভী-গুলিকে খাওয়াইতে লাগিল।

অমাবস্যা, একাদশী ও পূর্ণিমার দিন শরৎকুমারী অনাথ বালক-বালিকাগুলিকে লইয়া অতি প্রত্যুষে সারা-বাটীর বিখ্যাত দ্বারকেশ্বর নদীতে স্নান করিতে যাইতেন। দেবতার আশ্রম হইতে দ্বারকেশ্বর নদী অর্দ্ধক্রোশের অধিক। একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা আসিলে তুলসীর আনন্দের সীমা থাকিত না। তুলসী দ্বারকেশ্বর নদীর স্রোতে বহুদূরে ভাসিয়া যাইত, আবার শরৎকুমারী ডাকিবামাত্র দ্রুত সন্তরণে শরৎকুমারীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত। তুলসী সদাই হাস্যময়ী। তুলসীর সরল হাসিমাখা মুখখানি দেখিয়া শরৎকুমারী ভগবানের সৃষ্টি-কৌশলকে শত শত ধন্যবাদ করিতেন।

———

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

"দাদা! আমায় বুঝাইয়া দাও না, মানুষ জীবনে এত দুঃখ পায় কেন?

"জীব সংসারে আসিয়া স্ব স্ব কর্ম্ম-ফলেই সুখ বা দুঃখ পাইয়া থাকে। যাহারা ভাল কার্য্য করে, তাহারা সুখ ভোগ করে, আর যাহারা কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা দুঃখ পাইয়া থাকে।"

"দাদা! ভাল ও মন্দ কার্য্য কি করিয়া বাছিয়া লওয়া যায়?"

"দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে ভাল মন্দের বিচার হইয়া থাকে। যে কাজ করিলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, তাহাই ভাল, আর যে কাজের অনুষ্ঠান করিলে মনের গ্লানি উপস্থিত হয়, তাহাই মন্দ কার্য্য! দীনে দয়া, পরোপকার, ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান, বিপদাপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধার, শত্রুও বিপদে পড়িলে তাহাকে সাহায্য করা, ভগবানে বিশ্বাস ও তাঁহার চরণে সর্ব্বক্ষণ ভক্তি রাখা প্রভৃতি ভাল কার্য্য। কার্য্যে, বাক্যে বা চিন্তায় পরের মন্দ ইচ্ছা, ভগবানকে বিস্মৃত

হইয়া থাকা, সাধ্যসত্তে অপরের উপকারে নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান, কপট বা অসাধু ব্যবহার, হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যা-ভাষণ প্রভৃতি মন্দ কার্য্য। এই শ্রেণীর কোন একটা কার্য্য করিলে তাহার দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী।"

একদিন সন্ধ্যার সময় বিখ্যাত দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে একটি দ্বাদশ বৎসরের বালিকার সহিত শঙ্করদেবের কথা-বার্ত্তা হইতেছে। বালিকার বর্ণ সুন্দর, দেহযষ্টি সুগোল, বলিষ্ঠকায়। মস্তকের রুক্ষ দীর্ঘ কেশগুলি স্কন্ধে, বক্ষে, কটী-দেশে বিনিক্ষিপ্ত। মুখমণ্ডল ও চক্ষু দুটিতে সরলতা মাখান,-সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও ধর্ম্মভাব ভাসা ভাসা চক্ষু দুটিতে যেন খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। দ্বাদশ বৎসরের হইলেও পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকার ন্যায় সে শঙ্করদেবের পশ্চাতে পশ্চাতে বেড়াই-তেছে। বালিকার সংসার-জ্ঞান বিন্দুমাত্র নাই। ক্ষুদ্র গৈরিক বসনাঞ্চল বক্ষচ্যুত হইয়া ভূমে লুটাইয়া যাইতেছে, সে দিকে বালিকার লক্ষ্য নাই; শঙ্করদেবের বচনসুধাপানের জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া চলিতেছে।

শঙ্করদেব পশ্চাতে ফিরিয়া বলিতেছেন, "তুলসী! তোমার বস্ত্রাঞ্চল যে ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে, দেখিতে পাইতেছ না।"

তুলসী বস্ত্রাঞ্চল স্কন্ধে ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা! দ্বারকেশ্বরের মধ্য দিয়া প্রত্যহ এত নৌকা কোথায় যায়?"

শঙ্করদেবে বলিলেন, "নানা দেশের বাণিজ্যসম্ভার লইয়া দেশ-দেশান্তরে ভাসিয়া যায়।" শঙ্করদেব একখানি প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া সন্ধ্যার সময়ে দ্বারকেশ্বরের অপূর্ব্ব শোভা তন্ময়চিত্তে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তুলসী শঙ্করদেবের পার্শ্বে প্রস্তরখণ্ডের নিম্নে বালিকাসুলভ চঞ্চল হৃদয়ে উপবেশন করিল। উপরে সুনির্ম্মল আকাশ, দ্বারকেশ্বরের পরপারস্থ বিজন অরণ্য হইতে মৃদুমন্দ সমীরণ তাহার অপার জলরাশির উপর দিয়া বহিয়া আসিতেছে। অসংখ্য নৌকা স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে। মাঝিমাল্লাগণ মনের আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে শত শত নৌকা উজান বাহিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যাদেবীর আগমন জানিয়া মাঝি মাল্লাগণ নৌকায় প্রদীপ জ্বালিবার উদ্যোগ করিতেছে। একটি দুইটি করিয়া দ্বারকেশ্বরবক্ষে শত শত দীপ জ্বলিয়া উঠিল। ঊর্দ্ধ আকাশে অগণিত তারকারাজির ন্যায় দ্বারকেশ্বর-বক্ষে দীপমালা শোভিত হইল। মুসলমান মাঝি মাল্লাগণ নৌকার ছাদে বসিয়া নামাজ পড়িতেছে, হিন্দুগণ স্ব স্ব ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া প্রণাম করিতেছে। বিহগকুল সন্ধ্যাদেবীর আগমনে আহারান্বেষণ ত্যাগ করিয়া দ্বারকেশ্বরের অগাধ জলরাশির উপর দিয়া স্ব স্ব কুলায়ে দ্রুত পক্ষসঞ্চালনে উড়িয়া যাইতেছে। অদূরে লোকালয়

হইতে পুরনারীর শঙ্খধ্বনি দ্বারকেশ্বর-তীরে প্রতিধ্বনিত হইয়া নৌকারোহী নরনারীকে সন্ধ্যাগমন জানাইয়া দিতেছে। সন্ধ্যাকালীন দ্বারকেশ্বরের এই শোভা বড়ই মনোরম! শঙ্করদেব দ্বারকেশ্বর-তীরে প্রস্তরখণ্ডে উপবেশন করিয়া অপরূপ শোভা দৃষ্টে পুলকিত হৃদয়ে ভগবানকে বারবার প্রণাম করিতেছেন। শঙ্করদেবকে প্রণাম করিতে দেখিয়া তুলসী ক্ষুদ্র গৈরিক অঞ্চলখানি গলদেশে বেষ্টন করিয়া প্রস্তরখণ্ডের উপর বার বার প্রণাম করিতে লাগিল। অদূরে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের কয়েকটি যুবক সন্ধ্যাভ্রমণে আসিয়া বলাবলি করিতেছে, "দেখ ভাই, আমাদের শঙ্কর ও তুলসী সন্ধ্যাগমে একাগ্রচিত্তে পবিত্র মনে কেমন ভগবানের চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছে।" দ্বারকেশ্বর বক্ষে মাঝিমাল্লাগণ বলিতেছে "দেখ ভাই, একটি যুবক সন্ন্যাসীর চরণে মেয়েটি মস্তক রাখিয়া কি অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতেছে।" শঙ্কর বহুক্ষণ ভগবানের চরণে মন অর্পণ করিয়া বিমল অনন্দে মগ্ন! এদিকে ধীরে ধীরে সন্ধ্যান্ধকারে দ্বারকেশ্বর তীরভূমি আবৃত হইতে লাগিল, শঙ্করদেবের সেদিকে লক্ষ্য নাই। তুলসীও শঙ্করের চরণ প্রান্তে মস্তক রাখিয়া মুদিত নেত্রে ধ্যানে মগ্ন! তুলসীর ক্ষুদ্র, পবিত্র সরলতামাখা মনটি বুঝি শঙ্করের ভক্তিমিশ্রিত প্রাণে মিশিয়া গিয়া ভগবানের চরণ

লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে। বহুক্ষণ পরে শঙ্কর চক্ষুরুন্মীলন করিয়া তারকাশোভিত সুন্দর সন্ধ্যাকাশ পানে চাহিয়া ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতে লাগিলেন—

অধম সন্তান বিভু মাগিছে চরণে স্থান ;
যেন ও চরণে থাকে সদা দেখো মন প্রাণ।
দুদিনের মেলা লয়ে, যেন পিতা মোহ-ঘোরে,
ভুলিয়া না যাই যেন তোমারই সে নিত্য ধাম।
তোমার এই নদী তীরে, তোমারই স্নেহ ক্রোড়ে,
তোমারই দয়াল নাম গায় যেন মন প্রাণ।
আজ আছি কাল নাই, ছাড়িব এই বিশ্বধাম,
যেথা থাকি যেথা যাই গাই যেন তব নাম।

অশ্রুধারায় শঙ্করের বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। শঙ্করের মুখমণ্ডলের দিব্য জ্যোতিঃ সন্ধ্যান্ধকারে উদ্ভাসিত! প্রেমাশ্রুতে ভাসিতে ভাসিতে শঙ্করের কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিয়া দ্বারকেশ্বরের তীরভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মাঝিমাল্লা-ও নৌকারোহীগণ শঙ্করের সুমধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া অনিমেষ নয়নে তীরের দিকে চাহিয়া আছে। সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে শঙ্কর দেখিলেন, বিশ্বরাজ্য অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। শঙ্কর আশ্রমে যাইবার জন্য ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, তুলসীও শঙ্করের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

সহসা নৌকার মাঝি মাল্লাগণ ভীষণ কোলাহল করিয়া উঠিল। কয়েকজন আরোহী চীৎকার করিতে করিতে বলিতেছে, "বাপ সকল, আমাদের জীবন রক্ষা কর, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব তোমাদিগকে দিব।"কয়েকজন মাঝি চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "একখানা নৌকা ডুবি হইল, শীঘ্র নৌকা লইয়া তীরে চল্।" কেহ বলিতেছে, "হায় হায়! আরোহীগণকে বুঝি আর রক্ষা করিতে পারিলাম না, নৌকা এইবার ডুবিল।" একটি স্ত্রীলোক কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "আমি মরি ক্ষতি নাই, আমার বাছাটিকে তোমরা রক্ষা কর! হায়! হায়! কেন বাছাকে লইয়া গৃহের বাহির হইয়াছিলাম, আমার হৃদয়ের ধনকে বুঝি দ্বারকেশ্বরের মাঝে বিসর্জ্জন দিয়া যাইতে হয়।" এইবার "ডুবিল, ডুবিল" রবে ভীষণ চীৎকারধ্বনি উঠিল! "ওগো আমার খোকা কই গো!" রবে স্ত্রীলোকটি আবার গগনভেদী চীৎকার করিয়া নীরব হইল। ভীষণ গগনভেদী রব বুঝি দ্বারকেশ্বরের অতল জলে চিরতরে মিশিয়া গেল! হায়! হায়! সব গেল! সব গেল! আর কেহ বাঁচিল না! অপরাপর নৌকার আরোহীগণ চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "ওগো, ঐ যে ছেলেটি ক্রোড়ে লইয়া মেয়েটি ভাসিয়া যাইতেছে। তোমরা শীঘ্র ধর। আহা! ঐ গো! ঐ—ঐ মেয়েটি ডুবিয়া গেল!"

আবার মাঝিমাল্লাগণ ভীষণ কোলাহলধ্বনি করিয়া উঠিল।

শঙ্করদেব প্রথমতঃ গোলমালের কারণ বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দণ্ডায়মান ছিলেন। যে মুহূর্ত্তে তিনি বুঝিতে পারিলেন, আরোহীর সহিত একখানি নৌকা জলমগ্ন হইতেছে, যে মুহূর্ত্তে স্ত্রীলোকটির "আমার বাছাকে রক্ষা কর" এই করুণস্বর শঙ্করের কর্ণে প্রবেশ করিল, শঙ্করদেব সেই মুহূর্ত্তে একবার তুলসীর মুখের দিকে চাহিয়া "তুমি দাঁড়াও তুলসী," বলিয়া দ্বারকেশ্বরের প্রবল স্রোতে ঝম্প প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তুলসীও "দাঁড়াও দাদা" বলিয়া শঙ্করের পশ্চাতে দ্বারকেশ্বর বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নৌকাখানি জলমগ্নের সময় অপরাপর নৌকাগুলি হইতে দূরে থাকিলেও এখন বহু নৌকার মাঝি মাল্লাগণ একত্রিত হইয়া পরস্পরের স্কন্ধে দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ বলিতেছে, "আরে হালা, আমরা ত ডুবিয়া হেলে তুলিতে নার্‌লাম, তুই হালার পুত ডুব্‌লি না ক্যান্?" কেহ বলিতেছে, "আরে হালার পুত হালা, মোরা ত দূরে ছালাম" এইরূপে মাঝি মাল্লাদের নানারূপ বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। ইত্যবসরে তুলসী বামহস্তে নৌকার একটি হাল ধরিয়া দক্ষিণ হস্তটি একটি বৃদ্ধ মাঝির দিকে উত্তোলন

করিয়া বলিল, "ছেলেটিকে লইয়া স্ত্রীলোকটী কোন্ দিকে ভাসিয়া গেল, শীঘ্র দেখাইয়া দাও।" তুলসীকে দেখিয়া মাঝিরা নিস্পন্দ ও অবাক্ হইয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কেহ ভাবিতেছে, আহা! এমন সুন্দরী টুক্‌টুকে মেয়েটি কোথা হইতে আসিল? কোন মাঝি ভাবিতেছে, ইনি কি জলদেবী? কেহ মনে করিতেছে, নিশ্চয়ই মানবী নহে! কেহ কেহ বলাবলি করিতেছে, দেবতা না হইলে দ্বারকেশ্বরের এই প্রবল স্রোতে অন্ধকার রজনীতে বালিকা-মূর্ত্তি কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? একজন বাঙ্গালী মাঝি চুপি চুপি অপরকে বলিতে লাগিল, "ওরে ভাই! মা ভগবতী মাঝে মাঝে দ্বারকেশ্বরের মাঝে দেখা দেন। ইনি বুঝি মা ভগবতী—এমন রূপ—এমন সাহস, কি বালিকার কখন হইতে পারে? আহা! দেখ্ দেখ্ মাঝ দরিয়া যেন মায়ের রূপে আলো হইয়া গিয়াছে।" তুলসী আবার চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওগো, তোমরা এত লোক আছ, যে কেহ হউক, আমাকে শীঘ্র দেখাইয়া দাও, স্ত্রীলোকটি কোন্ দিকে ভাসিয়া গেল।"

তুলসীর এই বালিকা-সুলভ আবদারের ন্যায় ক্রোধ-বিরক্তি মিশ্রিত বাক্যে সকলেরই হৃদয় গলিয়া গেল। একজন মাঝি বলিয়া উঠিল, "কেন মা, বৃথা অনুসন্ধান করিতেছ? তুমিও কি তাহাদের সঙ্গে মারা যাইবে?

দেখিতেছি, তুমি বালিকা, কোথা হইতে দ্বারকেশ্বরের মাঝে এই ভীষণ স্রোতে আসিলে মা?”

মাঝির কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই বজ্রগম্ভীরস্বরে অন্য দিক হইতে শঙ্করদেব জিজ্ঞাসা করিলেন. “শীঘ্র দেখাইয়া দাও, স্ত্রীলোকটী কোন্ দিকে ভাসিয়া গেল! মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে তোমাদের বিপদ ঘটিবে।”

শঙ্করদেবের বজ্রগম্ভীর স্বর মাঝিদের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সকলেই ভীত ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কেহ বলিল, মেয়েটী পুত্রটিকে বক্ষে চাপিয়া এই নৌকাখানির পশ্চাতে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। কেহ বলিল, স্ত্রীলোকটির স্বামীর হাত ধরিয়া নৌকা হইতে প্রথমে দক্ষিণ দিকে পড়িয়া বামদিকে ভাসিয়া গেল। কেহ বলিল, আহা! মায়ের প্রাণ, তাই ছেলেটিকে রক্ষা করিবার জন্য চীৎকার করিতে করিতে নৌকার সহিত অতল জলে ডুবিয়া গেল। অন্যান্য নৌকার আরোহীরা বলিল, এখান হইতে প্রায় বিংশতি হস্ত দূরে স্ত্রীলোকটি সন্তানটিকে বুকে লইয়া একবার ভাসিয়া উঠিয়াছিল—দেখিতে দেখিতে আবার স্রোতের মুখে ডুবিয়া গিয়াছে।

শঙ্করদেব শেষোক্ত আরোহীবর্গের কথাই বিশ্বাস-যোগ্য মনে করিলেন। শঙ্করদেব উদ্বিগ্ন চিত্তে একবার চিন্তা করিলেন, ঘোর অন্ধকার রজনী, ক্রোড়ের মনুষ্যও

দৃষ্টিগোচর হইতেছে না—কি উপায়ে ইহাদের অনুসন্ধান করি। প্রায় ৫০।৭০ হস্ত দূর হইতে তুলসী চীৎকার করিয়া বলিল, "দাদা। একটি মনুষ্যদেহ ভাসিতে ভাসিতে বার বার ডুবিয়া যাইতেছে, আমি ধরিতে পারিতেছি না, আপনি আমায় সাহায্য করুন।"

শঙ্করদেব তুলসীর কথায় উৎফুল্লহৃদয়ে দ্রুত সন্তরণে স্রোতের মুখ ভাসিয়া চলিল ; ভাসিতে ভাসিতে ভাবিতে লাগিলেন, ধন্য বালিকা তুলসী ! তোমার সন্তরণবিদ্যার নিকট আমি পরাস্ত। আমি তোমার অগ্রেই দ্বারকেশ্বর বক্ষে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমার অগ্রেই দ্বারকেশ্বর-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া মাতা পুত্রের জীবন দানের জন্য অগ্রসর হইয়াছ। যেখান হইতে তুলসী শঙ্করকে ডাকিতেছিল, তথায় শঙ্কর উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন—"কোথায় তুমি তুলসী ?"

তুলসী প্রায় শতাধিক হস্ত দূর হইতে বলিল, "দাদা, আমি মনুষ্যদেহ লক্ষ্য করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু ধরিতে পারিতেছিনা, মনুষ্য-দেহ বার বার ডুবিয়া যাইতেছে, আবার বহুদূরে গিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে, আপনি শীঘ্র আসুন।"

শঙ্করদেব পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত সন্তরণে স্রোতের মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আবার ডাকিলেন "তুলসী"

তুলসী এবার বহুদূর হইতে বলিল, "আমি স্ত্রীলোক-টিকে ধরিয়াছি। আপনি শীঘ্র আসুন।"

শঙ্করদেব শরীরের সমস্ত সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া দ্রুত সন্তরণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বহুদূর অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন, "তুলসী!"

তুলসী এবার বহুদূর হইতে বলিল, "দাদা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, শীঘ্র আসুন।"

শঙ্করের কর্ণে তুলসীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর প্রবেশ হইবামাত্র শঙ্কর ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সাহায্যের জন্য মাঝি মাল্লা দিগকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্ধকার নিশিতে শঙ্করের ব্যাকুল আহ্বান কাহারই কর্ণে প্রবেশ করিল না। প্রায় দুই ক্রোশ সন্তরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন, সাহায্যের জন্য বার বার চীৎকার করিয়া মাঝি মাল্লা-দিগকে ডাকিতেছেন। শঙ্করের ক্রমশঃ হস্তপদ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল! বুঝি কাহারও প্রাণরক্ষা করিতে পারিলাম না—বুঝি বালিকা তুলসীকেও দ্বারকেশ্বরের জন্মের মত হারাইতে হয়। শঙ্কর সাহায্য না পাইয়া তুলসীর জন্য অধিকতর ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শঙ্করের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে প্রতিমুহূর্ত্তে অবশ হইয়া আসিতেছে, সেদিকে লক্ষ্য নাই। শঙ্কর ব্যাকুল হইয়া কেবল ভগবানকে ডাকিতেছেন, হে হৃষীকেষ, মধুসূদন! সরলা বালিকা

তুলসীকে রক্ষা কর। আহা! জননী সহ শিশুটির বুঝি এতক্ষণ প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। দয়াময়! তোমার করুণা ব্যতীত এই মুমূর্ষু প্রাণী কয়টির জীবন-রক্ষার আর উপায় নাই। হতাশ চিন্তায় শঙ্করের দেহ শিথিল হইয়া পড়িল—হস্তপদ সঞ্চালনে আর ক্ষমতা নাই; অবশ অঙ্গে স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিতে লাগিলেন। হায়! হায়! শঙ্করও বুঝি এইবার দ্বারকেশ্বরের অতলজলে চিরতরে ডুবিয়া যায়! শঙ্কর জ্ঞান-চৈতনা হারাইয়া যদৃচ্ছা স্রোতের মুখে ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন।

তুলসী দ্রুত সন্তরণ কৌশলে বহুকষ্টে যখন স্ত্রীলোক-টীকে ধরিতে পারিল, তখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রীলোকটিকে তীরের দিকে ভাসাইয়া আনিবার জন্য আনন্দ উৎসাহে তুলসী বার বার যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তুলসী যখন শঙ্করদেবকে বলিতেছিল, "দাদা! বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, শীঘ্র আসুন!" তখন তুলসীর কথা কহিবার শক্তি লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তুলসী নির্জীব হইয়া পড়িলেও প্রাণপণ শক্তিতে ও সন্তরণ কৌশলে স্রোতমুখ হইতে তীরের দিকে আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু বৃথা প্রয়াস। এইরূপে বারংবার

তীরে উঠিবার বৃথা প্রয়াসে তুলসী ক্লান্ত অবসন্ন, অবশেষে মৃতার ন্যায় হইয়া পড়িল। তখন সেও স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সে জীবিতা কি মৃতা তাহা সহজে উপলব্ধি করিবার উপায় নাই।

দ্বিতীয় খণ্ড।

জীবন-সংগ্রাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত। ঘোর অন্ধকার। এক একবার পেচকের কর্কশধ্বনি ব্যতীত কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইতেছে না। দ্বারকেশ্বর তীরে মুণ্ডেশ্বরী দেবীর শুভ্রমন্দির। মন্দিরের ভিতর একটি ঘৃতপূর্ণ প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। মন্দিরদ্বারে পুরোহিত দয়ানন্দ ঠাকুর বসিয়া মালা জপিতেছেন। পুরো-হিত দয়ানন্দের গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা, ললাটে ও বক্ষঃ-স্থলে রক্তচন্দন শোভা পাইতেছে। পরিধানে একখানি কৌপীন। দয়ানন্দের অজানুলম্বিত বাহু, উন্নত ললাট, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল। দয়ানন্দের বয়স ষাট বৎসর অতীত হই-য়াছে, কিন্তু বার্দ্ধক্যের চিহ্নমাত্রও দেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই। মন্দিরের সম্মুখেই মুণ্ডেশ্বরীর শ্মশান। শ্মশানে দুইটি শবদেহ দাহ হইতেছে; দুইটি চিতায় ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে। দয়ানন্দের জপ শেষ হইলে "মাগো ব্রহ্ম-ময়ী, আর কতদিন এখানে রাখিবি মা" বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, প্রজ্বলিত শ্মশানে দুটি শব-

দাহ হইতেছে! মন্দিরের বিংশতি হস্ত দূরে যে বৃদ্ধের দেহটি দগ্ধ হইতেছে, তাহার বিষয় সম্পত্তির মধ্যে কে কত পাইবে, এই লইয়া মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা জ্ঞাতি-দের সহিত বিষম তর্ক বিতর্ক করিতেছে। বৃদ্ধের বহু ধন সম্পত্তি থাকিলেও কন্যাপুত্র কেহই নাই। দয়ানন্দের কর্ণে ইহাদের দুই একটি কথা প্রবেশ করিবামাত্র "মাগো ব্রহ্মময়ী! তোমার এ কি লীলা" বলিয়া আবার মন্দির-দ্বারে বসিয়া পড়িলেন। তাহাদের তর্ক বিতর্ক শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শ্মশানে যাহারা সম্পত্তির মোহে বিবাদে রত, এই হাস্যধ্বনি তাহাদের কাহারই কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল না।

মন্দির মধ্যস্থিত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া দয়া-নন্দ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "মা এতকাল তোর সেবা করিতেছি, এখনও তোর দয়া হইল না? মাগো! দয়া-নন্দ কি এতই পাপী? তুই আমায় বলে দে মা, দুর্লভ মানব-জীবনে এমন ঘৃণিত বিষয়-কীট কেন ছাড়িয়া দিয়া-ছিস্? হায় বিষয়-লোলুপ বৃদ্ধের জ্ঞাতি বন্ধু! তোমরাও যে এই অধম দয়ানন্দের ন্যায় কোটী কোটী জন্ম ঘুরিয়া দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছ! মাকে ডাকিলে যে অমূল্য ধনের অধিকারী হইতে পারিতে। আজ যে ধনের জন্য কলহে প্রবৃত্ত, কাল আবার তোমাদের মৃত্যুতে পুত্র,

পৌত্র জ্ঞাতিবন্ধুগণ এইরূপ কলহে মত্ত হইবে, তাহা কি একবার ভাবিতেছ না? চির আনন্দময় অক্ষয় অমূল্য ধন ত্যাগ করিয়া অনিত্য নশ্বর ধন লাভের জন্য পবিত্র শ্মশানে আসিয়াও বিবাদে রত হইয়াছ? ত্যাগেই সুখ, শ্মশানই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল! বৃদ্ধ এতদিন আমার আমার করিয়া কত ধন সঞ্চয় করিতেছিল, আজ দেখ, সে সকলই ত্যাগ করিয়া চলিল। বৃদ্ধের আর লোভ নাই, দুঃখ মোহ নাই, ধন-স্পৃহা নাই। ধন সঞ্চয়ের আকুল চেষ্টা নাই—সকল মোহ ছিন্ন করিয়া উলঙ্গদেহে গন্তব্য স্থানে গমন করিতেছে। বৃদ্ধ এখন সুখ দুঃখের অতীত, ঐ দেখ বৃদ্ধের সূক্ষ্ম দেহ তোমাদের ধন বিভাগের বিতণ্ডা দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিতেছে! বৃদ্ধ বলিতেছে, "সংসারে আসিয়া ধনোপার্জ্জন ও ধন সঞ্চয়ের জন্য আমি কি না করিয়াছি! স্বার্থই আমার মূল মন্ত্র ছিল, দিবানিশি আমার আমার করিয়া বিভ্রম হইয়া সংসারে ঘুরিয়াছি, অর্থের জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম মানি নাই, মিথ্যা প্রবঞ্চনা কপটাচরণে ইতস্ততঃ করি নাই, পরকাল স্বীকার করিলেও কখন তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করি নাই, চিরদিন সংসারে থাকিতে পাইব না, জানিলেও কথাটা কখনো মনে উদিত হইতে দিই নাই, অজর ও অমরের ন্যায় কেবল ধনোপার্জ্জন ও ধন সঞ্চয়ই আমার জীবনের কার্য্য ছিল! কিন্তু এখন দেখিতেছি,

সুখ নাই! বহু কষ্টের অর্জ্জিত ধন লইয়া তোমরা বিবাদ করিতেছ, কিন্তু কর্ম্মফল আমার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতেছে! মন প্রাণ একত্রিত করিয়া কখন ভগবানের নাম হৃদয়ে জপ করি নাই, ধনচিন্তায় হৃদয় এতই জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, ভগবানের চিন্তা হৃদয়ে আর স্থান পাইতেছে না;—আমি এখন ঘূর্ণিবায়ুতে ঘুরিতেছি, জানি না কতদিন ঘুরিয়া, কোন্ পাপপঙ্কে পড়িয়া কতকাল আমার নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।"

"মা দয়াময়ী! আরও কতদিন আমাকে ত্যজ্য-পুত্র করিয়া রাখিবি মা?" দয়ানন্দ এই কথা বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

দয়ানন্দ গুরুর আজ্ঞায় চল্লিশ বৎসরের অধিক এই শ্মশানে বাস করিতেছেন। দয়ানন্দের গুরু এই স্থানেই সিদ্ধ হইয়াছিলেন। যাইবার সময় গুরু দয়ানন্দকে বলিয়া যান, "বাবা! যতদিন না মায়ের কৃপাদেশ পাও, তত দিন এই স্থলে থাকিয়া মায়ের সেবা কর। যথাসময়ে আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।" সেই হইতে দয়ানন্দ এই শ্মশানে বাস করিয়া মায়ের সেবা করিতেছেন। মুণ্ডেশ্বরীর মন্দিরের পাষাণ-নির্ম্মিত সোপানাবলী উচ্চ-পার্ব্বতীয় পথের ন্যায় ক্রমান্বয়ে দ্বারকেশ্বরের গভীর জলে মিশিয়া গিয়াছে। এই সোপানাবলীর শেষ কোথা, তাহা এ

পর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারে নাই। বুঝি দয়ানন্দও জানেন না, এই সোপানাবলী দ্বারকেশ্বরের কোন্ গভীর দেশ হইতে উত্থিত হইয়াছে। এই সোপানাবলী সম্বন্ধে নানা-প্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে: কেহ বলে, পাতালদেশ হইতে মা মুণ্ডেশ্বরী এই মন্দিরে যাতায়াত করেন। কেহ বলে জলদেবতা ও যক্ষগণ পাতাল প্রদেশ হইতে এই সোপানা-বলী দিয়া মায়ের মন্দিরে আসিয়া থাকেন। মুণ্ডেশ্বরীর পাষাণ-নির্ম্মিত মন্দিরের চূড়া দুইক্রোশ দূর হইতে পথিক-দের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মন্দিরটি কত বৎসরের নির্ম্মিত, ইহা মনুষ্য-নির্ম্মিত কি না, তাহার এ পর্যান্ত মীমাংসা হয় নাই। এই মন্দির ও শ্মশানের চতুস্পার্শে দুই ক্রোশের মধ্যে মানুষের বসবাস নাই। কেবল শব-দাহের সময় মনুষ্য-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। দয়া-নন্দকে দিবাভাগে কেহই দেখিতে পাইত না। মন্দিরের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া সমস্ত দিন তিনি ধ্যান ও যোগাদি ক্রিয়ায় অতিবাহিত করিতেন। ইনি কখন কাহার সহিত কথা কহিতেন না। এই দেশে সকলেই দয়ানন্দকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া জানিতেন। দয়ানন্দ সম্বন্ধে দেশে নানা-প্রকার জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। কেহ বলিত, সন্ন্যাসী মরা মানুষ বাঁচাইতে পারেন। কেহ বলিত, ইনি মুণ্ডেশ্বরী মাতার সঙ্গে কথা কহেন, কেহ বলিত, ইহার ক্রোধে

মনুষ্য ভস্ম হইয়া যায়। কেহ বলিত, ইনি কৃপা করিয়া যাহাকে যাহা বর দেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাই ফলিয়া থাকে। দয়ানন্দ নিরাহারে থাকেন, ইহাই এই প্রদেশের অধিকাংশ ব্যক্তি বিশ্বাস করিত। কেহ কেহ বলিত, সন্ন্যাসী গভীর রাত্রে সামান্য ফলাদি আহার করেন। তিনি সর্ব্বদা আত্ম-গোপন করিয়া থাকিতেন। এই জন্য প্রকৃত সংবাদ কেহই জানিতে পারিত না। মন্দির হইতে সুন্দর প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানাবলী দ্বারকেশ্বরের গভীর জলে মিশিয়াছে। এই সোপানাবলী দিয়া এক দয়ানন্দ ব্যতীত তৎকালীন অপর কেহ অবতরণ করিতে সাহস করিত না। যাহারা শবদাহ করিতে আসিত, তাহাদের জন্য মন্দির হইতে কিঞ্চিৎ দূরে পৃথক ঘাট ছিল।

রজনীর তৃতীয় যাম অতীত হইয়া গিয়াছে। ঘোর অন্ধকার রজনী। দয়ানন্দ নিত্য এই সময় স্নান করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন। "মাগো তারা! আর কতকাল বালকের ন্যায় ভুলাইয়া রাখিবি মা?" এই বলিয়া দয়ানন্দ স্নান করিবার জন্য ঘাটে অবতরণ করিলেন। স্নান শেষ হইলে দয়ানন্দ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে করযোড়ে মায়ের কাছে বলিতে লাগিলেন, "মাগো! বহু জন্ম ঘুরিয়েছি, আর কত জন্ম ঘুরিলে তোর দয়া হইবে মা? কর্ম্ম ফলের কি এখনও শেষ হয় নাই? এখনও কি

আমায় তোর সত্য রূপ দেখাইবি না মা? তোর যে জ্যোতিঃ দেখিয়া আমার গুরুদেব ধন্য হইয়াছেন, সে জ্যোতিঃ দেখিয়া দয়ানন্দ কবে ধন্য হইবে মা?” দয়ানন্দের ক্রন্দনের সুর সপ্তমে উঠিতে লাগিল। অকস্মাৎ দয়ানন্দ চমকিয়া উঠিলেন! একি! একসঙ্গে দুইটি শবদেহ ভাসিয়া যাইতেছে! ঘোর অন্ধকারে প্রজ্জলিত চিতার আলোকে দ্বারকেশ্বরের অনেক দূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়াছে। দয়ানন্দ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিয়া লইলেন. এক সঙ্গে দুইটি স্ত্রীলোক বন্ধন অবস্থায় ভাসিয়া যাইতেছে। দয়ানন্দ ভাবিতে লাগিলেন. বোধ হয় দৈব দুর্ঘটনায় দ্বারকেশ্বরের জলে স্ত্রীলোক দুইটি প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। আবার ভাবিলেন, একসঙ্গে এরূপ বন্ধন অবস্থায় ভাসিয়া যাইতেছে কেন? দয়ানন্দ যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই নূতন নূতন চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। এদিকে শব দুটিও খরস্রোতে ভাসিয়া তাঁহার দৃষ্টির অন্তর্হিত হইতেছে দেখিয়া, গভীর জলে ঝম্প প্রদান করিয়া স্রোতের মুখে স্ত্রীলোক দুটির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দয়ানন্দ যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন; স্ত্রীলোক দুটি ততই দ্বারকেশ্বরের প্রবল স্রোতে দূর হইতে অতি দূরে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অতি কষ্টে বহুদূরে গিয়া দয়ানন্দে স্ত্রীলোক দুটিকে ধরিতে সক্ষম হইলেন।

দয়ানন্দ স্ত্রীলোক দুটিকে ধরিতে পারিলেন বটে, কিন্তু দ্বারকেশ্বরের প্রবল স্রোতের মুখ হইতে তীরে উঠিতে তাঁহার ন্যায় মহাবলবান, সন্তরণপটু ঊর্দ্ধরেতা, সংযমী ব্রহ্মচারীকেও মহাবেগ পাইতে হইল। বহু চেষ্টা, কৌশল ও শক্তি প্রয়োগের পর স্ত্রীলোক দুটিকে লইয়া দয়ানন্দ যখন সোপনাবলীতে উঠিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বশরীর থর থর কম্পিত হইতে লাগিল।

মন্দির-সম্মুখে একখানি প্রশস্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর স্ত্রীলোক দুটিকে স্থাপন করিয়া দয়ানন্দ মন্দির হইতে প্রজ্জলিত ঘৃত প্রদীপটি লইয়া আসিলেন। দীপালোকে দয়ানন্দ শবদেহ দুটি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। "মা গো! আজ আবার তোর সন্তানকে একি বিভীষিকা দেখাইলি মা?" এই বলিয়া একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া আবার শবদেহ দুটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এবার দয়ানন্দের আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দয়ানন্দ দেখিলেন, অনুমান একটি দ্বাদশ বৎসরের বালিকা ক্ষুদ্র গৈরিক বসনদ্বারা একটি ত্রিংশত বর্ষীয়া স্ত্রীলোকের নিজ কটীদেশে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়াছে। স্ত্রীলোকটীর বক্ষঃস্থলে একটি চারি বৎসরের শিশু। স্ত্রীলোকটি দুইহস্তে শিশুটিকে দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়া রহি-য়াছে। দয়ানন্দ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "মাগো!

এমন করিয়া তিনটি মৃতপ্রাণী দয়ানন্দের হাতে তুলিয়া দিলি কেন মা?” দয়ানন্দ ভাবিতে লাগিলেন, “স্ত্রীলোকটি নিশ্চয়ই শিশুর জননী, অতুলনীয় জননী-স্নেহ ব্যতীত মৃত্যুসময়ে কেহ সন্তানকে এরূপ অবস্থায় বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। আহা! কে এই বালিকা? বালিকা পরের জীবনের জন্য নিজ জীবন দ্বারকেশ্বরে বিসর্জ্জন দিয়াছে!”

“বালিকা! তুমি অধম দয়ানন্দকে মনুষ্য-জীবনের চরম শিক্ষা প্রদান করিলে। এই দৃঢ়বন্ধন বালিকার স্বহস্তরচিত। দয়ানন্দের হস্ত বুঝি বালিকার এই বন্ধন উন্মুক্ত করিবার উপযুক্ত নয়। সন্তানের জননী নিজকে বালিকার সহিত দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে, এ অনুমান সঙ্গত নহে। স্ত্রীলোকটী জীবিত অবস্থাতেই সন্তানটিকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিল। বালিকার পূর্ব্বেই স্ত্রীলোকটি সন্তানসহ জলমগ্ন হইয়াছে, কারণ বালিকার বহু পূর্ব্বেই স্ত্রীলোকটির মৃত্যুচিহ্ন দেহে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বালিকা স্ত্রীলোকটিকে বাঁচাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছে সন্দেহ নাই। তীরে উঠাইবার জন্য সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় বালিকা অন্তিম সময়েও হতাশ না হইয়া নিজ কটিদেশে স্ত্রীলোকটিকে বন্ধন করিয়া অবশ ক্লান্ত দেহে সন্তরণের সুবিধা করিয়া লইয়াছে? বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া

সংসার-আসক্তিহীন, সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান দয়ানন্দের চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

দয়ানন্দ এইবার লাফাইয়া উঠিলেন! দয়ানন্দ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মাগো! আবার কেন দয়ানন্দকে চরণ ছাড়া করিস্? কেন মা! দয়ানন্দের নয়ন দিয়া অশ্রুধারা দেখিতে ইচ্ছা করিস্?" দয়ানন্দ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "গুরুদেব! জলমগ্ন ব্যক্তির জীবনদানের জন্য যে প্রক্রিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন, আপনার গুণে সেই শিক্ষার পরীক্ষা দিবার সময় উপস্থিত। যদি দাস প্রক্রিয়ার কোনস্থলে দোষ ঘটে, প্রভু! তবে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনার প্রদত্ত বিদ্যা হৃদয়ে উন্মেষ করিয়া দিন।"

দয়ানন্দ শিশু ও শিশুর জননীর জীবনে হতাশ হইলেও বালিকার জীবনে ততদূর হতাশ হন নাই। তিনি দ্রুতগতি স্ত্রীলোকটির পদ বন্ধন করিয়া নিম্নমুখে মন্দির-সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখিলেন। শিশুটিকেও তদ্রূপ অবস্থায় রাখিয়া দিয়া ত্বরিত হস্তে বালিকাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া শূন্যে ঘুরাইতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ঘুরাইবার পর চক্ষের নিমিষে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া তৎপার্শ্বে বালিকাকে শয়ন করাইলেন। স্ত্রীলোক ও শিশুটিকেও পূর্ব্বের ন্যায় শূন্যে ঘুরাইয়া অগ্নিপার্শ্বে স্থাপন

করিয়া দয়ানন্দ মন্দির-পশ্চাতে ভীষণ অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন দয়ানন্দ অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন তাঁহার ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বহিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া গিয়াছিল। দয়ানন্দের মুখ বিবর্ণ। দয়ানন্দকে দেখিয়া মনে হইতেছে, অরণ্য প্রবেশ করিয়া অতি গুরুতর পরিশ্রমে নিযুক্ত ছিলেন। কয়েকটি বড় বড় মূল, কতকগুলি শ্বেতবর্ণের লতা ও কতকগুলি বিভিন্ন বর্ণের পত্র লইয়া দয়ানন্দ অগ্নির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শ্বেতবর্ণের লতাগুলি হস্তে মর্দ্দণ করিয়া তাহার রস অতি সুকৌশলে বালিকা, স্ত্রীলোক ও শিশুটির নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। মূল ও বিভিন্ন বর্ণের পত্রগুলির রস অতি সুকৌশলে ত্বরিত হস্তে নির্গত করিয়া বালিকা ও মাতাপুত্রের সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। এইবার দয়ানন্দ নানারূপ প্রক্রিয়া দ্বারা কখন বালিকাকে উঠাইয়া বসাইতেছেন,—কখন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাইয়া শয়ন করাইতেছেন—কখন হস্তে ঘর্ষণ করিতেছেন—কখন বালিকার দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া আবার বক্ষে স্থাপন করিতে লাগিলেন। দয়ানন্দ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একবার বালিকাকে, একবার স্ত্রীলোক ও শিশুটিকে লইয়া তাহাদের জীবনী-শক্তি আনিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন।

দয়ানন্দের মুখমণ্ডল কখন আহ্লাদে উদ্ভাসিত, আবার পরক্ষণে বিষাদে পরিপূর্ণ। দয়ানন্দ আবার লম্ফ প্রদান করিয়া ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন—আবার বহুক্ষণ পরে কতকগুলি বৃক্ষমূল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। হস্তে ঘর্ষণ করিয়া বৃক্ষমূলের রস নাসিকায়, কর্ণরন্ধ্রে সুকৌশলে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার অরণ্যে প্রবেশ করিলেন—আবার কি লইয়া আসিয়া অভিনব প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। প্রতি দণ্ডে দয়ানন্দ নব নব প্রক্রিয়া আরম্ভ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জীবন-সঞ্চারের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলেন না। সমস্ত রজনীই এই ভাবে অতীত হইয়া গেল।

ঊষাদেবীকে ধীরে ধীরে অবনীমণ্ডলে পদার্পণ করিতে দেখিয়া বিহগকুল মনের আনন্দে প্রভাত-গীতি গাহিতে লাগিল। দ্বারকেশ্বরের তীরের অন্ধকাররাশি ঊষাগমে ত্বরিতপদে দ্বারকেশ্বরতীরস্থ বিজন অরণ্যে আত্মগোপন করিবার জন্য গমন করিতে লাগিল। পূর্ব্বগগন ধীরে ধীরে লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়া দিনমণির আগমন-সংবাদ জগতবাসীর নিকট ঘোষণা করিতে লাগিল। দয়ানন্দ একবার পূর্ব্বাকাশে চাহিয়া আকুল-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"মা গো! দয়ানন্দের গণা দিনের একটা দিন গেল, আবার একটা দিন আসিল। দেখিতে দেখিতে

এইরূপে সব কয়টা দিন ফুরাইয়া যাইবে। দয়ানন্দের কাজ ত কিছুই হইল না মা! আবার কি মা, দয়ানন্দকে জঠরে ঢুকাইয়া মজা দেখিবি?"

দয়ানন্দের মুখমণ্ডলে আনন্দ-চিহ্ন প্রকটিত হইল। তিনি মৃদুহাস্যে বালিকা ও মাতাপুত্রের নাসিকারন্ধ্রে অঙ্গুলি দিয়া সযত্নে বহুক্ষণ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এইবার দয়ানন্দ আনন্দে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। দয়ানন্দের হাস্যরবে দ্বারকেশ্বরের তটভূমি ও বিজন অরণ্য প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ক্ষণেক পরে তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রুধারায় দয়ানন্দের লোমরাজীপূর্ণ প্রশস্ত বক্ষঃস্থল আর্দ্র হইয়া গেল। দয়ানন্দ রোদন করিতে করিতে বলিতেছেন,—

"মা! তুই কি দয়ানন্দের মা নস্? তবে পুত্র দয়ানন্দকে ছাড়িয়া এতক্ষণ কোথায় ছিলি মা? তুই আসিতে এত বিলম্ব করিলি? দয়ানন্দকে এত দুঃখ দিলি? কেন মা! দয়ানন্দ কি তোর ছেলে নয়?" দয়ানন্দের আবার উচ্চহাস্য! চল মা দয়ানন্দের সঙ্গে চল! নিভৃত স্থান ব্যতীত সূক্ষ্ম ক্রিয়া অসম্ভব। দয়ানন্দ তিনটি শবদেহ স্কন্ধে ও বক্ষঃস্থলে তুলিয়া দ্বারকেশ্বর-তীরে মন্দির পার্শ্বস্থ বিজন অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুইদিন দয়ানন্দ সেই বিজন অরণ্য হইতে বহির্গত হইলেন না। দুইদিন পরে

দয়ানন্দ রজনীর মধ্যম যামে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য একবার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কি ভীষণ দৃশ্য! দয়ানন্দ আর সে দয়ানন্দ নহে! দয়ানন্দের সেই মহাবলিষ্ঠ দেহ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে! দেহ অবসন্ন, শক্তিহীন! দয়ানন্দের দেহের সে বর্ণ ও জ্যোতিঃ নাই—দয়ানন্দের দেহ রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণ, স্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়াছে। দয়ানন্দ কম্পিত-দেহে পাষাণ-মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগি-লেন,—"মা গো! দয়ানন্দ শরীরের সমস্ত শক্তি শবদেহে অর্পণ করিয়াছে, যে রক্তবিন্দুগুলি দয়ানন্দ দেহে ধারণ করিয়া আছে, তাহা দয়ানন্দের জীবন-ধারণের জন্য। আরও কয়েক মুহূর্ত্ত দেখিয়া দয়ানন্দ শেষ রক্তবিন্দু শব-দেহে অর্পণ করিবে। দয়ানন্দ এবার তোর ক্রোড়ে উঠিবে, দয়ানন্দের ভবের খেলা শেষ হইল, আর দয়ানন্দের ভয় নাই।"

মন্দিরের ঘৃত-প্রদীপটি হস্তে লইয়া দয়ানন্দ মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
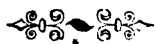
আজ অরণ্যবাসী মিকির-রমণী ও তাহাদের স্বামী-পুত্রগণের আনন্দের সীমা নাই। অর্দ্ধ-উলঙ্গ মিকির-রমণী-গণ কেহ শিশু ক্রোড়ে লইয়া, কেহ হরিণ ও বরাহ-শাবক স্কন্ধে লইয়া আনন্দ উৎফুল্ল-হৃদয়ে অরণ্য-প্রান্তে দ্বারকেশ্বরের বালুকারাশির উপর ছুটাছুটি করিতেছে। বহুদূরে দ্বারকেশ্বরের স্রোতে তীরবেগে একত্রে সংলগ্ন কয়েকখানি নৌকা ভাসিয়া আসিতেছে, সকলেই অনিমেষ নয়নে সেই নৌকার দিকে চাহিয়া আনন্দ-কোলাহল করিতেছে। মিকির শিশুগণ তাহাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের আনন্দ মুখে ব্যক্ত করিতে না পারিয়া অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তাহাদের জননী-দিগকে নৌকা দেখাইয়া হৃদয়ের আনন্দ ব্যক্ত করিতেছে। যুবতী মিকির রমণীগণ যে প্রিয়জন সন্দর্শনের আশায় দিন গণনা করিতেছিল, প্রৌঢ় মিকির-ধরণীগণ যাহার অদর্শন-ব্যথা বুকে লইয়া দ্বারকেশ্বরের গভীর জলরাশির দিকে তাকাইয়া ছিল, আজ বুঝি তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। মিকির-রমণীগণ আরও কি বলাবলি করিতেছে, তাহারা এমন মনুষ্য কখন দেখে নাই। তাহাদের স্বামী

পুত্রগণ কোথা হইতে এমন মনুষ্য ধরিয়া আনিল। সকলেই আনন্দ কৌতুহলচিত্তে দ্বারকেশ্বর মাঝে নৌকার দিকে চাহিয়া আছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাহারই চক্ষের পলক পড়িতেছে না।

কতকগুলি অর্দ্ধউলঙ্গ মিকির অরণ্য মধ্যে বন্যপশু শিকারের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা শিকার ফেলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া এই আনন্দের হাটে মিশিয়া গেল। দ্বারকেশ্বরের তীরে এই অরণ্য বহু ক্রোশব্যাপী এবং ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে এই জন-শূন্য অরণ্যের ভীষণত্ব প্রকাশ করিতেছে। মুণ্ডেশ্বরীর মন্দির হইতে এই অরণ্য কত দিনের পথ এবং অরণ্য দীর্ঘ প্রস্থ কত সহস্র ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই নির্ণয় করিতে পারে নাই। এই অরণ্য মধ্যে যে সব নরাকৃতি পশুকে বিচরণ করিতে দেখা যায়, তাহাদের নাম আজও পর্য্যন্ত জন-সমাজে শুনিতে পাওয়া যায় না। এক প্রকার ভীষণাকার গো এই অরণ্যে বাস করে, তাহাদের আকৃতি গৃহপালিত গরুর ন্যায়, কিন্তু শৃঙ্গ অতি বৃহৎ। এই বন্য গো ব্যাঘ্রকেও ভয় করে না। ইহারা ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া হিংস্র ব্যাঘ্রকে প্রাণে মারিয়া ফেলে। হরিণ, বন্যমহিষ ও বন্যবরাহ এই অরণ্যে অত্যধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যার

প্রাক্কালে—সূর্য্যদেব অস্তগমনের সময় যখন ছোট ছোট হরিণশিশুগুলি অরণ্য হইতে বাহির হইয়া দ্বারকেশ্বরের বালুকারাশির উপর খেলা করিয়া বেড়ায়, যখন বন্যমহিষ ও বন্য গো সকল দলে দলে দ্বারকেশ্বরের সুনির্ম্মল জল-পান করিতে আসে, দ্বারকেশ্বরের অপর পার হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে. ভগবানের রাজ্যে ভীষণ হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যের মাঝেও প্রাণারাম অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়া তাঁহার চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিতে ইচ্ছা হয়।

এই অরণ্যেই বন্যজাতি মিকিরগণ বৃক্ষোপরি বাস করিয়া থাকে। মিকির জাতি জঙ্গলের মধ্যে মনোমত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া বৃক্ষের উপর নিজেদের বাস-গৃহ নির্ম্মাণ করে। মিকিরেরা যে স্থানে বাস করে, সেই স্থানকে মিকির বস্তি বলে। ইহারা একসঙ্গে কুড়ি পঁচিশ ঘরের অধিক বাস করে না। একটি মিকির বস্তি হইতে অন্য "মিকির বস্তি" অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে অব-স্থিত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ইহারা এক প্রকার উলঙ্গ অবস্থায় থাকিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৃক্ষের ছোট ছোট বল্কল কটিদেশের সম্মুখে বেষ্টিত থাকিত। স্ত্রীলোকদেরও প্রায় তদ্রূপ। অরণ্যের যেস্থানে অধিক পরিমাণে সুদীর্ঘ বৃক্ষ দেখিতে পায়, সেই স্থানকেই

ইহারা বাসস্থানের উপযুক্ত মনে করিত। চারি কোণে চারিটি বৃহৎ বৃক্ষ রাখিয়া অবশিষ্ট বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলিত। এই চারিটি বৃক্ষই ইহাদের গৃহের ভিত্তি! এই চারিটি বৃক্ষের উপর আড়াআড়ি অন্য বৃক্ষ ফেলিয়া তাহার উপর ইহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিত। বন্যহস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই ইহারা এই প্রণালীতে গৃহ নির্ম্মাণ করিত। ভগবান ইহাদের প্রাণরক্ষার জন্য অরণ্যেই যথেষ্ট খাদ্য-সামগ্রী সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। এক প্রকার লম্বা লম্বা মূল ইহাদের প্রধান খাদ্য! এই মূল অতি সুস্বাদু এবং মধুর রসে পূর্ণ। এই মূল বিনা যত্নে দূর্ব্বাদলের ন্যায় যথেষ্ট পরিমাণে অরণ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা বন্যপশু শিকার করিয়া ও অরণ্য মাঝে মৃতপশু অনুসন্ধান করিয়া চর্ম্মাদি সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং প্রতি বৎসর একবার লোকালয়ে যাইয়া দ্বারকেশ্বরের মাঝে নৌকাতেই সে সমস্ত বিক্রয় করিয়া ফেলে;—নৌকা হইতে কখন লোকালয়ে প্রবেশ করে না। ইহারা অতি সরল প্রকৃতি, মিথ্যা কপটতা ইহারা একেবারেই জানে না। ইহারা পশুচর্ম্ম বিক্রয় ও লোকালয়ে যাইবার জন্য এক প্রকার নৌকা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই নৌকা বিভিন্ন প্রকৃতির; একটি মাত্র বৃহৎ বৃক্ষের গুঁড়ি হইতে ইহারা একখানি

নৌকা প্রস্তুত করে। এইরূপ নৌকা একসঙ্গে দশ বার খানি একত্রিত করিয়া বৎসরে একবার মাত্র পশুচর্ম্ম লইয়া বাণিজ্যে বহির্গত হয়। দ্বারকেশ্বর নদীই ইহাদের বাণিজ্যের স্থান। মৃগের চর্ম্ম ও শৃঙ্গ, হস্তি দন্ত, ভল্লুক ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম ইত্যাদিতে নৌকা পূর্ণ করিয়া ইহারা যখন লোকালয়ে বিক্রয় করিতে যায়, ধর্ম্মভীরু মহাজনদের তখন আনন্দের সীমা থাকে না। ইহারা দরদস্তুর জানে না। তত্রাচ ব্যবসায়ীরা বিংশতি মুদ্রা মূল্যের দ্রব্যের পরিবর্ত্তে দুই এক টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি দিয়া শঠতা ও প্রবঞ্চনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

মিকিরেরা বাণিজ্য করিয়া মনের আনন্দে দ্বারকেশ্বরের স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দিয়াছে। পবনবেগে নৌকা ছুটিতেছে। আর দুই দিন এই ভাবে নৌকা চলিলেই তাহাদের প্রিয় জন্মভূমি—"স্বর্গাদপি গরিয়সী" দ্বারকেশ্বরের অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহারা নিজ ভাষায় "দ্যাং কোং নং কং" ইত্যাদি কত কথা কহিতে কহিতে মনের আনন্দে আসিতেছে। কেহ বলিতেছে, "ভাই, এই ভাবে দ্রুত নৌকা চালাইতে পারিলে আমরা আর দুইদিন পরেই অরণ্যে গিয়া স্ত্রী পুত্রের মুখ দর্শন করিতে পাইব।" কেহ বলিতেছে, 'ভাই! এত দেশ দেখিয়া আসিলাম, আমাদের প্রিয় জন্মভূমির

ন্যায় আর কোন দেশই দেখিলাম না।" কেহ বলিতেছে, "আমাদের সাধের জন্মভূমি—আমাদের পিতা পিতামহের জন্মস্থান, ইহার তুলনায় আর কোন্ দেশ আছে ভাই! যে জন্মভূমির ফল, জল, আহার, পানে আমরা মানুষ হইয়াছি, সে জন্মভূমি আমাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়! অন্য দেশ যতই ভাল হউক, আমাদের জন্মভূমি এই অরণ্যের সহিত কোন দেশেরই তুলনা হয় না! অন্য দেশ স্বর্গ তুল্য হইলেও আমাদের জন্মভূমি স্বর্গাপেক্ষা বড।" মিকির নৌকা স্রোতের মুখে তীরবেগে ছুটিতেছে; নৌকারোহী মিকিরগণ জন্মভূমির গুণগাথা গাহিতে গাহিতে মনের আনন্দে ভাসিয়া আসিতেছে। এমন সময় তাহারা দেখিতে পাইল, একটি মনুষ্যমূর্ত্তি একখানি বৃহৎ শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডে নিজ দেহের ভার অর্পণ করিয়া অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে। মিকিরগণ মনুষ্যমূর্ত্তিকে এইরূপ অবস্থায় ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া সকলেই নৌকা হইতে কোলাহল করিয়া উঠিল। একজন বয়োবৃদ্ধ মিকির বলিল, "চল ভাই! আমরা লোকটিকে নৌকায় উঠাইয়া লই।" একজন বলিল, "ওটা মরা মানুষ, নৌকায় উঠাইয়া কি হইবে?" অপর সকলে বৃদ্ধের কথা মত লোকটিকে নৌকায় লইবার জন্য চেষ্টা করিতে বলিল। অবিলম্বে সকলেই

একযোগে পবনবেগে নৌকা চালাইয়া লোকটিকে ধরিতে প্রয়াস পাইল।

মিকিরগণ দেখিল, একটী জ্ঞানহীন উলঙ্গ যুবক মুদিত নেত্রে একখণ্ড বৃহৎ শুষ্ক কাষ্ঠের উপর শবের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। যুবকটি মৃত কি জীবিত, তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় নাই। মিকিরগণ দয়ার্দ্রচিত্তে যুবককে নৌকায় তুলিয়া সুশ্রূষা করিতে লাগিল। বহুক্ষণ সেবা-সুশ্রূষার পর যুবক চক্ষুরুন্মীলন করিয়া মিকিরদের মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। যুবকের জ্ঞানসঞ্চারে মিকিরগণ আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল।

পাঠকগণকে বোধ হয় বলিতে হইবে না, এই যুবকটী কে? এই যুবক আমাদের শঙ্করদেব! শঙ্করদেবের যখন সর্ব্বাঙ্গ অবশ ও হস্তপদ শিথিল হইয়া আসিল, যখন হস্তপদ সঞ্চালনের ক্ষমতা একবারে তিরোহিত হইয়া গেল, তখন তিনি অবশ অঙ্গে স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন। শঙ্কর ভাবিতে লাগিলেন, দ্বারকেশ্বর বক্ষে এইবার আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। শঙ্কর নিমীলিত নেত্রে স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আকুল প্রাণে ভগবানের চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিলেন। শঙ্কর ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে ভগবানকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো! আপনার চরণে আমার অন্তিম প্রার্থনা, সরলা বালিকা তুলসীকে রক্ষা

কর। আহা! পরের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া তুলসী নিজ প্রাণ দ্বারকেশ্বর বক্ষে বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হইয়াছে। প্রভো! নিরাশ্রয়া, সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা, সরলা বালিকা তুলসীকে আপনি রক্ষা না করিলে এই ভীষণ দ্বারকেশ্বর স্রোতে আর কে রক্ষা করিবে দয়াময়! আমি আপনার চরণ ধ্যান করিতে করিতে সুখে দ্বারকেশ্বর বক্ষে জীবন ত্যাগ করিব, কিন্তু প্রভো! তুলসীকে যে রক্ষা করিতে পারিলাম না, ইহা যে আমার হৃদয়ে চিরদিন তীক্ষ্ন শেলসম বিদ্ধ রহিবে। আপনার চরণ ধ্যান করিয়া দ্বারকেশ্বর বক্ষে আরও বহুক্ষণ যুঝিতে পারিতাম, কিন্তু প্রভো! এই ভীষণ শেলে আমার বক্ষ পঞ্জর এক একটি করিয়া ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। এইবার বুঝি মরিলাম প্রভো!" একটা প্রবল স্রোত শঙ্করের উপর দিয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর ডুবিয়া আবার কিয়ৎদূরে গিয়া ভাসিয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময়ে অরণ্যের একখানি বৃহৎ শুষ্ক কাষ্ঠ কোথা হইতে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া শঙ্করের পার্শ্ব দিয়া স্রোতমুখে যাইতে লাগিল। শঙ্কর কাষ্ঠখণ্ড দেখিয়া অতি কষ্টে তদুপরি নিজ দেহ স্থাপন করিয়া ভাসিয়া চলিতে লাগিলেন। দেশের পর দেশ অরণ্যের পর অরণ্য পশ্চাতে ফেলিয়া শঙ্কর ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ক্ষুধা চিন্তায় তৃতীয় দিবসে শঙ্কর চৈতন্যহারা

হইয়া কাষ্ঠখণ্ডের উপর মৃতের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। পঞ্চম দিবসের প্রাতঃকালে মিকিরিরা শঙ্করকে নৌকায় তুলিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। শঙ্কর মিকিরদের মুখের দিকে চাহিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞানোদয়ের সহিত স্মৃতিও জাগিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। তুলসীর শোচনীয় মৃত্যুর কথা ভাবিয়া শঙ্কর শিহরিয়া উঠিলেন ; ক্ষীণদেহ শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, আবার চেতনালুপ্ত হইল। শঙ্করকে আবার চেতনা হারাইতে দেখিয়া, সরলপ্রাণ মিকিরগণের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনাহারে যুবকের বার বার মূর্চ্ছা হইতেছে ভাবিয়া মিকিরদের নৌকায় লতামূল ও অরণ্যের সুস্বাদু ফল যাহা কিছু ছিল, যুবককে আহার করাইবার জন্য সকলেই যত্ন করিতে লাগিল। মিকিরদের সেবা যত্নে ও কয়েক দিন অনাহারের পর কিঞ্চিৎ আহার পাইয়া শঙ্কর অনেকটা সুস্থ হইলেন।

অরণ্যবাসী মিকিরদের সহৃদয়তায় শঙ্করদেব কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহাদের মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। শোকে ও দুঃখে শঙ্করের হৃদয় স্ফীত হইয়া অজস্র অশ্রুধারা শঙ্করের বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। শঙ্করের নীরব শোকোচ্ছ্বাস যেন মিকিরদিগের বলিতেছে, "তোমরা

আমার জীবন রক্ষা না করিয়া যদি তুলসীর জীবন রক্ষা করিতে পারিতে, তবে ভগবানের কাছে অশেষ পুরস্কার লাভ করিতে পারিতে। আহা! সরল-হৃদয়া বালিকা তুলসী সংসারে থাকিলে আদর্শ রমণীর উচ্চ আসন অধিকার করিত;—সংসার-সাগরে বুদ্‌বুদের ন্যায় ভাসিয়াই গভীর জলে মিশিয়া গেল। আহা! সেই ক্ষুদ্র বালিকা হৃদয়ে দয়া, স্নেহ, ভক্তি, পরোপকারস্পৃহা অতিমাত্রায় ছিল বলিয়াই বুঝি ক্ষুদ্র দ্বারকেশ্বর নদী মহান্ পবিত্র হৃদয়ের ভার সহনে অসমর্থ হইয়া অতল জলে ডুবাইয়া দিল। তুলসী! কেন তুমি আমার সঙ্গে সন্ধ্যাবায়ু সেবনের জন্য দ্বারকেশ্বর তীরে আসিয়াছিলে? একা আশ্রমে ফিরিয়া না গিয়া কেন আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলে? হায়! হায়! শেষে আমিই তোমার মৃত্যুর কারণ হইলাম।”

উদ্বেগ ও চিন্তায় শঙ্করদেব দুইদিন দুইরাত্রি মিকিরদের নৌকায় যাপন করিলেন। তৃতীয় দিবসে যখন মিকিরদের নৌকা তাহাদের চিরা আরাধ্য জন্মভূমি দ্বারকেশ্বর তীরের ভীষণ অরণ্যের নিকট পৌঁছিল, তখন অন্যান্য মিকিরেরা মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়দিগকে গৃহাগত দেখিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। অভিনব মানব শঙ্করদেবকে দেখিয়া মিকির-রমণীগণ আশ্চর্য্য হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মিকিরনৌকা তীরে লাগিলে মিকির-রমণীগণ সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিল, পরে নবাগত প্রিয়দর্শন যুবকের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিয়া শঙ্করকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। শঙ্কর ইহাদের ভাষা ও মনোভাব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কৌতুহলদৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শঙ্কর একবার ভাবিলেন, দ্বারকেশ্বরে মৃত্যু না লিখিয়া বিধাতা বুঝি বন্যের হস্তেই আমার মৃত্যু লিখিয়াছেন। আবার ভাবিলেন, আমার জীবনবিনাশই যদি ইহাদের উদ্দেশ্য হইত, তবে এত যত্ন করিয়া কেন ইহারা আমার জীবন রক্ষা করিবে? তবে কি আমার জীবন রক্ষা করিয়া এখানে আনিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে? শঙ্কর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "ভগবান, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

মিকিরেরা যখন শঙ্করের অবস্থা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিল, তখন সকলেই করুণ-দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে চাহিয়া রহিল। সন্তানের জননীগণ পুত্র-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া ভাবিতে লাগিল, "আহা! এই সন্তানের জননী পুত্রহারা হইয়া কতই না ব্যাকুলচিত্তে রোদন করিতেছে।" অল্পবয়স্ক মিকির-সন্তানগণ শঙ্করকে অভিনব বন্যপশুর ন্যায় তাহাদের খেলার সামগ্রী মনে করিয়া কেহ যাইয়া হাত ধরিল, কেহ মস্তকের লম্বা কেশগুলি লইয়া আকর্ষণ করিতে

লাগিল, কেহ বা আধ আধ ভাষায় আদরের কথা বলিয়া শঙ্করের মুখচুম্বন করিতে লাগিল। সন্তান-জননীগণ শঙ্করকে তাহাদের আবাসে লইয়া গিয়া সন্তান-নির্ব্বিশেষে স্নেহ যত্ন করিয়া মনস্তুষ্টির জন্য কত কথা বলিতে লাগিল। শঙ্কর ইহাদের ভাষা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বন্য-জাতির সৌজন্যতায় মুগ্ধ হইয়া বারবার ভগবানের চরণে আশ্রয়দাতাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শঙ্কর ও তুলসী রাত্রিকালে আশ্রমে আগমন না করায়, শরৎকুমারী ও তুলসীর জননী উদ্বিগ্নচিত্তে তাহাদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রজনীর তৃতীয় যাম অতীত হইয়া গেল, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীগণ ভগবানের স্তোত্র গাহিতে গাহিতে স্নানার্থে বহির্গত হইলেন। কৃষ্ণমোহন, দুর্গাপ্রসন্ন ও রামতনু সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের যুবক ও বালকগণকে লইয়া স্নানার্থে গমন করিয়াছেন। শরৎকুমারী আশ্রমের সমস্ত বিভাগে অনুসন্ধান লইলেন, কোথাও শঙ্কর বা তুলসীর সংবাদ পাইলেন না। শরৎকুমারীর উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শরৎকুমারী জানিতেন যে, শঙ্কর তুলসীকে সহোদরাপেক্ষাও স্নেহ করে। তুলসী কোন বিপদে পড়িলে শঙ্করের স্বভাবসিদ্ধ সুপবিত্র হৃদয়ের উত্তেজনায় তুলসীর অগ্রে সে সেই বিপদকে হাসিতে হাসিতে আলিঙ্গন করিয়া তুলসীকে রক্ষা করিবে। কিন্তু উভয়েই যদি কোনরূপ বিপদে পড়িয়া থাকে, তবে কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে? শরৎকুমারী মুদ্রিতনেত্রে ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান সর্ব্বজ্ঞ,

তিনি কোন্ স্থানে নাই? তিনিই তুলসী ও শঙ্করকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। হে ভগবান! বিপদের সময় আমরা বৃথা চিন্তা করিয়া নারী-হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করি। আপনার ইচ্ছায় জগৎ চলিতেছে, আমাদের ক্ষুদ্র ইচ্ছাশক্তি বা চিন্তা আপনার মঙ্গল ইচ্ছার নিকট অগ্রসর হইতে পারে না। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আপনার মঙ্গল ইচ্ছাকে অশুভ ভাবিয়া ব্যথিত হৃদয়ে চীৎকার করি, কিন্তু দয়াময়! সেই অশুভের মধ্যেই মঙ্গলের অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায়! জানি না দয়াময়! তুলসী ও শঙ্করকে আপনার রাজ্যে কোথায় কি অবস্থায় রাখিয়াছেন। শরৎ-কুমারী বহুক্ষণ ভগবানের চরণে মনোনিবেশ করিয়া তুলসী ও শঙ্করের মঙ্গল ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

আরও একদিন অতীত হইয়া গেল, শঙ্কর ও তুলসী আশ্রমে ফিরিয়া আসিল না। আশ্রমের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তুলসীর জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সকলের মুখেই বিপদের ছায়া। তুলসী—আশ্রমের, বালক বৃদ্ধ প্রৌঢ়া, বিধবা সকলেরই প্রিয় ছিল। তুলসী আশ্রমের পিতৃ-মাতৃহীন শিশুগুলিকে ভাই-ভগ্নীর ন্যায় ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইত। বিধবাদের পার্শ্বে পার্শ্বে ঘুরিয়া সে কাহারও শিবপূজার গঙ্গাজল, কাহারও বিল্বপত্র, কাহা-কেও দুর্ব্বাদলাদি সংগ্রহ করিয়া দিত। রুগ্ন দীন-দরিদ্রের

শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মিষ্টকথা ও সেবা-শুশ্রূষার রোগযন্ত্রণা নিবারণ করিত। আশ্রমের নবাগত সন্ন্যাসীদের নিকটে বসিয়া নানা প্রকার সেবা-যত্নে তাহাদিগকে তৃপ্ত করিত। আশ্রমের গাভীগুলিকে নিত্য নব নব দূর্ব্বাদল আনিয়া স্বহস্তে তাহাদিগকে ভক্ষণ করাইত। ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ বালক যুবকগণের পীড়াদি হইলে সহোদরার ন্যায় যখন যেটির অভাব তাহা সম্মুখে ধরিয়া দিত। হায়! হায়! সেই তুলসী আজ আশ্রম অন্ধকার করিয়া কোথায় গেল? আজ সকলেই তুলসীর দয়া, স্নেহ ও হৃদয়ের নির্ম্মলতার প্রশংসা করিতে করিতে নয়নাশ্রুতে বসন আর্দ্র করিতেছে।

আর শঙ্কর দেব! শঙ্করদেবের জন্য সকলেই শোকাকুল হইল! শঙ্কর আশ্রমের ভিতর পীড়িতের কাতর স্বর শ্রবণ করিলে দিনান্তে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতে বসিয়াও উঠিয়া যাইতেন। শঙ্করের মুখে মিষ্ট কথা শুনিয়া রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্যক্লিষ্ট দরিদ্রগণ সকল কষ্ট বিস্মৃত হইয়া "দেবতার আশ্রমকে" স্বর্গাপেক্ষা সুখের স্থান মনে করিত। ব্রহ্মচারী আশ্রমের যুবক ও বালকগণ শঙ্করের জন্য অন্নজল ত্যাগ করিয়া শোকে ম্রিয়মান হইয়া পড়িল। হায়! শঙ্করের ন্যায় সঙ্গী, শঙ্করের ন্যায় উপদেষ্টা, শঙ্করের ন্যায় সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী সতীর্থ ভ্রাতা, শঙ্করের ন্যায় পরদুঃখকাতর পরোপকারী মিত্র তাহারা

আর কোথায় পাইবে! ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের যুবকগণ পরদিন প্রভাতে শঙ্করের অনুসন্ধানের জন্য বহির্গত হইবে স্থির করিয়া গুরু কৃষ্ণমোহনের অনুমতির অপেক্ষা করিতে লাগিল।

তুলসীর জননী পাগলিনীর ন্যায় আজ দুই দিন কন্যার জন্য নিরাহারে রোদন করিতেছেন, শরৎকুমারী তুলসীর জননীকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়াও কিছুতেই অন্ন-জল গ্রহণ করাইতে পারিলেন না। "আমার তুলসী কোথায় গেল? আমায় স্বামীর প্রদত্ত চিহ্ন, বিধবার একমাত্র নাড়ী-ছেঁড়া ধন তুলসীকে তোমরা আনিয়া দাও।" এই বলিয়া তুলসীর জননী নিয়ত ক্রন্দন করিতেছেন। বিধবার নিরাশ কাতর ক্রন্দনে সকলের হৃদয় তুলসীর জন্য উথলিয়া উঠিতেছে। বিধবাকে সান্ত্বনা করিতে যাইয়া সকলেরই সকল উপদেশ তুলসীর জননীর শোকাবেগে ভাসিয়া যাইতেছে। শরৎকুমারী বিধিমতে বুঝাইতেছেন, কত প্রকারে সান্ত্বনা করিতেছেন, বিধবার মুখে ঐ একই কথা "তুলসীকে তোমরা আনিয়া দাও।" শরৎকুমারী অবশেষে তুলসীর জননীকে কিছুতেই সান্ত্বনা করিতে না পারিয়া বিধবা আশ্রমে একবার আসিবার জন্য কৃষ্ণমোহনকে সংবাদ পাঠাইলেন।

কৃষ্ণমোহন বিধবাশ্রমে আসিবামাত্র "বাবা! আমার তুলসী কোথায় গেল?" বলিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া তুলসীর

মাতা চীৎকার করিতে লাগিলেন। দয়ার আধার কোমল-প্রাণ কৃষ্ণমোহন বিধবার রোদন দেখিয়া নয়নাশ্রু চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিয়া কৃষ্ণ-মোহন বিধবাকে বলিলেন, 'মা! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুলসী যেখানেই থাক্, যদি জীবিত থাকে, তোমার ক্রোড়ে আনিয়া দিব।"

কৃষ্ণমোহনের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বিধবা বলিলেন, "বাবা! আপনি মানবরূপে দেবতা! আপনার কথা কখন মিথ্যা হইবার নহে। আপনার কথায় আমার বিশ্বাস হইতেছে, আমি তুলসীর সেই হাসিমাখা মুখটি আবার বুঝি দেখিতে পাইব।"

কৃষ্ণমোহন বিধবার নিকট হইতে আসিয়া নির্জ্জনে বসিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কৃষ্ণমোহন মনে মনে বলিলেন, "প্রভো, তোমার মঙ্গল ইচ্ছা কৃষ্ণমোহনকে যেদিকে লইয়া যাইবে, কৃষ্ণমোহন সেই দিকেই যাইবে। তোমার মঙ্গল ইচ্ছা ক্ষুদ্র মানবজ্ঞানের অতীত! জানি না দয়াময়, শরৎ তুলসীর এই হঠাৎ নিরুদ্দেশ ঘটনায় আপনার কি মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত আছে।"

বহুক্ষণ চিন্তা করিবার পর কৃষ্ণমোহন আশ্রমের একটি নির্জ্জন স্থানে আসিয়া শরৎকুমারীকে ডাকিয়া

পাঠাইলেন। শরৎকুমারী আসিয়া গলবস্ত্রে কৃষ্ণমোহনকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দাদা, আপনি কি আমাকে ডাকিয়াছেন ?"

"হাঁ শরৎ ! তোমার সঙ্গে আজ অনেক কথা আছে; একটু বিলম্ব হইলে রোগীদের ঔষধ ও পথ্যের কোন ক্ষতি হইবে না ত।"

শরৎ।—না দাদা ! কল্য হইতে ছোট দাদা হাঁসপাতালে রুগ্নদের সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন। আমি একবার হাঁসপাতালে গিয়াছিলাম, ছোট দাদা ভর্ৎসনা করিয়া ফিরাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, তুই আজ একমাস রাত্রি জাগরণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিস্, না ঘুমাইলে বাঁচিবি না ? আমি কত করিয়া বুঝাইলাম, রাত্রিতে চুপ করিয়া নিদ্রা যাইতে আমার কষ্ট হয়, রাত্রি জাগিয়া রোগীর সেবা করিলে মনে আনন্দ পাইয়া ভাল থাকি। ছোট দাদা সে কথা কিছুতেই শুনিলেন না, আমাকে জোর করিয়া সেখান হইতে তাড়াইয়া দিলেন।"

শরৎকুমারী দুর্গাপ্রসন্নকে মাঝে মাঝে ছোট দাদা বলিয়া ডাকিতেন।

কৃষ্ণমোহন প্রগাঢ় চিন্তা ও দুঃখের সময়ও দাদার উপর শরৎকুমারীর বালিকার ন্যায় অভিমান দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণমোহন হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

"দুর্গাপ্রসন্ন তোমাকে ঘুমাইতে বলিয়া তোমার হাতের কাজটি জোর করিয়া নিজে কাড়িয়া লইয়াছে, ইহা বাস্তবিকই বড় অন্যায়।"

শরৎকুমারী আবার অভিমান-মিশ্রিত দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "ছোট দাদা আমাকে এইরূপ মাঝে মাঝে বসিয়া থাকিতে বলিয়া শাস্তি প্রদান করেন।"

কৃষ্ণমোহন আবার হাসিয়া বলিলেন,—"ভগ্নি! তোমার স্বাস্থ্যের দিকে দুর্গাপ্রসন্নের প্রখর দৃষ্টি ও স্নেহাধিক্য বশতঃই তিনি তোমাকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে বলেন। তুমি সহজে বিশ্রাম করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ কর, তাই দুর্গাপ্রসন্ন তোমার উপর কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কার্য্য হইতে বিরত করে। তুমি যে দেবতার আশ্রমের প্রধান অঙ্গ ভগ্নি! তুমি একদিন রোগশয্যা গ্রহণ করিলে আশ্রমের কার্য্য চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খল হইয়া যাইবে। শরৎ! আজ আমি তোমার সঙ্গে অতি আবশ্যকীয় বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য এখানে আহ্বান করিয়াছি। অন্য কথার সময় নাই। তুলসী ও শঙ্করের অনুসন্ধানের জন্য অদ্যই আমি আশ্রম ত্যাগ করিব। আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত "দেবতার আশ্রমের" সমস্ত ভার দুর্গাপ্রসন্ন, রামতনু ও তোমার উপর ন্যস্ত রহিল।"

কৃষ্ণমোহনের আশ্রম ত্যাগের কথায় শরৎকুমারীর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া অশ্রুভারে চক্ষু দুটি ছল ছল করিতে লাগিল। শরৎকুমারী দুঃখিত, বিমর্ষ ও চঞ্চলভাবে কৃষ্ণমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি অগ্রে কোন্ স্থানে অনুসন্ধান করিতে যাইবেন দাদা? আজ পর্য্যন্ত তুলসী শঙ্করের কোন সন্ধান কেহই ত দিতে পারিল না!"

কৃষ্ণমোহন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আজ দুই দিনের বহু অনুসন্ধানে তাহাদের কতক সংবাদ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। শরৎ! এখান হইতে ইহার অধিক সংবাদ আর সংগ্রহ হইবার আশা নাই। তাহারা মৃত কি জীবিত, ইহা না জানিতে পারিলে, আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের দিবানন্দ ও চন্দ্রদেবের নিকট শুনিয়াছি, যে রাত্রে তাহারা মৃত বা নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই দিন সন্ধ্যার সময় দ্বারকেশ্বর-তীরে প্রস্তর-খণ্ডের উপর বসিয়া উভয়ে সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিল। দ্বারকেশ্বরের মাঝিদের নিকট বহু অনুসন্ধানে সংবাদ পাইয়াছি, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে একখানি নৌকা জলমগ্ন হইয়া একটি স্ত্রীলোক সন্তান বক্ষে দ্বারকেশ্বরস্রোতে ভাসিয়া যায়। সেই সময়ে একটি বালিকা ও একটি যুবক সন্ন্যাসী সন্তানসহ স্ত্রীলোকটীকে উদ্ধার করিবার জন্য

দ্বারকেশ্বর-বক্ষে ঝম্প প্রদান করিয়া স্ত্রীলোকটীকে উদ্ধারের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া তাহারাও স্রোতের মুখে ভাসিয়া যায়। শরৎ! আমার বিশ্বাস, ইহারাই আমাদের তুলসী ও শঙ্কর!"

তুলসী ও শঙ্করের কতক সংবাদ পাইয়া শরৎকুমারী প্রথমে একটু আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাহাদের শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা! দ্বারকেশ্বরের প্রবল স্রোতে তুলসী শঙ্কর কি জীবিত আছে? আহা! সন্তান সহ স্ত্রীলোকটির অবস্থা কি হইল দাদা?" দয়ার প্রতিমূর্ত্তি কোমলপ্রাণা শরৎকুমারীর হৃদয় সন্তান সহ অপরিচিতা রমণীটির জন্যও ব্যাকুলিতা হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণমোহন আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বহু চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিয়াও ইহার অধিক আর কোন সংবাদই পাই নাই। শরৎ! তাই—দ্বারকেশ্বরের প্রবল স্রোতের কোন্ দেশে বিরাম হইয়াছে,—তুলসী শঙ্করের পরিণাম কোথায়, ইহা জানিবার জন্যই বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি।" তুলসী শঙ্কর জীবিত কি মৃত, এই সংবাদ যে দেশে যত দিনেই হউক, কৃষ্ণমোহন সংগ্রহ করিতে বাধ্য। কৃষ্ণমোহনের হস্তে সহস্র কার্য্য থাকিলেও অগ্রে ইহা

অনুসন্ধান করা প্রধান কর্ত্তব্য—কন্যাহারা অনাথিনী বিধবার নিকট কৃষ্ণমোহন প্রতিশ্রুত!

শরৎকুমারীর হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। কৃষ্ণমোহনের পদযুগলে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, স্থির-প্রতিজ্ঞ দাদার প্রতিজ্ঞা টলাইতে পারে শরৎকুমারীর সে সাধ্য নাই। দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া,—সহস্র বিপদ তুচ্ছ করিয়া, যত দিনেই হউক, তুলসী শঙ্কর জীবিত কি মৃত এই সংবাদ সংগ্রহ করিতে দাদা "দেবতার আশ্রম" পরিত্যাগ করিবেন। হায় ভগবান! আবার কি নূতন বিপদ আমাদের সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে, তুমিই জান প্রভু!

শরৎকুমারীকে নীরব থাকিতে দেখিয়া কৃষ্ণমোহন গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "শরৎ। তুমি বিমর্ষ হইলে কেন? যে বালিকা ও যুবক সংসারে পদার্পণ করিয়াই পরের জীবন-রক্ষা করিতে নিজ জীবন বিপন্ন ও তুচ্ছ করিতে পারে, সেই মহাপ্রাণ বালিকা ও যুবকের পরিণাম অবগত হওয়া আমাদের কি প্রধান কর্ত্তব্য নহে? এরূপ দুটি পবিত্র জীবনের কোথায় কি অবস্থায় মহাপ্রস্থান ঘটিল, সে সংবাদ অবগত হওয়া কি তোমার অভিপ্রেত নহে;—তোমার নীরবতা ইহাই যেন আমাকে এই প্রকার আভাষ দিতেছে।"

শরৎকুমারী রোরুদ্যমানা হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দাদা, ভগ্নির অপরাধ চিরদিনই ভ্রাতার নিকট ক্ষমার্হ।

তুলসী শঙ্করের সংবাদ জানিবার জন্য আমার হৃদয় অত্যধিক ব্যাকুল। এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে ভ্রাতার ভগ্নির নিকট অনুমতি পাইবার আবশ্যকতা নাই। তুলসী শঙ্করের জন্য যে ব্যাকুলতা ,সর্ব্বক্ষণ হৃদয়কে অস্থির করিতেছে, আবার স্নেহময় ভ্রাতার অদর্শনে সেই ব্যাকুলতা বৃদ্ধি হইয়া যে দাবানলের সৃষ্টি করিবে, ভগ্নির ক্ষুদ্র হৃদয় সেই দাবানলের তীব্র দাহিকা-শক্তি সহ্য করিতে পারিবে কি না, নীরবে ইহাই চিন্তা করিতেছি।”

কৃষ্ণমোহন বলিলেন, “ভগ্নি। তোমার হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতার ভাব আরোপ করিয়া যে অপরাধ করিলাম, ভ্রাতার স্নেহের তিরস্কার বোধে উপেক্ষা করিলে সুখী হইব। শরৎ! তোমার হৃদয় বিশাল মহীরুহের ন্যায়। শত সহস্র নিরাশ্রয় বিপন্ন পথিক তোমার হৃদয়ের শীতল ছায়ায় স্থান পাইতেছে। তুলসী শঙ্করের চিন্তায় তোমার হৃদয় যে অস্থির হইবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু শরৎ! তুমি যে এই মাত্র বলিলে, আমি আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইলে তোমার ব্যাকুলতা অসহ্য হইয়া উঠিবে। আমার ভগ্নির মুখে এইরূপ কথা শোভা পায় না। ভগবানের রাজ্যে মানবের সুখ-দুঃখের চিন্তা করিবার অবসর লওয়া অকর্ত্তব্য। ভগবানের আদেশ মস্তকে ধরিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হওয়া মানবের প্রধান কর্ত্তব্য। কার্য্যের ফলাফল ভগবানের হস্তে।

তিনি যাহা দিবেন, বুক পাতিয়া সহ্য করিতে হইবে। সুখ দুঃখে অভিভূত হওয়া মানবের অনুচিত, আমার ভগ্নির ইহা একেবারেই কর্ত্তব্য নহে। শরৎ! কর্ত্তব্যবোধে কার্য্য করিয়া যাও, ফলাফল দেখিবার জন্য অগ্র পশ্চাৎ চাহিয়া সুখ দুঃখে অভিভূত হইয়া থাকিবার অবসর অনুসন্ধান করিও না। আমার পরিণাম চিন্তা করিয়া তুমি কাতর হইলে ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের শৈথিল্য প্রকাশ পাইবে। আমাদের সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সমস্তই ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া প্রশান্ত হৃদয়ে কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন কর।"

শরৎকুমারী বিনয়নম্র বচনে ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা। কোন্ দিকে অনুসন্ধান করিতে যাইবেন? কতদিন পরে ভ্রাতার চরণ দর্শন ভগ্নির অদৃষ্টে ঘটিবে? তুলসী শঙ্কর জীবিত আছে বলিয়া কি আপনার বিশ্বাস হয়?"

"শরৎ! এই বিশ্বাসের কথাই তোমাকে বলিব মনে করিতেছিলাম। তুলসী ও শঙ্করের মহৎ জীবন যে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। ঈশ্বরের রাজ্যের পূর্ব্বাপর নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছি। ভগবানের জটীল রহস্যের ভিতর কৃষ্ণমোহনের ক্ষুদ্র বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারিতেছে

না। এই ব্যাপারের মধ্যে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। তাঁহার এই মঙ্গল ইচ্ছার আভাষ যতদিন না হৃদয়ঙ্গম হয়, ততদিন আমার সাক্ষাৎ পাইবে না। আমি কোন্ দিকে যাইব, শরৎ, তাহা এখন কিছুই বলিতে পারি না; তবে যে স্রোতের মুখে তাহারা ভাসিয়া গিয়াছে, সেই স্রোত লক্ষ্য করিয়া আমিও দ্রুতপদে অগ্রসর হইব।"

শরৎকুমারী ও কৃষ্ণমোহন যখন পূর্ব্বোক্ত কথাবার্ত্তার পর আশ্রম সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিতেছেন; তখন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের যুবকগণ আসিয়া একে একে কৃষ্ণমোহনের পদধূলি গ্রহণ করিল। কৃষ্ণমোহন যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রিয় যুবকগণ! শঙ্কর ও তুলসীর অনুসন্ধানের জন্য আমি সম্প্রতি আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। আমার প্রত্যাগমনের নির্দ্দিষ্ট সময় তোমাদিগকে বলিতে পারি না। তোমরা ভগবানে সর্ব্বক্ষণ বিশ্বাস রাখিবে। সুখ, দুঃখ, অভাব, রোগ, শোক, সকলই তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার অধীন। সৎইচ্ছা, সৎসাহস, সৎচিন্তা সর্ব্বক্ষণ যেন তোমাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা দেশের ও দশের হিতার্থে কর্ত্তব্যপালন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের মুখ রক্ষা করিবে। তোমাদের সৎসাহসের যেন কখন অভাব না হয়।"

সকলে আবার গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমরা গুরুদেবের আজ্ঞা কখন লঙ্ঘন করিব না।"

কৃষ্ণমোহন বলিলেন, "যুবকগণ! তোমাদের হৃদয়ের দৃঢ়তায় বড়ই প্রীত হইলাম। ভগবানের করুণায় তোমাদের হৃদয়ের বল যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।"

যুবকগণ আবার গুরুদেবের চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "গুরুদেব! শঙ্করের অনুসন্ধানার্থ আমরাও আপনার সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। শঙ্করের অদর্শনে আমরা ব্যাকুল চিত্তে আশ্রমে বাস করিতেছি। যদি দয়া করিয়া আদেশ প্রদান করেন, তাহাদের অনুসন্ধানার্থে আমরাও বহির্গত হই। প্রিয় বন্ধুর ও সরলা স্নেহময়ী ভগ্নি তুলসীর অনুসন্ধান করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত।"

কৃষ্ণমোহন বলিলেন, "যুবকগণ! তোমাদের বন্ধুত্ব প্রেমের পরিচয় ও শঙ্করের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি দেখিয়া আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। বৎসগণ! তোমরা বালক। চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, শঙ্করের অনুসন্ধান সহজসাধ্য নহে! শঙ্কর জীবিত কি না, ইহাও সন্দেহস্থল। অনিশ্চিত গুরুতর বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া অধ্যয়নের ক্ষতি করা তোমাদের কর্ত্তব্য নহে। ভগবানের

ইচ্ছার নিকট মানবের ক্ষুদ্র চেষ্টা কখন কার্য্যকরী হয় না।
তোমাদের সুহৃদ শঙ্করের জন্য ঐকান্তিক চিত্তে ভগবানের
নিকট প্রার্থনা কর,—শঙ্করের জীবন মরণ ভগবানের উপর
সমর্পণ করিয়া কর্ত্তব্যকার্য্যে মনোনিবেশ কর।"

'তথাস্তু' বলিয়া সকলেই গুরুদেবের চরণে প্রণাম
করিয়া ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে প্রবেশ করিল। কেবল সুখানন্দ
ও রামানন্দ নামক শঙ্করের যুবক বন্ধুদ্বয় পুনঃ পুনঃ গুরু-
দেবের চরণে ব্যাকুলতা জানাইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইবার
অনুমতি প্রাপ্ত হইল। হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে তাহারা "দেবতার"
আশ্রমের সকলের নিকট বিদায় লইবার জন্য চলিয়া
গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শঙ্করদেব অল্প দিনের মধ্যেই মিকির ভাষা বেশ আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। শঙ্কর এখন মিকিরদের সঙ্গে অনর্গল মিকির ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন। শঙ্কর আজ কয়েক মাস মিকিরদের কার্য্যকলাপ অভি-নিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন; স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা কাহারও হৃদয়ে কপটতার লেশ মাত্র দেখিতে পান নাই। মিকিরদের কার্য্য-কলাপ দৃষ্টে শঙ্কর তাহাদিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকেন। শঙ্কর এখন স্ত্রী, পুরুষ, বালক সকলেরই হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন। অরণ্যের বহু ক্রোশ দূরে মিকির বস্তি হইতে নিত্য মিকির পুরুষ ও রমণীগণ শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে। শঙ্কর প্রত্যেক মিকির-রমণীকেই মাতৃ-সম্বোধন করিয়া সন্তানের ন্যায় পার্শ্বে থাকিয়া তাহাদের সুখদুঃখের কথা শ্রবণ করেন, প্রাণপণ যত্নে অভাব দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন। মিকির-দলপতিগণ এখন শঙ্করের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করে না। শঙ্কর যে কার্য্য করিতে নিষেধ করে, মিকির

দলপতিগণ দেববাক্য জ্ঞানে তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। শঙ্কর দেখিলেন, মিকিরগণের বংশ-পরম্পরা যে নিয়মগুলি প্রচলিত আছে, তাহা উন্নত নরসমাজে শতাংশের এক অংশও প্রচলিত নাই। মিকিরদের আচার ব্যবহার বনাপশুবৎ হইলেও ইহাদের হৃদয় দেব-ভাবে পূর্ণ। গ্রাম বা নগরবাসী সভ্য-নামধারী মানব-হৃদয়ে মিকিরদের দেবভাব যদি কিয়দংশও থাকিত, তাহা হইলে সংসার প্রকৃতই সুখের স্থান হইত। নিত্য বুভুক্ষু নরনারীর কাতর রবে নর-সমাজ ত্রাস্ত ও বিচলিত হইত না। বিজন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রভূত কায়িক শ্রমে মিকির-পুরুষ ও রমণীগণ দিনব্যাপী পরিশ্রমে যে ফল মূল ইত্যাদি আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে, তাহাতে কেবল নিজেদের উদর পূর্ণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ইহারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের গৃহে গিয়া অনুসন্ধান করে, আজ কে ফল-মূলাদি সংগ্রহের জন্য অরণ্যে যাইতে পারে নাই, কে অল্প মাত্র আহারীয় সংগ্রহ করিয়াছে, কে আহারাভাবে আজ ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছে, কোন্ ব্যক্তি আজ রোগশয্যায় শায়িত, কে আজ বন্যপশুর আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া আসিয়াছে। এই সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান-ও তাহাদের সুব্যবস্থা করিয়া আহারীয় দ্রব্যাদি

সমান অংশে বিভাগ করিয়া সকলে একত্রে আহারাদি করিতে বসে। সভ্য সমাজের ন্যায় এই অরণ্যবাসী মিকিরগণ আপন পর ভেদ জ্ঞান করে না। কে কাহার ভ্রাতা, কে কাহার ভগ্নী, কে কাহার জননী, শঙ্করদেব প্রথমাবস্থায় উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মিকিরগণ পরস্পর পরস্পরকে সহোদর অপেক্ষা স্নেহ করে, রমণীগণও সহোদরাপেক্ষা ভালবাসে, অপরের জননীকে ইহারা জননীর ন্যায় স্নেহ-ভক্তি করিয়া থাকে। অপরের বিপদ উপস্থিত হইলে নিজের বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া প্রাণ দানে কুণ্ঠিত হয় না। কোন বস্তিতে ভীষণ ব্যাঘ্র বা বন্য হস্তির উপদ্রব হইতেছে, শুনিলে সকলে দলবদ্ধ হইয়া বন হইতে বনান্তরে বন্য হিংস্র পশুকে বিতাড়িত করিয়া আসে। কাহার গৃহাদি ভগ্ন হইয়া গেলে বা কাহার নূতন গৃহ নির্ম্মাণের আবশ্যক বুঝিলে, সকলে একত্রিত হইয়া আহার নিদ্রা দূরে রাখিয়া গৃহ নির্ম্মাণে নিযুক্ত হয়। হিংস্র বন্য জন্তুই ইহাদের একমাত্র শত্রু। বন্যজন্তুকে ইহারা জাতীয় শত্রু বলিয়া মনে করে। বন্যজন্তুদের সহিত ইহাদের নিত্যই যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়া থাকে। মিকিরগণ মনে করে, এই বন্যভূমি আমাদের দেশ,—এখানে সুখ স্বচ্ছন্দে আমাদের পিতৃ-পিতামহগণ বাস করিয়া গিয়াছেন, আমরা ভীষণ অরণ্যজন্তুর অত্যাচার কেন সহ্য করিব? অরণ্য-

বাসী হিংস্রজন্তুগণ মনে করে, আমরা এই অরণ্যে একাধিপত্য করিয়া আসিতেছি, ক্ষুদ্র মিকির-জাতির ভ্রুকুটি আমাদের একেবারে অসহ্য। মিকিরগণ ভ্রাতৃভাব ও জাতীয় সম্মান মূল মন্ত্র করিয়া পিতৃ-পিতামহের বাসভূমি এই অরণ্যকে সুখের নন্দন-কানন জ্ঞানে বাস করিয়া আসিতেছে। রক্তশোষক হিংস্র জন্তুর অত্যাচার মিকিরদের একতা শক্তিতেই পরাস্ত হইয়া থাকে।

শঙ্কর কিছু দিন ইহাদের আচার, ব্যবহার ও হৃদয়ের মহত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই মিকিরগণকে যদি কেহ ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতে পারেন, তবে ইহারা বিরাট শক্তিশালী ধার্ম্মিক জাতিতে পরিণত হইতে পারে। শঙ্কর লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, মিকিরদের জীবন বনে বনে আহারান্বেষণ ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশেই অতিবাহিত হইতেছে। ইহাদের হৃদয়ের শক্তি ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইলে একটি প্রকৃষ্ট জাতিতে উন্নত হইবে। ভগবৎ চিন্তায় ও ধর্ম্ম ভাবে ইহাদের হৃদয় অগ্রে প্রশস্ত করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া একদিন শঙ্করদেব মিকির-দলপতিগণকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, "ভাই মিকির সর্দ্দারগণ! তোমরা আমার কথা গ্রহণ করিবে এই আশা ও বিশ্বাসে আজ একটি মহৎ বিষয়ের প্রস্তাব তোমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। যদি তোমরা

অনুগ্রহ করিয়া আমার কথাগুলি পালন কর, তবে বুঝিব, মিকির সর্দ্দারগণ শঙ্করকে যথার্থই ভালবাসে।"

মিকির সর্দ্দারগণ একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "শঙ্কর! তোকে আমরা ভালবাসি না? তুই আমাদিগকে যখন যে কথা বলিয়াছিস্, তখন সেই কথা শুনিয়াছি। দেখ্ শঙ্কর, তুই সেদিন বলিয়াছিলি, বনবাসী নির্দ্দোষী পশুগুলি বধ করায় পাপ হয়, নিজ উদরপূরণ জন্য পশুহনন করা নিষ্ঠুরতার কার্য্য, সেই দিন হইতে আমরা শীকার করা ছাড়িয়া দিয়াছি। এবার হইতে এই বিশাল অরণ্যে আর কেহ যাহাতে পশুচর্ম্মের ব্যবসা না করে, তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।"

একজন সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল, "শঙ্কর! আমাদের ক্ষুধা পাইলে যদি একটি হরিণশিশু মারিয়া আহার করি, তবে তাহাতে পাপ হয় কেন?"

শঙ্কর বলিলেন, "ভাই সর্দ্দার! তোমার ক্ষুধা পাইলে আমার দেহটা উদরস্থ করিয়া যদি শরীর পোষণ কর, সেটা কতদূর স্বার্থপরতা ও নৃশংসতার কার্য্য বল দেখি? তোমার জীবন হনন করিলে তোমার ও তোমার আত্মীয়দের যেরূপ কষ্ট হইয়া থাকে, পশুদেরও তদ্রূপ। তোমার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য একটি পশুর জীবননাশ অথবা তোমার দেহের রক্ত মাংস বৃদ্ধির জন্য একটি জীবের প্রাণ

নষ্ট করিয়া তাহার রক্ত মাংস উদরস্থ করা কিরূপ নৃশংসতার কার্য্য চিন্তা করিয়া দেখ। তাহাদের মানুষের ন্যায় ভাষা নাই সত্য, যদি থাকিত তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে যে, সে কত বিলাপ করিতেছে; তাহাদের নীরব ভাষা কি ইহা বলিয়া দেয় না? তবে যদি কখন এরূপ অবস্থা ঘটে যে, আহারাভাবে জীবন নষ্ট হইবার উপক্রম হইতেছে, জীবহত্যা করিয়া পশুমাংস ভক্ষণ ব্যতীত জীবন রক্ষার আর অন্য উপায় নাই, সে কথা স্বতন্ত্র। জীবনরক্ষা ও শরীর পোষণের জন্য ভগবান আমাদের এই বনভূমিতে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য-সামগ্রী প্রদান করিয়াছেন। তবে কেন তোমরা পশু-হিংসা করিয়া উদরপূর্ত্তি করিবে ভাই? অপরের দেহ উদরস্থ করিয়া নিজ দেহ পোষণ করা নিতান্ত নৃশংসতার পরিচায়ক নহে কি?"

সর্দ্দারগণ বলিয়া উঠিল, "তুই ঠিক কথা বলিয়াছিস শঙ্কর! অপরের জীবন নষ্ট করিয়া সাহ্লাদে সেই রক্ত মাংস উদরস্থ করা ঘোরতর নিষ্ঠুরতা,—ভীষণ পাপের অনুষ্ঠান করা হয়। নরমাংস-লোলুপ রাক্ষস আসিয়া এইরূপে আমাদের জীবন নষ্ট করিয়া যদি মাংস ভক্ষণ করে, তবে আমাদের কি কষ্ট হয় না শঙ্কর?"

শঙ্কর বলিলেন, "ভাই সর্দ্দারগণ! তোমরা যে আমার কথা বুঝিয়া তদ্রূপ কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, ইহাতে

আমি বড়ই সুখী হইয়াছি। এস ভাই সর্দ্দারগণ! তোমাদিগকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া এই আনন্দের পরিসমাপ্তি করি। ইহা অপেক্ষা আরও একটি ভাল কথা—একটি মহান্ অনুরোধ করিবার জন্য আজ তোমাদের সহিত সমবেত হইয়াছি। ভাই সর্দ্দারগণ! তোমরা সরল, অকপট, বলিষ্ঠ, জন্মভূমি ও স্বজাতির মঙ্গলেচ্ছুক। তোমাদের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ স্বজাতির প্রতি ভ্রাতৃভাব জাগরিত রহিয়াছে। সর্দ্দারগণ! তোমরা কি কখন চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ, এই সমস্ত মহান্ শক্তি কাহার অনুগ্রহে লাভ করিয়াছ? তোমাদের জন্মভূমি এই অরণ্যের মধ্যে সুস্বাদু ফল, গুল্ম, সুনির্ম্মল পানীয় জল কে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে? রোগ যন্ত্রণায় কাতর হইলে প্রত্যেক বনস্পতি যে ঔষধি প্রদানে শান্তিদান করে, কাহার অনুগ্রহে সে তোমাদের নিরাময় করিতেছে?”

সর্দ্দারগণ বলিল, “শঙ্কর! তোর কথা আমরা বুঝিতে পারি না। অরণ্যে জল, ফল আমরা ত বংশ-পরম্পরায় ভোগ করিয়া আসিতেছি। ইহা আবার দিবে কে? তোর কথায় ইহাই বুঝাইতেছে, এই সব কে যেন মিকির জাতির প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া দান করিয়াছে। মিকির জাতি কখন অপরের দয়াপ্রার্থী হইতে ভাল-বাসে না। মিকিরদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ তাহাদের বংশধর-

গণকে কখন পরের দয়াপ্রার্থী হইতে শিক্ষা দেয় নাই। মিকিরদের অভাব মিকির-জাতিই স্বহস্তে পূরণ করে, মিকির জাতি অভাব পূরণ জন্য পর দেশের প্রতি তাকাইতে—পর-মুখাপেক্ষী হইতে আন্তরিক ঘৃণা করে। মিকির জাতি পরাধীনতা জন্ম-জন্মান্তরের পাপ বলিয়া মনে করে;—ভীষণ বন্যজন্তুকেও তাহারা অধীনে রাখিবার জন্য বংশ-পরম্পরা ভীষণ সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। শঙ্কর! আমাদের সবল বাহু স্বচেষ্টায় চিরদিন যাহা আহরণ করিয়া আসিতেছে,—সেই ফল, জল, গুল্মাদি কেহ দয়া করিয়া দান করিতেছে, ইহাই কি আমাদিগকে তুই বুঝাইতে চাস্?”

অরণ্যবাসী স্বাধীনজাতির সরল তেজোব্যঞ্জক কথা-গুলি শুনিয়া শঙ্করদেব মনে মনে তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ধন্য মিকির-সর্দ্দারগণ। তোমরাই স্বাধীনতার সুখ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ। তোমাদের বিলাসিতার মোহ নাই। সুশিক্ষিত মানবের ন্যায় তোমরা নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি করিতে কখন শিক্ষা কর নাই। তোমরাই জগতে সুখী,—নিজের অভাব নিজেরা পূরণ করিয়া চিরানন্দে জীবন যাপন করিতেছ। এই মহানুভবতা গুণেই জগতে তোমরা উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।”

শঙ্করকে নিস্তব্ধ থাকিতে দেখিয়া সর্দ্দারগণ বলিয়া উঠিল, "শঙ্কর! তবে কি তোর ইহাই বিশ্বাস, আমরা অপর একজনের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করিতেছি? তুই কথা না কহিয়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছিস্, তোর এই ভ্রান্ত ধারণা কি করিয়া আমরা অপনোদন করিব শঙ্কর?"

ভগবানের প্রতি মিকির-সর্দ্দারগণের একান্ত অবিশ্বাস দেখিয়া শঙ্কর অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে মর্ম্মাহত চিত্তে বলিতে লাগিলেন, "সর্দ্দারগণ! ভ্রান্তি ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমি তোমাদিগকে কোন কথা বলি নাই। আমার চিরজীবনের যাহা বিশ্বাস, যে বিশ্বাসে আমি সুখ-দুঃখ উপেক্ষা করিয়া জীবিত আছি;—বিশ্বাস আছে বলিয়াই অশান্ত হৃদয়ে যাঁহাকে স্মরণ মাত্র শান্তি পাই, সেই বিশ্বাসের আধার,—করুণার প্রস্রবণ,—শান্তিময়ের কথাই তোমাদিগকে বলিতেছি। সর্দ্দারগণ! তোমাদের বিশ্বাস—এই অরণ্যের বৃক্ষ, লতা, ফল, গুল্ম কেহই তোমাদের জন্য সৃজন করেন নাই, স্রোতোস্বিনীর স্বচ্ছ সলিল তোমাদের পিপাসা শান্তির জন্য করুণাবশে কেহই তোমাদের এই অরণ্যপ্রান্ত দিয়া দূর দূরান্তরে প্রেরণ করেন নাই! বল দেখি সর্দ্দারগণ! এটী কাহার দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে?" এই বলিয়া শঙ্করদেব বিহগ-পক্ষ নির্ম্মিত জনৈক মিকির

সর্দ্দারের একটি মস্তকাবরণ হস্তে লইয়া সর্দ্দারগণের সম্মুখে স্থাপন করিলেন।

জনৈক সর্দ্দার বলিয়া উঠিল, "এই মস্তকাবরণ বিহগ-পক্ষে আমি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছি।"

শঙ্করদেব সাহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "সর্দ্দারগণ, এখন তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ যে, কোন জিনিষ একজন প্রস্তুত না করিলে কখন সৃষ্ট হইতে পারে না। প্রত্যেক জিনিষেরই একজন স্রষ্টা আছেন, এই সত্য বাক্য তোমরা কি অস্বীকার করিতে পার?"

সর্দ্দারগণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "শঙ্কর, তবে কি এই অরণ্যের লতা, গুল্ম, বৃক্ষাদিও একজন সৃজন করিয়াছেন?"

শঙ্করের মুখমণ্ডল আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল! ভক্তি-গদগদচিত্তে শঙ্কর বলিতে লাগিলেন, "সর্দ্দারগণ! জগতের অধীশ্বর একজন বিরাট পুরুষ, তিনি এই জগৎ সংসার ব্যাপিয়া আছেন, তিনিই এই সমস্ত সৃজন করিয়াছেন! সেই দয়াময় পরম ব্রহ্ম কেবল এই অরণ্য, নদ, নদী, চন্দ্র, সূর্য্য সৃজন করেন নাই, জগতের ক্ষুদ্র কীটানুকীটও তাঁহার সৃজিত।"

সর্দ্দারগণ কৌতূহল-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "শঙ্কর! সেই বিরাটপুরুষ যিনি নদনদী বৃক্ষলতাদি সৃজন করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই না কেন? কেবল

তোর কথায় কি করিয়া বিশ্বাস করিব, এই এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছে?"

শঙ্কর সর্দ্দারগণের এই প্রশ্নে ক্ষুব্ধ হইয়া ভগবানকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ক্ষুদ্র শঙ্কর আপনার অপার মহিমার কথা কিরূপে মিকির সর্দ্দার-গণকে হৃদয়ঙ্গম করাইবে প্রভু?"

সর্দ্দারগণ এবার একটু ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, "শঙ্কর! কেবল তোর মুখের কথায় আমরা এত বড় একটা অদ্ভূত ও অশ্রুতপূর্ব্ব কথা কখন বিশ্বাস করিতে পারি না। মিকির-সর্দ্দারগণ কখনও মিথ্যা কথা কহিতে শিক্ষা করে নাই, কিন্তু মিথ্যাবাদীকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতে শিক্ষা করিয়াছে।"

সর্দ্দারগণের ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ও মিথ্যাবাদী বলিয়া দোষারোপ করায় শঙ্কর মর্ম্মাহত ও ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "সর্দ্দারগণ! ভগবানের দর্শন লাভ সহজ-সাধ্য না হইলেও বিশ্বাস ও সাধনা দ্বারা মহাপুরুষগণ তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া থাকেন। আমাদের তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই ও সাধনার অভাব বলিয়াই দর্শন লাভ ঘটে না। আমরা জগতের অনেক বস্তুই দেখিতে পাই না, কিন্তু ক্রিয়া উপলব্ধি করিয়া কখন কি সেই বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারি? ভগবানকে দেখিতে

না পাইলেও জগতের কার্য্যাকার্য্য দেখিয়া সহজেই তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া মস্তক নত করিতে ইচ্ছা হয়। সর্দ্দারগণ! বল দেখি, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অতি শৈশবেই পিতৃহীন হইয়াছে, যে ব্যক্তি জন্মদাতা পিতাকে কখন চক্ষেও দর্শন করে নাই, তাহার যে একজন পিতা ছিল না, একথা কি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছ? পিতাকে স্বচক্ষে না দেখিলেও অপর পাঁচজন যাঁহারা তোমার পিতাকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া যেরূপ পিতাকে বিশ্বাস, স্মরণ ও ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে হয়, যে মহাপুরুষগণ ভগবানের বিভূতি দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া তদ্রূপ ভগবানে বিশ্বাস করিতে হইবে। আমাদের দেশের পূর্ব্বতন যোগী, ঋষি মহাপুরুষগণ কখনই মিথ্যাকথা কহিয়া যান নাই। তাঁহারা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই সত্য,—সে সত্যের সম্মুখীন হওয়া দূরের কথা, তাঁহাদের সেই সত্য বাক্য উপলব্ধি করাও আমাদের ক্ষমতাতীত!"

সর্দ্দারগণ বলিয়া উঠিল, "সত্য কথা বলিয়াছ শঙ্কর! চক্ষে না দেখিলেও ক্রিয়া দ্বারা নিশ্চয়ই কর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। জগতের একজন স্রষ্টা, ঈশ্বর বা ভগবান আছেন, ইহা আমরা অন্তরের সহিত স্বীকার করিতেছি, কিন্তু তুমি যে বিশ্বাস ও সাধনার কথা বলিলে,

ইহার অর্থ আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। বিশ্বাস ও সাধনা দ্বারা কিরূপে তাঁহার দর্শনলাভ ঘটে, এবং তাঁহার করুণা বা ক্রিয়া কিরূপেই বা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, বুঝাইয়া দাও?"

শঙ্কর বলিলেন, "সর্দ্দারগণ! ভগবান জ্ঞানের অতীত, এই জন্য তাঁহার আর একটী নাম জ্ঞানাতীত। কেবল জ্ঞান থাকিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। একমাত্র বিশ্বাস দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারিলে আপনা হইতেই তাঁহাকে সাধনা করিবার প্রবৃত্তি হইবে। তোমরা এই মুহূর্ত্ত হইতেই যদি হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতে পার, জগতের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান আছেন, তাঁহার আজ্ঞা বা নিয়ম-শৃঙ্খলায় এই জগত চলিতেছে, তাঁহারই প্রদত্ত ফল, জল, পানাহারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া আমরা জীবিত আছি, তাঁহারই প্রেরিত স্নেহের পুতলি পুত্র-কন্যার মুখ দর্শন করিয়া, দুঃখ-জ্বালা বিস্মৃত হইয়া, শুষ্কপ্রাণে স্নেহের মন্দাকিনী ধারায় হৃদয় সুশীতল করিতেছি, তবে কি সর্দ্দারগণ! এই দয়ার আধার সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বপিতার চরণে তোমাদের মস্তক নত করিবার ইচ্ছা হইবে না? যিনি আমাদের সুখ-দুঃখ ভাবিয়া নিত্য আবশ্যকীয় অসংখ্য জিনিষ স্বহস্তে সৃজন করিয়া চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন, সেই পরমব্রহ্ম

উপকারী পিতার চরণে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কি তাঁহার সাধনার মনোনিবেশ করিবে না? মানবজাতি কি কখন এত অকৃতজ্ঞ হইতে পারে?" শঙ্কক ভগবানের অপার করুণা স্মরণ করিয়া ভক্তি-গদগদ-চিত্তে বালকের ন্যায় তাঁহার চরণে সরল প্রার্থনা জানাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভাবাবেশে তাঁহার মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় সুষমায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

শঙ্করের মুখমণ্ডলে অভিনব জ্যোতি দর্শন করিয়া সর্দ্দারগণের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল; ঈশ্বর-প্রেম ও ভক্তিহীন শুষ্ক হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। সর্দ্দারগণ আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে শঙ্করকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিল, "শঙ্কর! কি করিলে আমাদের সেই পরমপিতার প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস ও ভক্তির উদ্রেক হয়, আমাদিগকে শিখাইয়া দাও। শঙ্কর! অদ্য হইতে তুমি আমাদের উপদেষ্টা ও গুরুস্থানীয় হইলে, তোমাকে আর কখন এই বনভূমি হইতে কোথাও যাইতে দিব না।"

মিকির-সর্দ্দারগণের শুষ্ক হৃদয় ভগবানের অপার করুণার ভক্তিরসে সিক্ত হইতে দেখিয়া, শঙ্কর হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে বার বার ভগবানের চরণে মস্তক নত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সর্দ্দারগণ! তোমাদের হৃদয় অন্যান্য উচ্চ গুণের আধার হইলেও ভগবৎপ্রেম ও ভক্তির একান্তই

অভাব ছিল। দয়াময়ের করুণায় সে অভাব পূরণ হইতে দেখিয়া আমার হৃদয় যুগপৎ আনন্দে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। এস সর্দ্দারগণ! আজ এই আনন্দের দিনে দয়ার আধার আমাদের পরম পিতার নাম গান করিয়া ধন্য হই। আনন্দে অধীর হইয়া শঙ্কর বিভুনাম গাহিতে গাহিতে আকাশের পানে চাহিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শঙ্করের ভাবাবেশ মিকির সর্দ্দারগণকেও বুঝি ভাসাইয়া লইয়া গেল। মিকির সর্দ্দারগণ প্রেমানন্দে ভাসিয়া নৃত্য করিতে করিতে শঙ্করের সহিত গাহিতে লাগিল—

তুমি গো আমার, আমি যে তোমার,
আর কিছু নাই জগতে;
দাও সত্য জ্ঞান, বাঁচাও মোর প্রাণ,
ডুবাও না আর মায়া মোহেতে।
অজ্ঞান আমরা,
ক্লান্ত হৃদয়ে সতত ছুটিয়া যাই;
অসত্য অনিত্য সুখের আশায়,
সুধু হেথা পিতা জীবন হারাই।
আমার আমার রবে, সব তেয়াগিয়া,
সদা যাই পিতা ছুটিয়া;
কেবা যে আমার, আর কেবা পর,
না ভাবি মোহে ডুবিয়া।

চির শূন্য হয়ে হৃদিটি আমার,

পড়ে থাক্ প্রভু এখানে,

হৃদয়ের বোঝা দাও নামাইয়া,

থাকি শুধু তব ধ্যান জ্ঞানে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:o:—

অপরাহ্ন সময়ে দ্বারকেশ্বরতীরে মুণ্ডেশ্বরী মন্দির সম্মুখে সন্ন্যাসী দয়ানন্দ আকাশের দিকে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিতেছেন। পরক্ষণে আবার বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। সাধক দয়ানন্দ, ভক্ত ও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী দয়ানন্দের—এই হাসি কান্নার মর্ম্ম সাধক ও ভগবৎভক্ত ব্যতীত কে হৃদয়ঙ্গম করিবে। সংসারী আমরা লোভ, মোহ ও স্বার্থপূর্ণ সংকীর্ণ হৃদয় লইয়া এই হাসি-কান্নার মর্ম্ম কি বুঝিব? অল্পবয়স্ক বালক পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া হস্তাক্ষর পাকাইবার জন্য যেরূপ কাগজের উপর মক্স করে;—স্থূললেখনী সংযোগে যেরূপ ক'য়ের উপর ম, ব'য়ের উপর চ লিখিয়া ক্রমাগত কাগজকে মসীবর্ণে পরিণত করে, আমাদেরও হৃদয় তদ্রূপ সংসার-মোহে মসীবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দয়ানন্দের হাসি-কান্নার মর্ম্ম এই অন্ধকার ভেদ করিয়া কখন হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে,—লোভের অতি উত্তেজনায়;—কাম, ক্রোধ, মোহাদির ভীষণ দংশনে সংসারী মানবের হৃদয় অতি শোচনীয়

অবস্থায় উপনীত হয়। সংসার-মোহাচ্ছন্ন হৃদয় লইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ সাধক দয়ানন্দের হাসি-কান্নার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের ন্যায় অাবশ্যক। দয়ানন্দের হাসিতে যে মহান্ শক্তি নিহিত আছে, সংসার-মোহাচ্ছন্ন মানব সেই শক্তির নিকট সদাই সঙ্কুচিত! দয়ানন্দের ঐ যে অশ্রুধারা বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে, সংসারী মানব, তুমি কি ধারণা করিতে পার, এক একটি এই অশ্রুবিন্দুর শক্তি কতখানি? এই অশ্রুবিন্দুর শক্তি হৃদয়ঙ্গম করা সংসারী মানবের একবারেই অসাধ্য। "আমি" ও "আমার" লইয়া ভ্রান্ত সংসারী মানব যেদিন তুমি দয়ানন্দের একটি মাত্র অশ্রুবিন্দুর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, সেই দিন তোমার আর "আমি" "আমার" বুলি মুখ দিয়া বাহির হইবে না। দয়ানন্দের হাসি কান্নার ভিতর কত উচ্চ ভাব, কত প্রেম, ভক্তি, আকুলতা নিহিত আছে, যে দিন তুমি জানিতে ও বুঝিতে পারিবে, সেদিন হইতে আর তুমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদির হস্তে ক্রীড়ার পুত্তলিরূপে সংসারে বিচরণ করিতে চাহিবে না। সেই দিন ভগবানের ভক্ত, দাস বা পুত্ররূপে তাঁহার আজ্ঞা পালনের জন্য দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইবে। সেই দিন হইতে তোমার "আমি"র আমিত্ব লোপ পাইবে, জগৎ আপনার হইবে। সেই দিন হইতে

তোমার কৃত কর্ম্ম বা চিন্তায় ভগবানের বিভূতি দর্শন করিবার শক্তি স্ফুরিত হইবে। মানব! সেদিন হইতে তুমি আর স্বার্থের প্ররোচনায় অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া নিজ ও পুত্র-কন্যার উদর পূরণ করিতে চাহিবে না। সেই দিন দয়ানন্দের ন্যায় তুমিও পরের জীবন রক্ষার্থে হাসিতে হাসিতে দেহের শেষ শোণিতবিন্দু দান করিতে চাহিবে। পরোপকারে ও পরের জীবন রক্ষার্থে নিজ জীবন উৎসর্গ, ভগবানের আজ্ঞা বোধে কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ, অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচরে যিনি ব্যাপ্ত, তাঁহাকে জানিবার ও চিনিবার জন্য তাঁহার দয়ার ভিখারী হইয়া তুমি দয়ানন্দের ন্যায় হাসিবে কাঁদিবে।

দয়ানন্দ আবার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। এবার দয়ানন্দের হাসির রবে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দয়ানন্দ অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "কোথায় তুমি নাই? জলে স্থলে, আকাশে, বৃক্ষে, লতায়, পত্রে, পল্লবে, দয়ানন্দের হৃদয়ে—প্রভু! তুমি সর্ব্ব স্থানেই রহিয়াছ, দয়ানন্দ তোমায় দেখিতে পায় না কেন? তোমার দয়া অবিরত জগতে ঝরিয়া পড়িতেছে, কিন্তু দয়াময়! এমনই তুমি প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছ যে তোমার দেখা দয়ানন্দ কিছুতেই পাইতেছে না।" দয়ানন্দ আবার বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

"জানি না, এই বালিকাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিতে
হইবে। বালিকা এখন আর বালিকা নহে,—যৌবন
সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। বালিকার পঞ্চদশ বৎসর বয়
উত্তীর্ণ হ ত চলিল। জানি না, ভগবান বালিকার ভবিষ্য
বালিকা পূর্ব্বো ভাবে অতীত হইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া
সম্মুখে উপবেশন। যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তাহা
দয়ানন্দ অনেকক্ষণ ম না। জানি না, সে জীবিত কি
দিকে চাহিয়া থাকিয়া হো পাইলে এই জটীল সমস্যার
বালিকা বলিল, "দেখ বাবা! রুদেব! দয়ানন্দের চিন্তাতার
আমা অপেক্ষাও ভালবাসে। ভরসা।"
তোমার কোলে উঠে বস্‌লো।" করিয়া হাসিয়া বলিলেন

দয়ানন্দের আবার চক্ষু দিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। দয়ানন্দ বলিলেন, "মা! তোর সরল সুন্দর মুখখানি দেখিলে বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তার বিরাটমূর্ত্তি আমার হৃদয়ে জাগরুক হয়! আহা! যিনি তোমার এরূপ সুন্দর মুখখানিকে সৃজন করিয়াছেন, না জানি, তিনি কতই সুন্দর! মা! তুই আমার সম্মুখে বসিয়া থাক্। তোর মুখখানি দেখিয়া আমি বিশ্বকর্ত্তার অপার সৌন্দর্য্য একবার হৃদয়ে অনুভব করি। যিনি তোমার মুখমণ্ডলে এত সরলতা ঢালিয়া দিয়াছেন, জানি না, সেই বিশ্বপিতা কি মহান্ সরলতার আধার! বালিকা, তোর মুখমণ্ডল

তোমার কৃত কর্ম্ম বা চিন্তায় ভগবানের বিভূতি দর্শন
করিবার শক্তি স্ফুরিত হইবে। মানব! সেদিন হইতে
তুমি আর স্বার্থের প্ররোচনায় অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া
লইয়া নিজ ও পুত্র-কন্যার উদর পূরণ করিতে চাহিবে না।
সেই দিন দয়ানন্দের ন্যায় তুমিও পরের জী
হাসিতে হাসিতে দেহের শেষ শোণিতবিন্দু কে স্বপ্নে দেখি-
চাহিবে। পরোপকারে ও পরে সয়া আপনার পদধূলি
জীবন উৎসর্গ, ভগবানের আ গের জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞ-
মনোনিবেশ, অখণ্ডমণ্ডলাকার লাগিলেন। এই দুটি হরিণ
তাঁহাকে জানিবার ও চিনিবা মৃত্যুমুখে পতিত হইল;—এক
হইয়া তুমি দয়ানন্দের ন্যায় কে কি করিয়া এত বড় করিলাম,
কত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বাবা!
তাঁহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিল,
দুই বাহু বিস্তার করিয়া তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিতে
গেলাম, আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গে
দেখিলাম, আমি ইহাদের দুই ভাইকে লইয়া মায়ের মন্দিরে
শয়ন করিয়া আছি।"

কথাগুলি বলিতে বলিতে বালিকার মুখমণ্ডল ম্লান ও
বিমর্ষ হইয়া গেল। টানা চক্ষু দুটি জলভারাক্রান্ত হইয়া
উঠিল। দয়ানন্দ বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া অনেক-
ক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন,

"জানি না, এই বালিকাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। বালিকা এখন আর বালিকা নহে,—যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। বালিকার পঞ্চদশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইতে চলিল। জানি না, ভগবান বালিকার ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ ভাবে অতীত হইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বালিকা যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তাহার সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাইলাম না। জানি না, সে জীবিত কি মৃত! গুরুদেবের দর্শন পাইলে এই জটীল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইত। গুরুদেব! দয়ানন্দের চিন্তাভার দূর করিবার তুমিই একমাত্র ভরসা।"

দয়ানন্দ একবার হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মা! সন্ধ্যাদেবী আগমন করিতেছেন, চল আমরা মায়ের মন্দিরে যাই।"

বালিকা দ্বারকেশ্বরে স্নান করিয়া আসিয়া সন্ধ্যা আরতির উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রজ্জলিত ঘৃত প্রদীপের ও কুঙ্কুমাদির মধুময় গন্ধে মন্দির পরিপূরিত হইল। দয়ানন্দ সন্ধ্যা-আরতি সমাপনান্তে মায়ের সম্মুখে ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিলেন। বালিকা মুণ্ডেশ্বরী মাতার সম্মুখে চক্ষু মুদিয়া করযোড়ে ধ্যানমগ্নাবস্থায় বাহ্যজ্ঞান হারাইল। রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত, বালিকা ও দয়ানন্দ বহিৰ্জ্ঞানহারা হইয়া ভগবৎ প্রেমে ভাসিয়া যাইতেছেন। হায়!

দয়ানন্দ ও বালিকার এই মহান্ সুখের মর্ম্ম আমরা অধম সংসারী মানব কি প্রকারে বুঝিব ?

রজনী তৃতীয় যাম অতীত হইবার আরও কিয়ৎক্ষণ পরে বালিকা চক্ষুরুন্মীলন করিল। বালিকার মুখমণ্ডলে তখনও অভাবনীয় অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ খেলা করিতেছে। বালিকা এইবার গৈরিক অঞ্চলখানি গলদেশে বেষ্টন করিয়া মায়ের কাছে কৃতাঞ্জলিপুটে কাহার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল। কাহার দর্শন আশায় যেন ব্যাকুল প্রাণে মায়ের কাছে আকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। বালিকার আকুল প্রার্থনায় দয়ানন্দেরও বুঝি ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল। দয়ানন্দ ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি উঠিয়া দাঁড়াইয়া, মা মা রবে রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মাগো ! দয়ানন্দ তোর করুণায় যদি চিরজীবন বঞ্চিত হয়, হউক ; এই অজ্ঞানা বালিকার কাতর প্রার্থনা কি শুন্‌বি নি মা ?"

দয়ানন্দ মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া কতক্ষণ মা মা রবে চীৎকার করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বালিকা প্রজ্বলিত দীপাধারে ঘৃত নিঃশেষ হইতে দেখিয়া ঘৃতকুম্ভ হইতে খানিকটা ঘৃত দীপে ঢালিয়া দিয়া দয়ানন্দের সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিল।

বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা ! আমরা যাহা চাই, তাহা কি চেষ্টা করিলে পাইতে পারি না ?"

দয়ানন্দ বালিকার প্রশ্নের মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত করিয়া এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে ' আহা! বালিকা যাহার জন্য ব্যাকুল, সে এই জগতে আছে কি না, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই।

দয়ানন্দ বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা! কেবল চেষ্টার দ্বারা সকল সময় সকল কার্য্য সিদ্ধ হয় না। চেষ্টার একটা ফল আছে বটে, কিন্তু ফল সকল সময় কার্য্যকারী হয় না। চেষ্টার পশ্চাতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে আরও একটা শক্তি না থাকিলে, আমরা যাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা করি, সে চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে না।"

বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! সে শক্তি কি?"

দয়ানন্দ।—মা! সে শক্তি পূর্ব্বের কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট। পূর্ব্বের কার্য্যশক্তি বর্ত্তমান চেষ্টার পশ্চাতে না থাকিলে কেবল ইহ-জন্মের চেষ্টায় সকল সময় সকল কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে না।

বালিকা।—বাবা! পূর্ব্ব কর্ম্মফলের সংস্রব না থাকিলেও কেবল ইহজন্মের তীব্র ও কঠোর চেষ্টায় কি আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে না?

দয়ানন্দ।—মা! যাহা হইবার নয় তাহা কখন মানুষের চেষ্টায় হইতে পারে না। ভগবানের দয়া বা দৈবশক্তি কঠোর চেষ্টার সঙ্গে মিলিত হইলে মনস্কামনা সিদ্ধির বাধা অন্তর্হিত হইয়া যায়। কঠোর কার্য্যসিদ্ধির জন্য ভগবানের চরণে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাইয়া, কঠোর পুরুষকার প্রয়োগে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যদি অগ্রসর হইতে পারি, তবে চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে।

বালিকা।—পিতঃ! দৈবশক্তির অভাব হইলেও কেবল পুরুষকার দ্বারা কি কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না?

দয়ানন্দ।—মা! দৈবশক্তি বা ভগবানের দয়াতেই দয়ানন্দের বিশ্বাস। পুরুষকার বা চেষ্টা দৈবশক্তির সাহায্য না লইয়া জগতে কতটুকু কার্য্য করিতে পারে তাহা দয়ানন্দের বুদ্ধির অগম্য! কঠোর শুষ্ক পুরুষকারের উপর ভগবানের করুণাধারা পতিত না হইলে সেই নির্জ্জীব পুরুষকার দ্বারা জগতের ক্ষুদ্র কার্য্যও সংসাধিত হইতে পারে না, দয়ানন্দের ইহাই হৃদয়ের ধারণা। মায়ের মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বিজন অরণ্যপ্রান্ত হইতে তুমি যে মা নব নব তরু-লতাদি আনিয়া রোপন করিয়াছ, ইহা তোমার চেষ্টাতেই হইয়াছে, স্বীকার করিলাম। ভগবানের করুণায় বা দৈবশক্তি-প্রভাবে যদি বৃষ্টিধারা পতিত হইয়া তরুলতা-

গুলিকে রক্ষা না করিত, তবে কি মা তরুলতাগুলিকে বর্দ্ধিত করিবার তোমার শত চেষ্টা ও অজস্র যত্ন ব্যর্থ হইয়া যাইত না? বৃষ্টি অভাবে তোমার এত যত্নের তরুলতাগুলি কি এতদিন মন্দির পার্শ্বের শোভাবর্দ্ধন করিতে পারিত?"

অরণ্যে বিহগকুল মনের আনন্দে চীৎকার করিতে করিতে দয়ানন্দ ও বালিকার কথোপকথন ভঙ্গ করিয়া দিল। দয়ানন্দ বলিলেন, "এস মা! পূর্ব্বাহ্নিক কর্ম্ম হইবার আর বিলম্ব নাই। আমাদের প্রভাত আরাধনার সময় হইয়াছে।"

বালিকা দ্বারকেশ্বর সলিলে স্নান করিয়া আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল। দয়ানন্দ স্নানাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে মা মা! রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল; মার্ত্তণ্ডদেব পশ্চিম গগনে দূর হইতে দূরান্তরে ঢলিয়া পড়িলেন। বালিকা ও দয়ানন্দ ধ্যান-নিমীলিতনেত্রে বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া তখনও মন্দির-মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন। সংসারী মানব! তোমরা কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, দয়ানন্দ ও বালিকা মন্দির-মধ্যে কি অনুপম আনন্দ উপভোগ করিতেছেন? রাজরাজেশ্বর, সম্রাট কোটী কোটী প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াও যে অতুলনীয়

আনন্দের আস্বাদন কখন পান নাই, ধন, মান, জ্ঞান, বিদ্যা বুদ্ধিতে সংসারে অদ্বিতীয় হইয়াও সংসারে যে আনন্দের মুখ কেহ কখন দেখিতে পায় নাই, দয়ানন্দ ও দয়ানন্দের কন্যা আজ সেই আনন্দ-সুধাপানে বিভোর হইয়া ভগবৎ-প্রেমে ভাসিয়া যাইতেছেন। সংসারী-মানব! তোমরা ক্ষণস্থায়ী জীবনে ক্ষণস্থায়ী সুখের পসরা মস্তকে লইয়া কয়দিনের জন্য কেবল মত্ত হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছ! যাও, স্ত্রীপুত্রসহ দয়ানন্দের ন্যায় মহাপুরুষের পদাশ্রয়ে যাইয়া প্রকৃত সুখানন্দের অন্বেষণ কর! তোমাদিগকে প্রকৃত সুখের পথ দেখাইবার জন্য কত শত মহাপ্রাণ দয়ানন্দ সংসারের চতুর্দ্দিকে ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তোমাদের প্রাণের আকুলতা যেদিন পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইবে, সেই দিনেই দয়ানন্দের ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠের দর্শন লাভ ঘটিবে! জানি না আর কত জন্মের পর তোমাদের প্রাণে আকুলতার উদ্রেক হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

বৎসরাধিক কাল অতীত হইয়া গিয়াছে, কৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের দুইটি যুবকের সহিত তুলসী ও শঙ্করের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন। এই এক বৎসরের মধ্যে কৃষ্ণমোহনকে প্রায় ছয় মাসের অধিককাল খাদ্যদ্রব্যাভাবে অনশনে কাটাইতে হইয়াছে। উপর্য্যুপরি সপ্তাহকাল উপবাসে সুখানন্দ ও রামানন্দ, কিছুমাত্র ক্লিষ্ট না হইয়া হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে দ্বারকেশ্বরের অঞ্জলি অঞ্জলি জলপান করিয়া গুরুদেবের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতেছেন। ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিরাম নাই! উভয়ের মুখমণ্ডল দৃঢ়তাব্যঞ্জক, মুখমণ্ডল দেখিলেই মনে হয় যে কার্য্যসাধন করিবার জন্য ইহারা অগ্রসর হইতেছে, তাহা সম্পন্ন না হইলে ইঁহাদের জীবনে বুঝি শান্তি নাই। এক বৎসরাধিক কাল দ্বারকেশ্বরের তীরে তীরে অরণ্যভূমির মধ্য দিয়া গমন করিতে করিতে ইহা-দিগকে কত বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, কত হিংস্র বন্যপশুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে;—কত ভীষণ দস্যুদলের আড্ডা বা আবাসস্থান অতিক্রম করিতে হইয়াছে,

তাহার সংখ্যা নাই। এত বিপদের সম্মুখীন হইয়াও উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য সুখানন্দ ও রামানন্দের তিলমাত্রও উৎসাহের হ্রাস হয় নাই। ইহারা যতই অভাবনীয় ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইতেছে, ততই ইহাদের উৎসাহ, উদ্যম ও বন্ধুপ্রীতি বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষ্ণমোহন ইহাদের অকুতোভয়, মনের দৃঢ়তা, হৃদয়ের বল ও পবিত্র বন্ধুত্বের পরিচয় পাইয়া মনে মনে ভাবিতেন—"হায়! ভারতের ঘরে ঘরে যদি এইরূপ ধর্ম্মভীরু, উৎসাহশীল, দৃঢ়চিত্ত যুবকের উৎপত্তি হইত, তবে ভারতের হাহাকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভাবী বংশধরগণকে কখন ব্যথিত হইতে হইত না।"

আজ সপ্তাহকাল অরণ্যের মধ্যে আহারোপযুক্ত ফল মূল পাওয়া যায় নাই। ক্ষুধায় ক্লান্ত শ্রান্ত সুখানন্দ ও রামানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া কৃষ্ণমোহন ব্যথিত হৃদয়ে বলিলেন,—"তোমরা অনাহারে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, অদ্য আর অধিকদূর অগ্রসর হইবার আবশ্যক নাই, এইস্থানে অপেক্ষা কর, আমি এই অরণ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখি, যদি আহারোপযুক্ত কোন প্রকার ফল মূল পাওয়া যায়।"

সুখানন্দ ও রামানন্দ আজ যারপরনাই ক্লান্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধাতুর হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং কৃষ্ণমোহনের কথায়

নিরুক্তি না করিয়া অরণ্য মধ্যস্থিত একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে স্তূপাকার শুষ্কপত্রের উপর উভয়ে শয়ন করিয়া নানা কথার আলোচনা করিতে লাগিল।

সুখানন্দ। ভাই, রামানন্দ! জগতে বন্ধুত্বের শক্তি কি অসাধারণ? যদি পবিত্র বন্ধুত্ব-প্রেমে আমাদিগকে সঞ্জীবিত না করিত, তাহা হইলে বোধ হয়, শঙ্করের অনুসন্ধানের জন্য জীবনকে তুচ্ছ করিয়া গুরুদেবের পশ্চাতে এতদিন অগ্রসর হইতে পারিতাম না।

রামানন্দ। ভাই! আমিও এই কথা মনে মনে আলোচনা করিতেছিলাম। এই স্বার্থময় সংসারে অকপট, নিঃস্বার্থ বন্ধু যাহার আছে, সে সহস্র দুঃখ বিপদের মধ্যে থাকিলেও সুখী। বন্ধুর সম্মিলন ইচ্ছার প্রবল পবিত্র শক্তিই আমাদিগের দূর হইতে দূরান্তরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে।

সুখানন্দ। তুমি কি বিশ্বাস কর রামানন্দ যে, ইহ-জীবনে আবার আমরা প্রিয়বন্ধু শঙ্করের সহিত মিলিত হইতে পারিব?

রামানন্দ। ভাই! গুরুদেবের বিশ্বাসই আমাদের বিশ্বাস! তিনি যাহা সূক্ষ্ম গভীর চিন্তা দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই সত্যে পরিণত হইবে। গুরুদেব বৃথা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সময় নষ্ট করিবার লোক নহেন;

আর তিনি ভ্রান্ত নহেন। শঙ্কর জীবিত আছে, চেষ্টা কা... অনুসন্ধান পাইলেও পাওয়া যাইতে পারে, ইহাই গুরুদেবের বিশ্বাস, সুতরাং আমার আশা আছে যে শঙ্করকে দেখিতে পাইব।

সুখানন্দ। ভগবান যেন গুরুদেবের অনুমান সত্যে পরিণত করেন। শঙ্করের ন্যায় অকপট বন্ধু এ জীবনে কেন, জন্ম-জন্মান্তরেও আবার পাইব কি না, কে বলিতে পারে,? ভাই রামানন্দ! জগতে যাহার বন্ধু নাই, তাহার জীবন মরুভূমি তুল্য। সংসার-তাপে তাপিত মানব প্রাণের বন্ধুর শীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে। সংসার-সংগ্রামে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইলে—অভাব দুঃখের নিষ্পেষণে প্রাণ যায় যায় হইলে,—সংসার-অশান্তির ভীষণ প্রজ্জ্বলিত অনলে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকিলে, অকপট ধার্ম্মিক বন্ধুর পবিত্র শীতল ছায়াই মানবের একমাত্র দাঁড়াইবার স্থল। মানব-জীবনে পলে পলে এরূপ বহু ঘটনার সম্মুখীন হইতে হয়, যে অবস্থায় নিঃসঙ্কোচে প্রাণ খুলিয়া কাহারও নিকট হৃদয়ের দুঃখ অশান্তি প্রকাশ করিবার উপায় থাকে না। গুরু, জনক, জননী, এমন কি, সহোদরের নিকটেও অনেক কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতে হয়, এরূপ অবস্থায় অকপট ধার্ম্মিক বন্ধুই একমাত্র আশ্রয়স্থল। আমরা পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্যফলেই শঙ্করের ন্যায় বন্ধুরত্ন

লাভ করিয়াছিলাম। জানি না, রামানন্দ! আমরা কি পাপে এরূপ বন্ধুরত্নকে হারাইলাম।

সুখানন্দ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। শোক, দুঃখ, হা-হুতাশ ও অশ্রুপাতে বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেল। এদিকে সন্ধ্যাদেবী ধীরে ধীরে আগমন করিয়া বিজন অরণ্যভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। গুরুদেব বহুক্ষণ পূর্ব্বে ফলাদির অন্বেষণে অন্ধকারময় বিজন অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সন্ধ্যার অন্ধকারে বনভূমি আচ্ছন্ন, এখনও তিনি প্রত্যাগমন করিলেন না। রামানন্দ ও সুখানন্দ গুরুদেবের অদর্শনে বিচলিত হইয়া পড়িল।

ভীষণ হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্য, ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি অগণিত নররক্ত-লোলুপ জীব সন্ধ্যাগমে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। অদূরে পশুরাজ সিংহের বিকট গর্জ্জন ও বন্যহস্তীর বিকট বৃংহতী শ্রুত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে গাঢ় অন্ধকারে বনভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। জনমানবহীন, অজানিত অন্ধকারময় ভীষণ অরণ্যে কোন্ দিকে গুরুদেবের অন্বেষণ করিবে। চিরবনবাসী অরণ্যপশুরও এই গাঢ় অন্ধকারে দিক্ নির্ণয় করা অসাধ্য! যতই রজনী অধিক হইতে লাগিল, রামানন্দ ও সুখানন্দ ততই গুরুদেবের জন্য ব্যাকুল হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

আরও বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেল, রজনী দেবীর ঘোরা মূর্ত্তিতে অরণ্য ক্রমশঃ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। রামানন্দ ও সুখানন্দের নির্ভীক হৃদয়েও উপস্থিত বিপদে ঈষৎ ভয় আসিল। কৃষ্ণমোহনের উপযুক্ত শিষ্য রামানন্দ ও সুখানন্দ ভয় কাহাকে বলে কখন জানে না; তাহাদের নিজ জীবনে কিছুমাত্র মমতা নাই; তাহারা কেবল গুরুদেবের বিপদাশঙ্কা করিয়া অস্থির ও উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

"কোথায় তুমি গুরুদেব! এই দ্বিতীয় যমসদন সদৃশ ভীষণ অরণ্যে আশ্রিত শিষ্যদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া রহিয়াছেন? বলিয়া দাও হৃদয়ের আরাধ্য দেব! কোন্ দিকে—কোথায় যাইলে আপনার চরণ-দর্শন পাইব?"

গুরুর অদর্শনে তাঁহার প্রাণের আশঙ্কা করিয়া রামানন্দ ও সুখানন্দ অবিরাম অশ্রুপাত করিতে করিতে গগনভেদী চীৎকার করিতে লাগিল। ভীষণ চীৎকারের প্রতিধ্বনি বনভূমি কম্পিত করিয়া কেবল আকুলতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল—গুরুদেবের আগমনের কোন চিহ্নই দৃষ্টিগোচর হইল না। শিষ্যদ্বয় ক্লান্ত, ও হতাশ হৃদয়ে যে দিকে গুরুদেব গমন করিয়াছিলেন, সহস্র বাধা তুচ্ছ করিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল, কিন্তু নিবিড় অরণ্যে বৃহৎ কণ্টকাদি বৃক্ষে ক্ষতবিক্ষত হইয়া

পদে পদে তাহারা বাধা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কয়েক দিন অল্পাহারে ও অনাহারে পথ পর্য্যটন করিয়া অর্দ্ধমৃতবৎ অরণ্যে শুষ্কপত্রের উপর ক্লান্তদেহ ন্যস্ত করিয়া যদিও রামানন্দ ও সুখানন্দ একটু শ্রান্তিদূর করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে গুরুদেবের উদ্দেশে মুহুর্মুহু ব্যাকুল চীৎকারে পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল, কণ্টকবৃক্ষে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উভয়ের দেহ হইতে অজস্রধারে রুধিরপাত হইতে লাগিল। অন্ধকারে বারবার সম্মুখের প্রকাণ্ড বৃক্ষে মস্তকে আঘাত লাগিয়া তাহাদের চৈতন্যলোপ হইবার উপক্রম হইল। গুরুভক্ত তেজস্বী যুবকদ্বয় আরও বহুক্ষণ সেই নিবিড় অন্ধকার ও কণ্টকাদিযুক্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের আঘাতের সহিত যুদ্ধ করিয়া মৃতের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে একজন যমদূতের ন্যায় দস্যু আসিয়া উভয়কে স্কন্ধে তুলিয়া নিবিড় অরণ্যের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। হায়! হায়! অকালে এই বিজন অরণ্যে বিঘোরে সুখানন্দ ও রামানন্দের জীবন-প্রদীপ বুঝি নির্ব্বাণ হইয়া যায়!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণমোহন সুখানন্দকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া ফলাদির অন্বেষণে নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহু অনুসন্ধানেও মনুষ্যের আহারোপযুক্ত ফল মূলাদি কিছুই প্রাপ্ত হইলেন না। কৃষ্ণমোহন আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। সূর্য্য-অস্তগমনোন্মুখ সময়ে অদূরে লোহিত রশ্মি পড়ায় কৃষ্ণমোহন দেখিতে পাইলেন, সেই অরণ্যের মধ্যে একটি সুন্দর উদ্যান শোভা পাইতেছে। আম্র জাম, কদলী ও দাড়িম্বাদি নানাবিধ উপাদেয় ফলের বৃক্ষ কে যেন সযত্নে এই উদ্যানে রোপণ করিয়া রাখিয়াছে। এই বিজন অরণ্যমধ্যে মনুষ্যহস্ত-রোপিত বৃক্ষাদি কোথা হইতে আসিল? তবে কি এখানে মনুষ্যের বসতি আছে? চতুর্দ্দিকে আরও নব নব বৃক্ষাদি দেখিয়া কৃষ্ণমোহনের কৌতুহল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কৃষ্ণমোহন একবার মনে করিলেন, এখানে কোন মনুষ্যের বসতি আছে কি না দেখিবেন, কিন্তু পরক্ষণে সুখানন্দ ও রামানন্দের কথা মনে পড়িল। কৃষ্ণমোহন আর কালবিলম্ব না করিয়া

সুন্দর সুপক্ক কতকগুলি দাড়িম্ব ফল আহরণ করিয়া প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণমোহন যেদিকে গিয়াছিলেন গাঢ় অন্ধকারে সেদিক ঠিক করিতে না পারিয়া, চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নিবিড় অন্ধকারময় অরণ্য —শ্রান্ত কৃষ্ণমোহন পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাগমনের জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন ততই দিক্‌ভ্রষ্ট হইয়া আরো বিজন অরণ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিষ্ক্রমনের আর উপায় রহিল না।

চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ক্লান্ত হওয়া অপেক্ষা একটা দিক্ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য ভাবিয়া কৃষ্ণমোহন সম্মুখের দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কণ্টক বৃক্ষের ঘর্ষণে কৃষ্ণমোহনের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রুধির ঝরিতে লাগিল। ভয় কাহাকে বলে, তাহা কৃষ্ণমোহন জানেন না, কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হইয়া সম্মুখে ভয়ানক বিপদ অবলোকন করিয়াও কখন পশ্চাৎপদ হন নাই; কিন্তু ভগবান আজ কৃষ্ণমোহনকে এ কি বিপদে ফেলিলেন! কৃষ্ণমোহনের নিজ বিপদের আশঙ্কা ক্ষণেকের তরেও মনে উদিত হইল না; সুখানন্দ ও রামানন্দের জন্যই তাঁহার প্রাণ ক্রমশই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। হায়! এতক্ষণে বুঝি তাহারা ভীষণ হিংস্র জন্তুর উদর-গহ্বরে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা ক্ষুৎপিপাসার অসহনীয়

যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কৃষ্ণমোহন কাতরচিত্তে ভগবানের নাম করিতে করিতে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হঠাৎ নিবিড় অন্ধকারে সম্মুখের একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষে কৃষ্ণমোহন মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। ভীষণ আঘাত। কৃষ্ণ-মোহন বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়ন কোণে দুই এক বিন্দু অশ্রু অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িল। কয়েকমুহূর্ত্ত পরে কৃষ্ণমোহন মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। জানি না, তাঁহার মনোমধ্যে কি ভাবের উদয় হইল? কৃষ্ণমোহন অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ভগবান! জীবনে এরূপ বিপদে কখনও পড়ি নাই। প্রভো! মানুষের বিপদ ও দুঃখ, সে ত তোমার করুণার চিহ্ন! আজ এই অধম কৃষ্ণমোহনের উপর তোমার যে করুণা ঝরিয়া পড়িতেছে, জানি না বিভু! ইহাতে আমার কি সম্পদ লাভ হইবে?" কৃষ্ণমোহন কর-যোড়ে ভগবানকে বার বার প্রণাম করিয়া নিবিড় অন্ধ-কারে ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

"কে রে আমাদের আড্ডার সন্ধান পাইলি?" এই কর্কশস্বর কৃষ্ণমোহনের কর্ণে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে যমদূতাকৃতি দুইজন দস্যু কৃষ্ণমোহনের সম্মুখে উপস্থিত হইল! একজন ত্বরিত হস্তে কৃষ্ণমোহনের দুইবাহু পৃষ্ঠের দিকে আনিয়া লতার দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিল। সঙ্গে

সঙ্গে একটা ভীষণ সাঙ্কেতিক রব উত্থিত হইল। সে রব শূন্যে মিলিত হইতে না হইতে আর দুইজন দস্যু প্রজ্জ্বলিত মশাল হস্তে সেই স্থলে উপস্থিত হইল। মশালের আলোকে কৃষ্ণমোহন দেখিলেন, চারিজন দস্যু প্রকৃতই যমদূতের ন্যায়! এরূপ নিষ্ঠুরাকৃতি ভীষণ দস্যু তিনি জীবনে কখন দেখেন নাই। একজন দস্যু বলিল, "চল ইহাকে গুরুজীর কাছে লইয়া যাই।" অন্য একজন দস্যু বলিল, "না না জীবন্ত অবস্থায় আড্ডায় লইয়া যাওয়া হইবে না, একবারে কার্য্য শেষ করিয়া লইয়া গেলে গুরুজী সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার দিবেন।" পরস্পরের মতভেদ হওয়ায় গুরুজীর আদেশ লওয়াই স্থিরীকৃত হইল। একজন গুরুজীকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই একটা ভীমকায় দস্যু প্রত্যাগমন করিয়া বলিল,—"গুরুজীর আদেশ, শিকার তাঁহার কাছে এখনই হাজির করিতে হইবে। আজ মায়ের কাছে তিনটি নরবলি হইবে।"

কৃষ্ণমোহন গম্ভীরভাবে চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ যোগীর ন্যায় বসিয়া আছেন। বিভুর অপার করুণা স্মরণ করিয়া কৃষ্ণমোহনের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিতেছে। কৃষ্ণমোহন ভাবিতেছেন, প্রভো। জীবন-সংগ্রামে বিপদের সম্মুখীন হইয়া যে তোমার করুণা উপলব্ধি না করিতে পারে, সেই বিপদে বিহ্বল হয়।

একজন দস্যু সজোরে কৃষ্ণমোহনের মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করিল। বৃক্ষের আঘাতে কৃষ্ণমোহন তখনও মস্তকে বেদনানুভব করিতেছিলেন, মুষ্ট্যাঘাতে কৃষ্ণমোহন চক্ষুরুন্মীলন করিয়া একদৃষ্টে দস্যুদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন আরও একজন দস্যু হস্তোত্তোলন করিয়া কৃষ্ণমোহনের দিকে অগ্রসর হইল। কৃষ্ণমোহন জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দস্যু। আর একপদও অগ্রসর হইও না।"

কৃষ্ণমোহনের নির্ভয় তেজোব্যঞ্জক গম্ভীরস্বর শুনিয়া দস্যু চতুষ্টয় মুহূর্ত্তকাল কৃষ্ণমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পরমুহূর্ত্তেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাদের বিকট হাস্যে বনভূমি কম্পিত হইতে লাগিল।

"মূষিক হইয়া সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করিয়া এখনও কিচিমিচি শব্দে দম্ভ প্রকাশ করিতেছিস্?" এই বলিয়া একটা দস্যু কৃষ্ণমোহনের পৃষ্ঠদেশে সজোরে পদাঘাত করিল। নির্ভীক, সৎসাহসী, তেজস্বী কৃষ্ণমোহন আর সহ্য করিতে পারিলেন না। লৌহ-শৃঙ্খলের ন্যায় অরণ্যের কঠিন লতাবন্ধন অনায়াসেই ছিন্ন করিয়া রোষকষায়িত লোচনে দণ্ডায়মান হইলেন। কৃষ্ণমোহনের দুই চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। দস্যুগণ যে লতাবন্ধনে বন্যহস্তী বন্ধন করিতে সক্ষম হইয়াছে, অনায়াসে

কৃষ্ণমোহনকে সেই লতাবন্ধন ছিন্ন করিতে দেখিয়া তাহারা পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল।

কৃষ্ণমোহন আবার তেজোব্যঞ্জক গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা কি আমার সহিত বল প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিস্?"

পদাঘাতকারী দস্যু বলিল,—"তোর ন্যায় একটা পিপীলিকাকে গুরুজীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মারিয়া লাভ কি?"

অপর একটা দস্যু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কৃষ্ণ-মোহনকে বলিল, "আমাদের গুরুজীর আদেশ, জীবন্ত অবস্থায় তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে হইবে, নচেৎ এতক্ষণ তোর মুণ্ড লইয়া আমাদের নর-মুণ্ডমালিনীর গলদেশে ঝুলাইয়া দিতাম।"

"এখন তোরা কি করিতে চাস্ তাই বল্?" এই বলিয়া কৃষ্ণমোহন একবার আকাশের দিকে চাহিলেন।

একজন দস্যু। তোকে আমাদের গুরুজীর কাছে লইয়া যাইব।

কৃষ্ণ। তবে চল্।

এক দস্যু। তোকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইব।

কৃষ্ণ। বন্ধনের প্রয়োজন?

এক দস্যু। তুই যদি পলাইয়া যাস্, অন্ধকারে

খুঁজিয়া সময় নষ্ট করিতে হইবে। বিলম্বে গুরুজী রাগ করিবেন।

কৃষ্ণ। আমাকে পথ দেখাইয়া চল্, আমি তোদের অভিলষিত স্থানে পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব।

এক দস্যু। তোর কথায় বিশ্বাস কি, যদি তুই পলাইয়া যাস্।

কৃষ্ণ। তোদের ন্যায় দস্যু অপেক্ষা মিথ্যাকে কৃষ্ণ-মোহন অধিক ভয় ও ঘৃণা করে।

এক দস্যু। আচ্ছা, আমরা দুইজন অগ্রে ও দুই জন পশ্চাতে থাকিব, তুই মধ্যস্থলে কুক্কুরের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে আয়।

কৃষ্ণমোহন রোষকষায়িতলোচনে একবার দস্যু-চতুষ্টয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। কৃষ্ণমোহন ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে, আরও দুইজনকে বলি প্রদান করা হইবে। কৃষ্ণমোহন স্থিরনিশ্চয় করিয়াছেন যে, রামানন্দ ও সুখানন্দ দস্যু-কবলে পতিত হইয়াছে। সুতরাং অনতিবিলম্বে যথাস্থানে উপস্থিত হইবার জন্য বাঙ-নিষ্পত্তি না করিয়া দস্যুগণের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পাঠক! আমার জীবন-সংগ্রামে প্রতি অধ্যায়ে যে যে ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, ইহা যেন অতিরঞ্জিত বা

স্বকপোলকল্পিত উপন্যাস বলিয়া গ্রহণ না করেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ইংরাজশাসন এখনকার ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে বিজন অরণ্যে প্রবল প্রতাপ দস্যুগণের আড্ডা ছিল। সহজে কেহই তাহাদের অনিষ্ট সাধন করিতে পারিত না। ইহারা এই অরণ্যনিবাস হইতে মাসাধিক কালের দূর পথ পর্য্যন্ত গমন করিয়া ধন রত্ন লুণ্ঠন করিত। এই অধ্যায়ের বর্ণিত ঘটনায় কৃষ্ণমোহন একটি দস্যুর আড্ডায় আবদ্ধ হইয়া অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

দস্যুগণের আড্ডা বা আবাসস্থানে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণমোহন যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। কৃষ্ণমোহন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণমোহন দেখিলেন, অতি নিবিড় অন্ধকারময় অরণ্য! বহু নিবিড় অরণ্য অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এরূপ ভয়াবহ অন্ধকারময় অরণ্য কুত্রাপিও তিনি দর্শন করেন নাই। দ্বিপ্রহর দিবাভাগেও এই স্থান অমাবস্যার দ্বিতীয় প্রহর রজনীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যস্থলে দীর্ঘ প্রস্থে প্রায় শত হস্ত পরিমিত ভূমিখণ্ডে কোন বৃক্ষ-লতাদি দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই পরিস্কার ভূমিখণ্ড চতুর্দ্দিকে নিবিড় অরণ্যে

বেষ্টিত। একদিকে একটি অতি সঙ্কীর্ণ পথ, সেই পথ অহোরাত্র কয়েকজন ভীষণকায় দস্যু-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকারও সে পথ দিয়া প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। সে পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া কোন্ দিক দিয়া গিয়াছে, সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহা কাহারও জানিবার উপায় নাই। শতাধিক দস্যু সেই পথের স্থানে স্থানে পাহারায় নিযুক্ত। দস্যুদলপতির দলে প্রায় চারিশতাধিক লোক। ইহাই দস্যুগণের সদর বাড়ী। প্রতি মাসে একদিন দস্যুগণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া, গুরুজীর নিকট স্ব স্ব কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হয়। ইহার কিঞ্চিৎ দূরে মৃত্তিকানিম্নে গুরুজীর আবাসস্থান, নরমুণ্ডমালিনীর মন্দির ও দস্যুগণের গুপ্তগৃহ। পুরাতন ও উপাধিধারী দস্যুগণই সর্ব্বদা এই স্থানে যাতায়াত করিতে পারে। অন্যান্য দস্যু গুরুজীর আদেশ মত কার্য্যোপলক্ষে সময়ে সময়ে পাতাল-পুরীতে গমন করিতে পায়। দস্যুগণের নানারূপ উপাধি আছে, তন্মধ্যে কয়েক জনের উপাধি বা নাম কৃষ্ণমোহন শুনিতে পাইলেন। "শত মাথা" অর্থাৎ যাহারা একশত নরহত্যা করিয়া গুরুজীকে উপহার দিতে পারিয়াছে। "শত পদ্ম" অর্থাৎ যাহারা শত্রুপক্ষীয় শত জীবন্ত ব্যক্তির চক্ষু উৎপাটন করিয়া নরমুণ্ডমালিনীর পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছে।

"ফুলবন" অর্থাৎ যাহারা লুন্ঠিত দ্রব্যের সহিত সুশ্রী সুন্দরী যুবতীকে আনিয়া গুরুজীর পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছে। "তোড়া রাজ" অর্থাৎ যাহারা একরাত্রে জমিদারের খাজনা-খানা লুটিয়া শত শত টাকার তোড়া গুনিয়া গুরুজীকে প্রণামী দিতে পারিয়াছে।

দস্যু চতুষ্টয় যখন কৃষ্ণমোহনকে পাতালপুরীর সিংহদ্বারের নিকট উপস্থিত করিল, তখন দস্যুগণ, চিরন্তন নিয়মানুসারে কৃষ্ণমোহনের চক্ষু দুটি বন্ধন করিতে অগ্রসর হইল। কৃষ্ণমোহন রোষকষায়িতলোচনে দস্যু চতুষ্টয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আবার আমার গাত্রে হস্তার্পণ করিতেছ?"

দস্যু। তোর চক্ষু বন্ধন করিয়া গুরুজীর নিকট লইয়া যাইব।

কৃষ্ণ। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি?

দস্যু। আমাদের গুপ্তপথ কাহাকেও জানিতে দিবার গুরুজীর হুকুম নাই।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমি তোমাদের সহিত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যাইব, নরকালয়ের পথ দেখিবার ইচ্ছা নাই।

দস্যু। তুই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছিস, যতক্ষণ আমাদের আদেশ না পাইবি, ততক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবি।

কৃষ্ণ। আমার মুখের কথাতেই তোমরা প্রতিজ্ঞা বলিয়া মনে করিতে পার।

দস্যুগণ কিয়ৎক্ষণ কি কথোপকথন করিল। কথোপকথনান্তে "আচ্ছা, তাহাই হউক" বলিয়া কৃষ্ণমোহনকে চক্ষু দুটি মুদ্রিত করিতে বলিল। কৃষ্ণমোহন বিনা প্রতিবাদে চক্ষু দুটি মুদ্রিত করিয়া দস্যুগণের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন।

প্রায় দুই দণ্ডকাল কৃষ্ণমোহন দস্যুগণের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন। কৃষ্ণমোহন কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখনও তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন। হঠাৎ পুতিগন্ধে তাঁহার নাসিকারন্ধ্র পূর্ণ হইল, সে গন্ধ অতিশয় অসহনীয়, ন্যক্কারজনক। এমন সময়ে দস্যুদল "জয় গুরুজীর জয়" "জয় নরমুণ্ডমালিনীর জয়" ইত্যাকার বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। কৃষ্ণমোহন বুঝিলেন এইবার গুরুজীর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। একজন দস্যু অতি কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল,—"বড়ই জোর প্রকাশ করিতেছিলি, এইবার এইবার ভাল করিয়া আমাদের গুরুজীকে ও নরমুণ্ডমালিনী মাকে দেখ্‌—তোর মৃত্যু সন্নিকট।"

একটা দস্যু আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,

"আজ মা পেট ভরিয়া নররক্ত পান করিবে, এই বলবান মহিষের দেহে অনেক রক্ত আছে।" অপর একজন বলিল, "অনেক দিন নরবলি বন্ধ ছিল, আজ মা একসঙ্গে তিনটি বলি গ্রহণ করিবেন।"

কৃষ্ণমোহন নিজ প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য এতক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছিলেন; এইবার তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। কৃষ্ণমোহন যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেইদিকেই ভীষণ ভয়াবহ দৃশ্য! ইহারা কি মানুষ না রাক্ষস? ইহাদের নির্দ্দয়তা রাক্ষস বা পিশাচের নির্দ্দয়তাকেও পরাস্ত করিয়াছে। গুরুজী সয়তান বা দানবের মূর্ত্তিতে একটি মৃত্তিকা-বেদীর উপর বসিয়া আছে। তাহার মুখমণ্ডলে পাপ, নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা পূর্ণমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে;—তাহাকে দেখিলেই ভয়, ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক হয়। গুরুজী কাপালিক মূর্ত্তিতে বিরাজমান। বক্ষঃস্থল সিন্দুরে চর্চ্চিত, সুদীর্ঘ নাসিকা অল্প অল্প সিন্দুরে রঞ্জিত। কপালে স্রক চন্দনাদি লেপন করিয়াছে। দীর্ঘাকার ভীমাকৃত দেহ দেখিলেই ভয়ের উদ্রেক হয়। গলদেশে দোদুল্যমান হাড়ের মালা, সম্মুখে একটা দীর্ঘ ত্রিশূল প্রোথিত রহিয়াছে। ত্রিশূলটা দীর্ঘে ছয় সাত হস্তের ন্যূন হইবে না। ত্রিশূলফলক ঝক্

ঝক্‌ করিতেছে, তদুপরি মাঝে মাঝে শোণিতের চিহ্ন বর্ত্তমান। কত নরনারীর হৃদয়ে এই ত্রিশূল বিদ্ধ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। একটি সদ্য প্রস্ফুটিত জবার মালা কাপালিকের গলদেশে হাড়-মালার সহিত ঝুলিতেছে, তাহাতে সেই পৈশাচিক মূর্ত্তি আরও ভীষণ বলিয়া বোধ হইতেছে। বেদিকার সম্মুখেই এক দেবীমূর্ত্তি! দেবীমূর্ত্তি পাষাণময়ী কি মৃত্তিকায় গঠিত, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। নরমুণ্ডমালাতেই দেবী আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইনিই দস্যু-গণের পূর্ব্ব-কথিত নৃমুণ্ডমালিনা। দেবীর গলদেশে নরমুণ্ডমাল শোভা পাওয়ায় দেবীকে নররক্ত-লোলুপ বলিয়া যেন প্রকাশ করিতেছে। মুণ্ডমালার নরমুণ্ডগুলি শতাধিক, এই শতা-ধিক নরমুণ্ডের মধ্যে প্রায় বিংশতটি মুণ্ড অতি অল্প দিনের বলিয়াই বোধ হয়। কারণ এখনও উহা বিকৃত হয় নাই। দেবীকে দেখিলে ভক্তির পরিবর্ত্তে ভয়ের উদ্রেক হইয়া থাকে। দেবীর সম্মুখেই স্তূপাকারে বিল্বপত্র, —বিল্বপত্রের সম্মুখে একটা যূপকাষ্ঠ প্রোথিত। নরমুণ্ড-মালিনীর গৃহের চতুর্দ্দিকে কোথাও নরমুণ্ড, কোথাও অস্থির মালা, কোথাও নরকঙ্কাল ভীষণত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

কৃষ্ণমোহন গুরুজীর মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই ঘৃণাভরে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, সেদিকেও

আর চাহিতে পারিলেন না। কৃষ্ণমোহন সেই নরকপুরীর যেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, ঘৃণা ও ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতেছে। যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই ভীষণ, ভয়াবহ. ঘৃণিত দৃশ্য। মুহুর্মুহুঃ কৃষ্ণমোহনের শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে। কৃষ্ণমোহন কেবল দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতেছেন, চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর কৃষ্ণমোহনের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণমোহন ভাবিতেছেন, হা ভগবান! কি পাপে এই ভীষণ নরক দর্শন হইল? কৃষ্ণমোহন আর চাহিতে পারিলেন না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন।

একজন দস্যু আসিয়া গুরুজীর কাণে কাণে কি কথা বলিল। গুরুজী বেদিকার পশ্চাতে একটা গুপ্ত-গৃহে প্রবেশ করিল। অন্ধকারময় গুপ্তগৃহে একটি অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানমগ্নাবস্থায় বসিয়া আছেন।

আহা! কি সুন্দর মূর্ত্তি! দেখিলেই পূর্ণযুবতী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আবার নির্ব্বিকারচিত্তে নিরীক্ষণ কর, কে বলিবে যুবতী? অজ্ঞানা বালিকার ন্যায় চঞ্চলতা, সরলতা, যুবতীর মুখমণ্ডলে ক্রীড়া করিতেছে! দেখিলেই স্নেহ, দয়া, করুণা ও প্রীতির উদ্রেক হয়। যুবতী আপন-

পর জানে না, পিশাচের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়াও পিশাচের পৈশাচিক উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। পিশাচশ্রেষ্ঠ গুরুজীর মুখের দিকে বালিকা এক একবার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে।

বালিকা বালিকা নহে, বয়সে পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিবার উপক্রম করিতেছে। আহা! কি সুন্দর গঠন—নিখুঁত অঙ্গসৌষ্ঠব। যুবতীর সর্ব্বাঙ্গ হইতে সাত্বিকভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মুখের কমনীয় পবিত্র জ্যোতিঃ দেখিলে অতি পাষণ্ড কামুকেও মস্তক অবনত করিতে হয়। চিরজীবন নরহত্যা, স্ত্রীহত্যা, লুণ্ঠন, ডাকাইতি প্রভৃতি পাপ কার্য্যে যাহাদের হৃদয় মন কলুষপঙ্কে ডুবিয়া আছে,—স্নেহ, মায়া, করুণা, ধর্ম্মভয়, ভক্তি প্রভৃতি যাহাদের হৃদয় ছাড়িয়া চিরতরে পাপ সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়াছে, বালিকার মুখ-কমল অবলোকনে তাহাদেরও বুঝি পূর্ব্বোক্ত সৎবৃত্তিগুলি পাষাণহৃদয় ভেদ করিয়া এক-একবার উঁকি মারিবে। ঐ দেখ, বালিকার এক একটি প্রশ্নে পাষণ্ড গুরুজীর মুখমণ্ডল কি এক প্রকার হইয়া যাইতেছে, ললাট বার বার কুঞ্চিত হইয়া মুখ বিবর্ণ হইতেছে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, বার বার চারিদিকে চাহিয়া পাপের অবতার গুরুজী যুবতীর প্রশ্নের উত্তর দিতেছে। যুবতী সরলা বালিকার ন্যায় গুরুজীকে আবার

প্রশ্ন করিল,—"তুমি যদি দেবীর পূজা কর তবে আমায় বাবার কাছ থেকে চুরি করিয়া আনিয়া অকারণ কষ্ট দিতেছ কেন? বিনা কারণে অপরের মনে কষ্ট দিলে যে পাপ হয়?"

গুরুজী। সুন্দরী তোমায় এখনও পর্য্যন্ত কোন কষ্টই দিই নাই! তোমাকে আমার অপেক্ষাও যত্নে রাখিবার আদেশ প্রদান করিয়াছি। তুমি আমার কথায় যদি সম্মত হও, পরমসুখে থাকিয়া আমার ন্যায় সকলের উপর সাম্রাজ্ঞীরূপে প্রভুত্ব করিতে পারিবে।

যুবতী। যে পাপ কথা কল্য বার বার আমাকে শুনাইয়াছ, সে পাপ কথা আর মুখে আনিও না! আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই, তবে আমার মনে ব্যথা দিতেছ কেন?

গুরুজী। দেখ্ তুই বড়ই সুন্দরী, তোর কথাগুলিও সুমিষ্ট, সেই জন্য তোর জীবন নষ্ট করিতে ইতস্ততঃ করিতেছি। আমার কথায় সম্মত না হইলে তোকে নিশ্চয়ই আজ মায়ের কাছে বলি প্রদান করিব।

যুবতী। বাবার নিকট শুনিয়াছি, জগতের উপকার ও মানুষকেই সুখী করাই জীবের কর্ত্তব্য। আমাকে বলি প্রদান করিলে তোমার যদি সন্তোষলাভ হয়, আমি আহ্লাদের সহিত জীবন দান করিব। আমার মৃত্যু-সংবাদ

দয়া করিয়া পিতাকে পাঠাইয়া দিও, তিনি হয়ত আমার অনুসন্ধান করিতেছেন।

ভুবনমোহিনী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী যুবতীর সহিত কথা কহিতে কহিতে দস্যু-দলপতি একবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। পাষণ্ড কামোন্মত্ত হইয়া যুবতীকে কহিল, "সুন্দরী! তোমাকে আমি কখনই প্রাণে মারিব না, সর্ব্বক্ষণ তোমায় হৃদয়ে রাখিয়া অধর-সুধাপানে চিরজীবনের পিপাসা মিটাইব।" পাষণ্ড আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। যুবতীর পবিত্র নিষ্পাপ দেহ দুই বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিল। যুবতী সজোরে গুরুজীর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়া গুপ্তদ্বার দিয়া যে স্থলে কৃষ্ণমোহন দাঁড়াইয়াছিলেন, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে তথায় যাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। যুবতীর এত শক্তি কোথা হইতে আসিল? বিজ্ঞানবিদেরা এ তত্ত্বের মীমাংসা করিতে পারিবেন না। সতীর সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য যে দৈহিক শক্তি হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা সেই আদ্যাশক্তির প্রেরিত—ইহার জড়দেহের সহিত সম্পর্ক নাই।

নরাধম গুরুজী ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বেদিকার উপর আসিয়া উপবেশন করিল। গুরুজীর ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া দস্যুগণ করযোড়ে

গুরুজীর সম্মুখে দণ্ডায়মান—কাহারও মুখে একটি কথা বাহির হইতেছে না।

দেখিতে দেখিতে পাষণ্ড গুরুজী কালান্তক মূর্ত্তিতে একবার প্রোথিত ত্রিশূলে হস্তার্পণ করিল। আবার কি মনে করিয়া ত্রিশূল পরিত্যাগ করিয়া যুবতীর দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া রহিল। ভীষণ প্রতাপ, অরণ্যের একচ্ছত্র সম্রাট, চারিশতাধিক ভীষণকায় দস্যুর দলপতি, গুরুজী আজ সামান্য পঞ্চদশ বর্ষীয়া যুবতীর পদাঘাতে যে লাঞ্ছনা, অপমান ভোগ করিল, তাহার জীবনকালে এরূপ বুঝি দ্বিতীয়বার ঘটে নাই। দস্যু দলপতি কত যুদ্ধ জয় করিয়াছে, কত লোকের ধনপ্রাণ হরণ করিয়াছে, কত সতীর সতীত্ব নাশ করিয়াছে, লুণ্ঠনকার্য্যে অগ্রসর হইয়া ঘটনাবৈগুণ্যে অধীনস্থ দস্যুগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একা অসাধ্য সাধন করিয়াছে,—শত শত প্রবল বাধাপ্রদানকারী শত্রুকে হেলায় একা পরাস্ত করিয়াছে, কৈ কখনও ত এরূপ অপমান, লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই! ক্রোধ, ঘৃণা ও লজ্জায় গুরুজীর হৃদয় আলোড়িত হইয়া কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। একবার ভাবিতেছে, যুবতীর মুণ্ড দুইহস্তে ছিন্ন করিয়া অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করি, আবার ভাবিতেছে, না না, চক্ষু দুইটা উৎপাটন করিয়া যে পদে আমার বক্ষঃস্থলে আঘাত

করিয়াছে, সেই পদ বন্ধন করিয়া বৃক্ষের উপর কয়েকদিন ঝুলাইয়া রাখি। গুরুজী কখন উঠিতেছে, কখন বসিতেছে, কখন ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া বালিকার দিকে অগ্রসর হইতেছে, আবার কখন দন্ত কড়মড় করিয়া অধীনস্থ দস্যুদের মুখের দিকে চাহিতেছে।

গুরুজী বেদিকা হইতে অবতরণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া শাণিত খড়্গ দক্ষিণ হস্তে উঠাইয়া লইল। আবার কি মনে করিয়া খড়্গখানি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া বেদিকার উপর উপবেশন করিল। এতক্ষণের পরে গুরুজীর মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল। সে বাক্য অতি ভীষণ, শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

গুরুজী চীৎকার করিয়া বলিল, "মায়ের পূজার শীঘ্র আয়োজন কর, চারিটা বলি একসঙ্গে দেওয়া হইবে।"

মুখ হইতে কথা নিঃসৃত হইতে না হইতে পূজার আয়োজন হইয়া গেল। গুরুজী ভীষণ কালান্তক মূর্ত্তিতে পূজার আসনে উপবেশন করিল। গুরুজী আজ স্বহস্তে বলি প্রদান করিবে।

যুবতী পাষণ্ড গুরুজীর কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া যখন কৃষ্ণমোহনের সম্মুখে অজ্ঞানাবস্থায় পতিত হইল, তখন কৃষ্ণমোহন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। গুরুজীর ভীষণ মুখাকৃতি, পূজার আয়োজন ও যুবতীর তদবস্থা

অবলোকন করিয়া কৃষ্ণমোহন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে রামানন্দ ও সুখানন্দ দুই জন দস্যু কর্ত্তৃক যূপকাষ্ঠের সম্মুখে আনীত হইল। সুখানন্দ ও রামানন্দ এখন চৈতন্য লাভ করিয়াছে, যূপকাষ্ঠের সম্মুখে আনীত হইবার পর তাহারা কৃষ্ণমোহনের দিকে বার বার কাতর-দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কৃষ্ণমোহনকে জীবিতাবস্থায় দেখিতে পাইয়া এই দুইটি বীর যুবকের মুখমণ্ডলে আনন্দরেখা প্রকাশিত হইয়া উঠিল।

তেজস্বী বীর,—নির্ভীক-হৃদয় কৃষ্ণমোহন হৃদয়কে সংহত করিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিয়া দেখিতে পাইলেন অভাবনীয় ভয়ঙ্কর বিপদজালে কেবল নিজে যে জড়িত হইয়াছেন তাহা নহে, সুখানন্দ ও রামানন্দের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার সময় সমাগত! এদিকে বালিকাটীও আমাদের ন্যায় বিপদ সমুদ্রে নিমগ্ন। জানি না, এই বালিকাটি কে? ইহারও বুঝি জীবনদীপ দস্যুর কলুষিত হস্তে নির্ব্বাপিত হইবে। যাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবল, যাহারা ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, যাহারা সর্ব্বনিয়ন্তার দয়ার উপর শোক, দুঃখ, বিপদ, সম্পদ সমর্পণ করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হইতে শিক্ষা

করিয়াছে, বিপদের সময় ভয় বা চিন্তা কি তাহাদের হৃদয় অভিভূত করিতে পারে?

কৃষ্ণমোহন, রামানন্দ ও সুখানন্দের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া আকাশের পানে চাহিলেন।

গুরুর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া সুখানন্দ ও রামানন্দ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বনিয়ন্তাকে স্মরণ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া গেলেন।

কৃষ্ণমোহন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বাহ্য-জ্ঞান হারাইয়াছেন। কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর জীবন-সংগ্রামের অবিশ্রান্ত যোদ্ধা বিভুর অপার করুণা স্মরণ করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহাকে কোটি কোটি নমস্কার করিতেছেন। কৃষ্ণমোহন ভাবিতেছেন, "প্রভো! এই ভীষণ বিপদের পশ্চাতে তোমার অপার করুণা দিব্যচক্ষে কৃষ্ণমোহন দেখিতে পাইতেছে। তোমার করুণাস্রোত কৃষ্ণমোহনকে যেদিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, কৃষ্ণমোহন সেই দিকেই যাইবে প্রভো!" কৃষ্ণমোহন বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া বিভুপ্রেমের অতল সমুদ্রে,—সর্ব্বনিয়ন্তার অপার করুণা-স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন।

যুবতী এতক্ষণের পর চৈতন্য লাভ করিয়া কৃষ্ণমোহনকে ধ্যানাবস্থায় দেখিতে পাইল। যুবতীর পিতাকে মনে পড়িল। "বিপদে পতিত হইলে ভগবানের উপর

সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাঁহার করুণা ভিক্ষা ব্যতীত মানবের উদ্ধারের উপায় নাই।” পিতার এই অমূল্য উপদেশ যুবতীর কর্ণকুহরে কে যেন বার বার প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। যুবতী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাতর প্রাণে বিশ্ব-নিয়ন্তাকে ডাকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে যুবতীর মুখমণ্ডলে আনন্দরেখা ফুটিয়া উঠিল, আনন্দাশ্রু গড়াইয়া সাত্বিকভাবে পূর্ণ সরল মুখখানি প্লাবিত করিতে লাগিল।

পাঠক! কৃষ্ণমোহন, রামানন্দ, সুখানন্দ ও যুবতীর মুখমণ্ডল দূর হইতে কল্পনা নেত্রে একবার নিরীক্ষণ কর। দস্যুহস্তে যাহাদের এই মুহূর্ত্তেই মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া ধূলায় লুটাইবে, তাহাদের মুখে অপার আনন্দমিশ্রিত হাসির রেখা কোথা হইতে ফুটিয়া উঠিল? পার যদি শিক্ষা কর, সংসার-সংগ্রামে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইলে,—সংসারে ত্রিতাপের জ্বালা জুড়াইতে হইলে, সংসাররূপ মরুভূমে হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেলে, ভীষণ জীবন-সংগ্রামে বার-বার পরাস্ত হইয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকিলে, কিরূপে হৃদয়কে আনন্দ-সমুদ্রে ডুবাইয়া মুখে হাসির রেখা ফুটাইতে হয়।

কে বলে ভগবানে আত্মনির্ভর করিলে তাপিতকে রক্ষার জন্য তাঁহার করুণাহস্ত অগ্রসর হয় না? যে বলে সে ঈশ্বর-বিশ্বাসী নহে। যে ভগবানে আত্মনির্ভর করিতে

পারিয়াছে,—যে আশা, ভরসা, বিপদ, সম্পদে, সুখ, দুঃখ, জীবন, মরণ, পুত্র, কলত্র তাঁহার চরণে লুটাইয়া দিতে পারিয়াছে, সেই জানে, তাঁহার অজস্র অবারিত করুণা কিরূপে মানুষকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিতেছে। যদি প্রকৃত সুখ চাও, যদি সংসার-দাবানলে অহরহঃ হৃদয়কে দগ্ধ করিয়া শুষ্ক পাপ ভস্মে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া মৃত্যুর তীরে সহায়সম্বলহীন নিঃস্ব অবস্থায় উপনীত হইতে না চাও, তবে ভগবানের অপার করুণা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিভুপদে আত্মনির্ভর করিতে শিক্ষা কর। কৃষ্ণমোহন, রামানন্দ, সুখানন্দ ও যুবতীর ব্যাকুল প্রার্থনা ও আত্মনির্ভরতা কোথায় যাইয়া কি ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহা তোমার আমার চর্ম্মচক্ষুতে দেখিবার সাধ্য কি? এখানে বৈজ্ঞানিকের শত বিজ্ঞান পরাস্ত হইয়াছে, চির দিনই পরাস্থ হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র মহাপুরুষগণ লোক-চক্ষুর অন্তরালে পরোপকারের জন্য বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারাই জানেন, এই শক্তি কিরূপে যাইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে কার্য্য করে! ইহাঁদের করুণ কাতর প্রার্থনা ভগবৎ-ভক্তের কর্ণে গিয়া ঝঙ্কার দিতেছে। তার-বিহীন টেলিগ্রাফের ন্যায় কাতর প্রার্থনার করুণ রব, ঐ দেখ হিমালয়ের গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ঐ দেখ, সাধক মহাপুরুষ যোগীর যোগ ভঙ্গ হইয়া গেল! ঐ দেখ

ভগবৎ-প্রেরণায় হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গ ভেদ করিয়া মহাপুরুষ দস্যুসকাশে দৌড়িয়া আসিতেছেন।

ত্রিতাপ তাপে তাপিত মানব! কৃষ্ণমোহনের ন্যায় যদি সংসারসংগ্রামে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া যুদ্ধ করিতে চাও, তবে ক্ষুদ্র মানবশক্তির আশা ত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হও। তাঁহারই করুণা-প্রদত্ত ক্ষুদ্র সীমাবিশিষ্ট মানব-শক্তিতে তুমি অহং জ্ঞানে ঘুরিয়া কেবল দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করিতেছ। সংসার-সংগ্রামে বিপদের সম্মুখীন হইলে কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া ভয়ে পশ্চাৎপদ হইও না! সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও, অর্থ, ধন, সম্পদ, পুত্র, কলত্র, মিত্র, মান অভিমান কর্ত্তব্যের নিকট তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ! সংসারে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে হৃদয়ে অপরিসীম বলের প্রয়োজন। এই বল কোথা হইতে লাভ হইবে? একমাত্র ভগবানের করুণা ব্যতীত দুর্ব্বল মানব-হৃদয়ে বল সঞ্চিত হয় না। অর্জ্জুনের ন্যায় বীরের হৃদয়েও যখন অনেক সময় দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হয়, তখন ক্ষুদ্র মানব-হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য দৃষ্টিগোচর হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অর্জ্জুনের ন্যায় অদ্বিতীয় সংযমী বীরকেও হৃদয়-দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য কাতর স্বরে ভগবানের চরণে আকুল প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। তুমি আমি ক্ষুদ্র মানবকে হৃদয়বলের জন্য

সর্ব্বক্ষণ ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি যাহাকে প্রাণের সহিত ভাল-বাস, যাহার অভাবে জীবনকে মৃতের ন্যায় জ্ঞান কর, যাহার সুখের জন্য যাহাকে দেখিবার বা লাভ করিবার জন্য সকলই বিলাইয়া দিতে পার, যাহার সহিত জগতে অন্য কিছুরই তুলনা করিতে চাও না, কর্ত্তব্যের অনুরোধে পিতা মাতা বা জ্যেষ্ঠের ইচ্ছায় তোমাকে সেই প্রিয়তম দ্রব্য যদি জন্মের মত ত্যাগ করিতে হয়, তবে তোমার কতখানি হৃদয়বলের প্রয়োজন, একবার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি? এই অপরিসীম হৃদয়-বল একমাত্র ভগবানের করুণা ব্যতীত মানব-শক্তিতে কখন লাভ করিতে পারিবে না।

প্রেতের দানবী পূজা শেষ হইয়া গেল। গুরুজী পূজা সমাপন করিয়া দুইজন দস্যুর উপর রামানন্দ ও সুখানন্দকে মায়ের কাছে বলি প্রদান করিতে আজ্ঞা প্রদান করিল। গুরুজী স্বহস্তে যুবতী ও কৃষ্ণমোহনকে মায়ের কাছে বলি প্রদান করিবে। একজন দস্যু সুখানন্দকে বলিপ্রদানের জন্য খড়্গ উত্তোলন করিয়াছে, আর মুহূর্ত্ত পরেই সুখানন্দের মস্তক দেহ হইতে বিছিন্ন হইয়া রুধিরধারা প্রবাহিত হইবে, এমন সময়ে কৃষ্ণ-মোহনের ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল। কৃষ্ণমোহন মুহূর্ত্ত মধ্যে

লম্ফ প্রদান করিয়া দস্যু হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া হইলেন। গুরুজী ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। একবারে চারিজন দস্যু কৃষ্ণমোহনকে জাপটাইয়া ধরিল, দুই তিন জন কৃষ্ণমোহনের হস্ত হইতে খড়্গখানা কাড়িয়া লইবার জন্য যথাসাধ্য বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। "ভগবান তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক," কৃষ্ণমোহন হুঙ্কার রবে এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া একে একে চারিজন দস্যুকে সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। দস্যু চতুষ্টয় অন্ধকারে অরণ্যের দূরপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে গুরুজী ভীষণ-দর্শন সেই ত্রিশূল বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিয়া কৃষ্ণমোহনের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করতঃ অগ্রসর হইল। দেখিতে দেখিতে চারিদিক হইতে ভীষণাকার দস্যু দলে দলে আসিয়া কৃষ্ণমোহনকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল; দস্যুগণের ভীষণ চীৎকারে রামানন্দ, সুধানন্দ ও যুবতীর ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল। রামানন্দ ও সুধানন্দ দেখিল, দুই জন দস্যু খড়্গ উত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে কাটিতে আসিতেছে। বালিকা চক্ষুরুন্মীলন করিবামাত্র দেখিতে পাইল, ভীষণাকার পাষণ্ড গুরুজী যমকিঙ্করের ন্যায় ত্রিশূল হস্তে কৃষ্ণমোহনের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। যুবতী দেখিল, কৃষ্ণমোহন অন্যান্য দস্যুগণের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য প্রশান্ত

মূর্ত্তিতে আজানুলম্বিত বাহু কখন ঊর্দ্ধে, কখন পশ্চাতে ও বামে, কখন নিম্নে ও দক্ষিণে সঞ্চালন করিতেছেন, তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি কখন ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে, কখন নিম্নে, কখন দক্ষিণে ও বামে। মুখে মৃদু মৃদু হাস্য, ললাটেও হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভয়, উদ্বেগ, আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা বা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার চিহ্নমাত্রও কৃষ্ণমোহনের মুখমণ্ডলে প্রকাশিত নাই। কৃষ্ণমোহনের অলক্ষিতে বজ্র মুষ্টিতে ত্রিশূল ধারণ করতঃ বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া যম-কিঙ্কর সদৃশ ভীষণমূর্ত্তি গুরুজীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া যুবতীর হৃদয় দুড় দুড় করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল। যুবতী একবার শিহরিয়া উঠিয়া আকাশের দিকে চাহিল। উপযুক্ত উপদেষ্টা ও গুরুর উপযুক্ত শিষ্যা—যোগ ও ধর্ম্ম-বলসম্পন্ন উপযুক্ত পিতার উপযুক্তা কন্যা, সৎসাহসসম্পন্ন যোগীর উপযুক্ত তনয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া রণরঙ্গিণীর ন্যায় গুরুজীর বক্ষঃস্থলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কৃষ্ণমোহনকে অলক্ষিতে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিল। হায়! হায়! পর মুহূর্ত্তেই পাপিষ্ঠ গুরুজী একটা বিকট চিৎকার করিয়া যুবতীর বক্ষঃস্থলে বজ্রমুষ্টিতে সেই ত্রিশূল বিদ্ধ করিয়া দিল। যুবতী অস্ফুট চীৎকার করিয়া রক্তাক্ত কলেবরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, বালিকার সুকোমল বক্ষঃ-স্থল-নিঃসৃত পবিত্র শোণিত-ধারায় ভূমি কর্দ্দমিত হইয়া

উঠিল। বালিকা রক্ত-বমন করিতে করিতে বুঝি চির-নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন করিল।

কৃষ্ণমোহন যে মুহূর্ত্তে দেখিতে পাইলেন, পাষণ্ড তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া ত্রিশূল হস্তে অগ্রসর হইতেছে, তাহার পর মুহূর্ত্তেই দেখিলেন, একটি দেবীরূপিনী দেব-কন্যা তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য নিজ জীবন দস্যুহস্তে বিসর্জ্জন করিলেন। হায়! হায়! কে এই যুবতী পরের জীবনরক্ষার জন্য নিজ অস্ফুটন্ত পবিত্র জীবন-কুসুম মৃত্যুর পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিল? কৃষ্ণমোহন উদ্বেলিত হৃদয়ে ভক্তিগম্ভীর স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কে তুমি মা, কর্ত্তব্য পালনের জন্য সদর্পে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলে? রক্তাক্ত কলেবরে বালিকাকে ছটফট্ করিতে দেখিয়া কৃষ্ণমোহন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বালিকার মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষা কৃষ্ণমোহনের হৃদয়যন্ত্রণা অধিক হইল। কৃষ্ণমোহন শতাধিক দস্যুর আক্রমণে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভীম বেগে দৌড়িয়া আসিলেন। যমদূত সদৃশ শতাধিক দস্যু কৃষ্ণমোহনের ভীম গতির বাধা প্রদান করিতে সক্ষম হইল না। কৃষ্ণমোহনকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আবার পিশাচ সর্দ্দার বজ্রমুষ্টিতে তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া ত্রিশূল উত্তোলিত করিল। এবার দস্যু সর্দ্দার গুরুজীর বৃহৎ চক্ষু দুটি ক্রোধে ধক্ ধক্ করিয়া

জ্বলিতেছে, দন্তের ভীষণ ঘর্ষণে কড়্ মড়্ শব্দ হইতে লাগিল। গুরুজীর বজ্রমুষ্টির অব্যর্থ সন্ধান এবার বুঝি কাহারও রোধ করিবার সাধ্য নাই। কৃষ্ণমোহন গুরুজীর হস্তস্থিত ত্রিশূলের লক্ষ্য প্রতিহত করিবার জন্য একদৃষ্টে চাহিয়া অকুতোসাহসে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, পশ্চাতের দিক হইতে কতিপয় দস্যুর শানিত ছুরির আঘাত কৃষ্ণমোহনের পৃষ্ঠদেশে পতিত হইল। কৃষ্ণমোহন একবার পশ্চাতের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, গুরুজী কৃষ্ণমোহনের প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে আমূল ত্রিশূল-ফলক বিদ্ধ করিবার জন্য বজ্রমুষ্টিতে উহা ধারণ করিয়াছে। আর বিলম্ব নাই, এইবার চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে কৃষ্ণমোহনের প্রশস্ত বক্ষঃস্থল দ্বিখণ্ডিত হইয়া উষ্ণ রুধির-ধারায় দস্যুর আবাসভূমি কর্দ্দম রঞ্জিত হইয়া উঠিবে। আর মুহূর্ত্ত মাত্রও সুযোগ বা সময় নাই যে, কৃষ্ণমোহন এই ভীষণ আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারে। দস্যুদলপতি গুরুজীর আনন্দ-কোলাহলের সঙ্গে অধীনস্থ দস্যুগণের আনন্দধ্বনি মিশ্রিত হইয়া ভীষণ দানব-রবে অরণ্যভূমি প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। "মরিল মরিল" "গুরুজীর অব্যর্থ ত্রিশূলে আমূল বিদ্ধ হইল" "মা নৃমুণ্ডমালিনী শত্রুবক্ষের তপ্ত রক্ত পান করিবেন" ইত্যাদি রবে ভীষণ স্থান আরও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। আর বুঝি নিস্তার নাই—কৃষ্ণমোহনও বুঝিলেন

আর নিস্তার নাই। চক্ষের পলক পড়িবার পূর্ব্বেই ত্রিশূলের শাণিত ফলক বক্ষঃস্থলে আমূল বিদ্ধ হইয়া জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া দিবে। কৃষ্ণমোহন হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" হায় হায়! ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর কৃষ্ণমোহন, ত্যাগী সংসারাসক্তি-হীন,—সংযমী, জ্ঞানী কৃষ্ণমোহন, কর্ত্তব্যে অবিচলিতমনা জীবন-সংগ্রামের অশ্রান্ত যোদ্ধা কৃষ্ণমোহন—অশেষ শাস্ত্র-জ্ঞানী, বেদ-পাতঞ্জল, সাংখ্য উপনিষৎ প্রভৃতি দেবশাস্ত্র-বিশারদ কৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচর্য্য ও "দেবতার আশ্রমের" প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণমোহন দুইটি জীবনের উদ্ধার সাধন করিতে আসিয়া বুঝি দস্যুহস্তে শাণিত ত্রিশূলের আঘাতে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করতঃ জীবনের সৎকর্ম্মের ফলরাশি সঙ্গে লইয়া স্বর্গদ্বারে উপনীত হইবেন। ঐ বুঝি স্বর্গের দুন্দুভি-ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। ঐ বুঝি তপস্বী যোগী ঋষির অমর আত্মা সাদরে কৃষ্ণমোহনকে লইতে আসিতেছেন। চারি-দিকে কিসের শব্দ? স্বর্গের দুন্দুভি-বাদ্য আমাদের ন্যায় ত্রিতাপ-তাপিত মানবের বর্ণে প্রবেশ করিবে কিরূপে? তবে বনভূমি প্রকম্পিত করিয়া কিসের শব্দ উত্থিত হই-তেছে? শান্তি! শান্তি! শান্তি! চারিদিকে শান্তিপূর্ণ! অন্ধকার শর্ব্বরী যেন শান্তিধারা বুকে করিয়া কানন মাঝে ভাসিয়া চলিতেছে। তরুলতা যেন বহুদিনের পর শান্তি বায়ু

স্বন স্বন রবে ব্যজন করিতে করিতে হেলিতেছে—দুলিতেছে। বিহগকুলের ক্ষুদ্র প্রাণে শান্তিধারা বুঝি উথলিয়া পড়িতেছে, তাই তাহারা মনের আনন্দে শান্তি গানে বনভূমি স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিয়াছে। বনভূমির চারিদিকে শান্তি রব। চারিদিক হইতে ওঁকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। প্রভুর অপার করুণা সঙ্গীত পবিত্র কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়া বনভূমে ছুটিয়া আসিতেছে। আবার এ কি! পবিত্র গম্ভীর নিনাদে "হর হর বোম্ বোম্ ধ্বনি!" "মা গো তোর করুণা অনলে, অনিলে সাগরে বনে" "বিভু, এত করুণা তোমার" প্রভৃতি রব কোথা হইতে আসিতেছে? দেখিতে দেখিতে অরণ্যের তিন দিক হইতে তিন জন বলিষ্ঠাকার সন্ন্যাসী আসিয়া একজন দস্যু সর্দ্দার গুরুজীর হস্ত উত্তোলিত ত্রিশূল সবলে কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। দ্বিতীয় সন্ন্যাসীপ্রবর "মা মা রবে" বনভূমি কম্পিত করিয়া যুবতীকে বক্ষঃস্থলে তুলিয়া লইলেন। তৃতীয় মহাত্মা কৃষ্ণমোহন ও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের রামানন্দ ও সুখানন্দকে তাঁহার পশ্চাতে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যোগনিরত মহাবলসম্পন্ন তৃতীয় সন্ন্যাসীপ্রবর কয়েক মুহূর্ত্তে বনভূমির কয়েক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া বনভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কি মনে করিয়া

সন্ন্যাসীপ্রবর একবার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কৃষ্ণমোহনকে অরণ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলিলেন। কৃষ্ণমোহন পশ্চাৎ ফিরিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, খাণ্ডব বন দাহনের ন্যায় অসীম ভীষণ অরণ্য ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। অরণ্যের নানা জাতীয় পশু ইতস্তত: ছুটিয়া পলাইতেছে, বিহগকুল প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ধূমরাশির মধ্য দিয়া দ্রুত পক্ষ সঞ্চালনে উড়িয়া পলাইতেছে;—দস্যুর আড্ডা অনল বক্ষে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তিল মাত্রও দস্যুগণের আবাস-চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে না। সন্ন্যাসী একবার ঊর্দ্ধে আকাশ পানে চাহিয়া বলিলেন, "ভগবান নির্দ্দোষী পশু পক্ষীর কাতর ক্রন্দনে দৃষ্টিপাত করুন।" বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডলে কি এক দিব্য জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল! কৃষ্ণমোহন দেখিলেন, প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সমস্ত জ্যোতিঃ এককালে যেন সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডলে প্রভাসিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণমোহন চাহিয়া দেখিলেন, অরণ্যের অনলরাশি সেই সঙ্গে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। ছোট ছোট হরিণশিশু ও অরণ্যের পশু পক্ষী আবার পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডলে যে অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল, শত শত শশী সূর্য্যও বুঝি সন্ন্যাসীর এই পবিত্র জ্যোতিঃর নিকট পরাস্ত হয়! কৃষ্ণমোহন অধিকক্ষণ সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিতে

পারিলেন না। "সন্ন্যাসীপ্রবর! অধম কৃষ্ণমোহনের শক্তি অতি ক্ষুদ্র" এই বলিয়া সন্ন্যাসীর পদতলে বসিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী স্নেহভরে কৃষ্ণমোহনের হস্ত ধারণ করিয়া উঠিলেন। কৃষ্ণমোহন ভক্তি ব্যাকুল কণ্ঠে সন্ন্যাসীকে আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণমোহন! আমরা কয়েক মুহূর্ত্তে অনেক দূর পথ অতিক্রম করিয়াছি! এখানে অধিক সময় নষ্ট করিবার আমাদের অধিকার নাই। মানব জীবন অতি অল্প কাল স্থায়ী, কিন্তু মানব-জীবনে কর্ত্তব্য কার্য্য অসংখ্য! আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে ক্রোশাধিক পথ অতিক্রম করিব, তোমরা আর পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিও না। অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেই আমার গতির সহিত তোমাদের গতি বিচ্ছিন্ন হইয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। প্রভাতের পূর্ব্বেই গুরুদেবের সন্নিধানে পৌঁছিয়া তাঁহার চরণ দর্শন করিব। এস, আমার দিকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া শিষ্য-দ্বয় সহ অগ্রসর হও,—হৃদয় মন সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ করিয়া আমার পশ্চাতে অগ্রসর হও।"

ওহো! ঝড়, বায়ু, উল্কা, বুঝি সন্ন্যাসীপ্রবরের গতির সম্মুখে পদে পদে পরাস্ত হইয়া যাইতেছে। কৃষ্ণমোহন ও কৃষ্ণমোহনের শিষ্যদ্বয় মনে করিতেছেন, কে যেন তাঁহা-দিগকে শূন্যে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, অথবা সন্ন্যাসীর

প্রবল অপার্থিব আকর্ষণশক্তিতে বায়ুর সহিত তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। কৃষ্ণমোহন মনে মনে ভাবিতেছেন, হায়! যোগবলের কি অসীম শক্তি! ভগবান মানব-দেহে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিয়া সেই শক্তির স্ফূরণ করিলে সকলেই এই অপার্থিব শক্তি লাভ করিতে পারে। হায় সন্ন্যাসী-প্রবর! তুমিই ধন্য। তুমিই যোগবলে ভগবানের করুণা লাভ করিয়া যে শক্তি লাভ করিয়াছ, জগতের একত্রিত মানবের ক্ষুদ্র শক্তি ইহার নিকট পরাস্ত। তোমার এই অপার্থিব শক্তি কোথা হইতে লাভ হইল, এ তত্ত্বের মীমাংসা অন্ধের চন্দ্র দর্শনের ন্যায় মোহমদিরাপানোন্মত্ত সংসারিক মানব-বুদ্ধির অগম্য। মলিনতাময় মানবের সূক্ষ্ম বুদ্ধি এই শক্তির ভিতর কখন প্রবেশ করিতে পারিবে না। যদি হিন্দুজাতি কখন প্রকৃত শক্তি, সুখ লাভ করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভগবানের করুণা ভিক্ষায় হৃদয় মন গঠিত করুক।

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক ফর্সা হইয়া আসিল। সন্ন্যাসীপ্রবর অভিলষিত স্থানে উপনীত হইয়াছেন, আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই গুরুদেবের দর্শন লাভ হইবে। সন্ন্যাসী মনের আনন্দে ডাকিলেন, "কৃষ্ণমোহন।" কৃষ্ণমোহন চাহিয়া দেখিলেন, দ্বারকেশ্বর তীরে অরণ্যে একটি প্রকাণ্ড

শুভ্র দেবমন্দির শোভা পাইতেছে। মন্দিরের চূড়া গগন ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত। কৃষ্ণমোহন পুলকিত হৃদয়ে মনোরম্য স্থানটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

মহাপ্রাণ সন্ন্যাসী কৃষ্ণমোহনের পৃষ্টদেশে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "আমরা বিংশতি দিবসের পথ কয়েক দণ্ডে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। ঐ দেখ মা মুণ্ডেশ্বরির মন্দির। ঐ স্থানে আমার গুরুদেব ও আমার গুরুদেবের প্রিয় শিষ্য দয়ানন্দ অবস্থান করিতেছেন।" কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ইঁহারা মন্দির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

কৃষ্ণমোহন যখন মুণ্ডেশ্বরির মন্দির সম্মুখে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কৃষ্ণমোহন দেখিলেন, গুরুদেব ও দয়ানন্দ কতকগুলি শ্বেত পত্র হস্তে ঘর্ষণ করণান্তর মুহুর্মুহু: পত্রের রস যুবতীর বক্ষঃস্থলের ক্ষত স্থানে প্রদান করিতেছেন। ভীষণ ত্রিশূলফলকে বালিকার বক্ষঃস্থল একটি প্রশস্ত গহ্বরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে এবং অজস্রধারে তপ্ত শোণিত নির্গত হইয়া স্থান কর্দ্দমিত হইয়া উঠিতেছে। কৃষ্ণমোহন ভক্তি গদ্গদচিত্তে নির্নিমেষ নয়নে সন্ন্যাসীত্রয়কে অবলোকন করিয়া বার বার নমস্কার করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীত্রয়ের কি সৌম্য মূর্ত্তি! আহা! কি স্বর্ণকান্তি দেহ! কোটী চন্দ্রের আভা মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত। মহাপুরুষগণের

এরূপ অনুপম মুখের জ্যোতি কৃষ্ণমোহন আর কখন দেখেন নাই। হৃদয়ের ভক্তিধারা উথলিয়া উঠিয়া কৃষ্ণ-মোহনের নয়নপ্রান্ত দিয়া অজস্র ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া কৃষ্ণমোহনের হৃদয় ব্যাকুল হইতে লাগিল, কিন্তু পাছে তাঁহাদের কার্য্যে ব্যাঘাত হয়, এইজন্য অসম্বরণীয় ব্যাকুলতাকে বার বার হৃদয়ে সংযত করিতে চেষ্টা করিলেন। ত্রিকালবেত্তা সর্ব্বজ্ঞ গুরুদেব কৃষ্ণমোহনের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণমোহন! ব্যাকুল হইও না। তুমি সংসারী হইলেও অতি সন্তর্পণে সুপথ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হইতেছ। তোমার ন্যায় আসক্তিহীন বীরপুরুষ সংসারে দুর্লভ। সময়ে আমার সাক্ষাৎ পাইবে। অনেক কর্ত্তব্য কার্য্য তোমার সম্মুখে। তুমি যে দুষ্কর কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলে, তাহা তোমার সিদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে কাল বিলম্ব না করিয়া দেবতার আশ্রমে প্রত্যাগমন কর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

"মাগো ব্রহ্মময়ি! আমার দৃষ্টি যেন সর্ব্বক্ষণ ঊর্দ্ধগামী হয়। স্বার্থময় ঘোরঘটাচ্ছন্ন আঁধার সংসারে যেন পথ হারাইয়া না ফেলি। স্বামীপদে মতি রাখিয়া বিভুনির্দ্দিষ্ট পথে স্বামীর পশ্চাতে যেন অগ্রসর হইতে পারি। ভগবান! দুর্ব্বলহৃদয়া নারী তোমার শরণাপন্না, দেখ প্রভু! তোমার করুণাগুণে যেন সর্ব্বক্ষণ কর্ত্তব্য পথে চালিত হইতে পারি।"

একটি অপরূপ রূপ-যৌবনসম্পন্না রমণী দিবা দ্বিপ্রহর সময়ে স্নান আহ্নিক সমাপনান্তে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে বিভুপদে সরল প্রার্থনা জানাইতেছেন। যুবতীর কপোলদেশের বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নয়নপ্রবাহিত ভক্তি-অশ্রুতে মিশিয়া হৃদয়োপরি ঝরিয়া পড়িতেছে। যুবতীর মুখমণ্ডলের পবিত্র জ্যোতিতে দেবগৃহ আলোকিত। আহা! সার্থক জন্ম তাঁর—যিনি এই পবিত্র-হৃদয়া সাত্ত্বিক ভাবাপন্না, ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি, করুণাময়ী 'সীতা-সাবিত্রী

সদৃশা নারী-রত্নের পাণিপীড়ন করিয়াছেন! আমাদের ভারতভূমেই এইরূপ রমণীর উদ্ভব সম্ভবে। ধর্ম্মের দেশ ভারতভূমি ব্যতীত এরূপ নারীর উদ্ভব একবারেই অসম্ভব। যে দেশে,—যাঁর গৃহে এহেন নারীরত্ন বিরাজ করেন, সে দেশ যে জগতের সকল দেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে গৃহ যে শান্তিপূর্ণ স্বর্গধামের সহিত তুলনা করিতে পারা যায়,—শান্তি, পুণ্য, ধর্ম্ম, সত্য,ক্ষমা সে গৃহে যে সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

যুবতী নয়নাশ্রুপ্লাবিত হৃদয়ে ভক্তিপূর্ণচিত্তে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া বিভুচরণে প্রার্থনা করিতেছেন। যুবতীর একাগ্রভক্তি, চিত্তের কাতর প্রার্থনা মঙ্গলময়ের রাজ্যে কোথায় কি ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য।

"ঐ দে! ঐ দে! মা, আমি নম কলি! মা, আমিও নম নম কলি।"

একটি যুবতীর ক্রোড় হইতে অনিন্দ্যসুন্দর শিশু তাড়াতাড়ি নামিয়া কচি কচি দুটি হাত যোড় করিয়া আকাশ পানে চাহিয়া প্রণাম করিতে লাগিল।

দেবতার প্রিয়পাত্র অজ্ঞান সরল শিশুর অমিয়মাখা আধ আধ কণ্ঠস্বরে যুবতীর ধ্যানভঙ্গ হইয়া গেল। যুবতী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে তাহার আদরের মনু

কচি হাত দুটি আকাশের দিকে উত্তোলন করিয়া প্রণাম করিতেছে। শিশুর চক্ষু দুটি মুদ্রিত। শিশুর ক্ষুদ্রপ্রাণ বুঝি ভক্তির পবিত্রছায়া স্পর্শ করিতেছে।

যুবতী শিশুর সরলতাপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আনন্দে মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। শিশু তখনও চক্ষু মুদিয়া প্রণাম করিতেছে। যুবতী আর থাকিতে পারিলেন না, সুগোল হস্ত দুটি শিশুর চিবুকে অর্পণ করিয়া বার বার শিশুর মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। শিশু আহ্লাদে যুবতীর ক্রোড়ে উঠিয়া বক্ষঃস্থলে মুখ লুকাইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সরল শিশু যুবতীর প্রাণ, মন ও পবিত্র বক্ষঃস্থল একেবারে অধিকার করিয়া বসিল। যুবতী আনন্দবিগলিত হৃদয়ে সুকোমল হস্তে শিশুর কচিহাত দুইটি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা মনু! তুমি বড় হ'লে নিত্য ভগবানকে এইরূপে প্রণাম করবে?" বালক উৎসাহভরে তাড়াতাড়ি উত্তর করিল,—"কল্‌বো।"

যুবতী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা মনুধন! তুমি চির জীবন ধর্ম্মপথে চল্‌বে?"

বালক ধীর গম্ভীর স্বরে বলিল, "তলবো।"

যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনু! তুমি সংসারের কর্ত্তব্য কার্য্য পালন কর্‌তে পার্‌বে?"

বালক দৃঢ়তাব্যঞ্জক অমিয়সিক্ত সরলদৃষ্টি যুবতীর

পবিত্র মুখে ন্যস্ত করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"কেন পাল্‌বো না ?"

অনিন্দ্যসুন্দর বালকের মাতা এতক্ষণ পরে অগ্রসর হইয়া বলিল, "না পার্‌লেও তোমার গুণে পারবে।'

যুবতী তাড়াতাড়ি বালকের মাতার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "এস ভাই! আমরা শান্তিকুঞ্জে মনুধনকে লইয়া একটু খেলা করি। বালকের সরলতা পূর্ণ মুখের কথাগুলি শুনিলে প্রাণ পবিত্র ও শান্তিরসে আপ্লুত হয়। সংসারের নর-নারী সকলেই আমার মনুর মত যদি সরল মধুর প্রকৃতি লাভ করিত, তবে সংসার কি সুখের হইত ?"

দুই সখিতে দেব-গৃহের পশ্চাতে শান্তিকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। আহা, কি প্রাণারাম স্থান! একবার শান্তি-কুঞ্জে প্রবেশ করিলে আর বাহিরে আসিবার ইচ্ছা হয় না। স্থানটি নির্জ্জন ঋষির আশ্রম বলিলেও বলা যায়। বেল, যুঁই, যুথি, রজনীগন্ধ প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষে শান্তিকুঞ্জের চারিদিক প্রাচীরের ন্যায় বেষ্টিত। প্রাণারাম সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। ভ্রমর-ভ্রমরী পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মনের আনন্দে উড়িয়া বসিয়া বুঝি বিভু-নাম গান করিতেছে। চারিদিকে চারিটী বিল্ববৃক্ষ মস্তক উন্নত করিয়া শান্তিকুঞ্জের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। কপোত কপোতী, ময়ূর ময়ূরী ও মৃগ-শিশুগুলি মনের

আনন্দে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে ' মল্লিকা ও কনকচম্পক বৃক্ষে নানাবর্ণের পাখিগুলি বসিয় স্বর, তান, লয় সংযোগে বিষ্ণুনাম গান করিতেছে।

শান্তিকুঞ্জের মধ্যস্থলে একটি তুলসীমঞ্চ। মঞ্চের চারিদিকে আরও কতকগুলি তুলসীবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। তুলসীমঞ্চের পশ্চাতে মনোরম্য নির্জ্জন স্থানে একখানি পর্ণকুটীর। যুবতীর স্বামী নিত্য এই কুটীরে বসিয়া সহধর্ম্মিণী সহ ভগবদ-চিন্তায় রত থাকেন। এই শান্তিপূর্ণ স্থানে একবার আসিলেই আধ্যাত্মিকভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়।

পাঠক, ইহাদিগকে কি চিনিতে পারেন? প্রথমা যুবতী আমাদের সেই সরলা বালিকা তুলসী, দ্বিতীয়া রমণী ধর্ম্মপ্রাণ শঙ্করের প্রাণসম অকপট বন্ধু রামানন্দের স্ত্রী সিন্ধু। সুকুমার শিশুরত্নটি সিন্ধুর হৃদয়ের ধন মনু।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে 'বর্ণিত ঘটনার পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই কয়েক বৎসরে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে অন্যগুলি ত্যাগ করিয়া স্থূল ঘটনাগুলির উল্লেখ করিব।

দ্বারকেশ্বর নদীতে মগ্ন হইবার পর তুলসী দয়ানন্দের আশ্রমে ও শঙ্কর মিকির রাজ্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন, পাঠকবর্গ ইহা অবগত আছেন। অরণ্যের

দস্যুসর্দ্দার গুরুজীর অধীনস্থ দস্যু ও অনুচরগণ একদিন লুণ্ঠনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সহ অরণ্যের মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে অলৌকিক রূপযৌবন-সম্পন্না তুলসীকে দেখিতে পায়। তুলসীকে গুরুজীর হস্তে প্রদান করিতে পারিলে পুরস্কৃত হইবে ভাবিয়া নির্ম্মমহৃদয় দস্যুগণ তুলসীকে অপহরণ করিয়া গুরুজীর করে অর্পণ করে। দয়ানন্দ কন্যাকে দেখিতে না পাইয়া ধ্যানস্থ হইয়া গুরুদেবকে স্মরণ করেন। এদিকে কৃষ্ণমোহন সুখানন্দ ও রামানন্দ দস্যু আবাসে আবদ্ধ হইয়া ব্যাকুলকণ্ঠে ভগবানকে ডাকিতে আরম্ভ করেন। কোথায় কি ভাবে কার্য্য হইল, মানববুদ্ধির অগম্য। দেখিতে দেখিতে ভগবৎ প্রেরিত হইয়া দয়ানন্দের গুরুদেব শিষ্য সহ কিরূপে সকলের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। কৃষ্ণমোহনের পরার্থপরতা, নিঃস্বার্থতা, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য জ্ঞানে সন্তুষ্ট হইয়া দয়ানন্দের গুরুদেব তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ করিলেন। অল্পায়াসেই তুলসীকে আরোগ্য করিয়া গুরুদেব দয়ানন্দ কৃষ্ণমোহন ও শিষ্যসহ শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইলেন। তুলসী ও শঙ্করের মনোভাব অবগত হইয়া গুরুদেব কৃষ্ণমোহনকে অনুজ্ঞা করিলেন, "যাও বৎস! তুলসী, শঙ্কর, রামানন্দ ও সুখানন্দকে লইয়া আশ্রমে ফিরিয়া যাও। তুমি আমাদের

ন্যায় অরণ্যের সন্ন্যাসী নও—তুমি রাজর্ষি। তুলসী ও শঙ্করকে পরিণয় বন্ধনে বন্ধন করিবার তুমিই উপযুক্ত গুরু। তুলসী শঙ্করেরই উপযুক্তা। আমার প্রিয় শিষ্য দয়ানন্দের উপদেশ তুলসীর পবিত্র হৃদয়ে জন্ম জন্মান্তরে কার্য্য করিবে। সত্বর ইহাদের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করিও। শুভ বিবাহ সময়ে আমার ইচ্ছাক্রমে দয়ানন্দ উপস্থিত থাকিবে।”

যথাসময়ে কৃষ্ণমোহন তুলসী ও শঙ্করকে সমভিব্যাহারে লইয়া সুখানন্দ ও রামানন্দের সহিত আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। যেদিন ইঁহারা আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন, সেদিন “দেবতার আশ্রম” আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। দীন, দুঃখী, আতুর, অন্ধ ও খঞ্জগণের গৃহ হইতে মুহুর্মুহু আনন্দসূচক চীৎকার ধ্বনি উথিত হইতে লাগিল। দুর্গাপ্রসন্ন, রামতনু ও শরৎকুমারীর মনোভাব ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে। রামতনু কৃষ্ণমোহনের পদ তলে লুণ্ঠিত হইয়া আনন্দাশ্রুতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। কৃষ্ণমোহন আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাওয়াবধি রামতনুর হৃদয়ে তিলমাত্রও শান্তি ছিল না। লোক-চক্ষুর অন্তরালে রামতনু সর্ব্বদাই বালকের ন্যায় আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ক্রন্দন করিয়া বেড়াইত। শরৎকুমারী দেখিতেন রামতনু দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে! কৃষ্ণ-

মোহন যেদিন হইতে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, সেই দিন হইতে রামতনু যেন নব জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে।– রামতনু এক একবার আশ্রমের চতুর্দ্দিকে বিনা কারণে দৌড়িয়া আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। একদিন রামতনুকে এইরূপ অবস্থায় চীৎকার করিতে দেখিয়া শরৎকুমারী হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণমোহনকে বলিলেন, 'দেখুন দাদা! আপনার প্রত্যাগমনে রামতনু দাদা মনের আনন্দ হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

কৃষ্ণমোহন রামতনুকে ডাকিয়া স্নেহভরে ক্রোড়ের কাছে টানিয়া আনিলেন,—রামতনু কৃষ্ণমোহনের পা দুখানির দিকে চাহিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। যাহাদের হৃদয় আছে, তাহারা এই রামতনুর নয়নাশ্রু দেখিয়া রামতনুর হৃদয়ের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

শরৎকুমারী ও দুর্গাপ্রসন্ন রামতনুর ন্যায় মুহুর্মুহুঃ আনন্দে চীৎকার না করিলেও তাঁহাদের আনন্দের সীমা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে! কৃষ্ণমোহনের প্রত্যাগমনে শরৎকুমারী দেশ-বিদেশের শত সহস্র দীন-দুঃখীকে নিত্য দেবতার আশ্রমে ভোজন করাইতে লাগিলেন। মাসাধিক কাল "দীয়তাং ভোজ্যতাং" রবে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

কৃষ্ণমোহনের প্রত্যাগমনের দুই মাস পরেই শুভদিনে

শুভমুহূর্ত্তে তুলসী ও শঙ্করের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য শরৎকুমারী আয়োজন করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারীর আজ আনন্দের সীমা নাই। সহস্র সহস্র আতুর খঞ্জ ও অন্ধগণ মাসাধিক কাল শরৎকুমারীর আদর আপ্যায়নে পান ভোজন করিয়া ভগবানের নিকট ন দম্পতির মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছে। বিবাহ-রজনীতে কৃষ্ণমোহন সন্ধ্যা হইতে দয়ানন্দের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রজনী চারিদণ্ড হইতে পাঁচ দণ্ড, পাঁচ দণ্ড হইতে ছয় দণ্ড অতীত হইয়া গেল, দয়ানন্দ এখনও পরিণয়-ক্ষেত্রে শুভাগমন করিলেন না। উদ্বাহ-কার্য্যের শুভ মুহূর্ত্ত সমাগত হইবার আর বিলম্ব নাই, কৃষ্ণমোহনের মুখমণ্ডল অধিকতর ম্লান হইয়া পড়িল। কৃষ্ণমোহন ব্যাকুলচিত্তে চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতেছেন, কৈ, সেই আজানুলম্বিত বাহু, সৌম্য ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দয়ানন্দ কৈ? তবে কি সেই ত্রিকালজ্ঞ মহাতপা সন্ন্যাসী পূর্ব্বের কথা বিস্মৃত হইলেন! সেই মহাযোগী গুরুদেব ও দয়ানন্দের বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। তাঁহারা নিশ্চয়ই দিব্যচক্ষে তুলসী ও শঙ্করের শুভ উদ্বাহক্রিয়া দৃষ্টিগোচর করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে শুভ মুহূর্ত্ত সমাগত হইল। কৃষ্ণমোহনের হৃদয় অধিকতর চঞ্চল ও ম্রিয়মান হইয়া পড়িল।

কৃষ্ণমোহন অত্যধিক ব্যাকুলচিত্তে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় অদূরে মধুর সঙ্গীতের রব তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। অমিয়-মাখা মধুর সঙ্গীত-লহরী কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র কৃষ্ণমোহনের হৃদয় তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। কৃষ্ণমোহন আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভক্তি-অশ্রু প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া নব-দম্পতিকেও ভক্তিরাজ্যে ভাসাইয়া লইয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিণয়স্থলে সৌম্যমূর্ত্তি দয়ানন্দের আবির্ভাব হইল।

বলিতে প্যার পাঠক! কিরূপে কোথা হইতে শঙ্কর তুলসীর শুভ পরিণয় স্থলে মুহূর্ত্তে দয়ানন্দ আবির্ভূত হইলেন? যাঁহাদের হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাব প্রবল, যাঁহারা যোগবলের অসাধারণ শক্তিতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, দয়ানন্দ কি শক্তি-বলে এই স্থলে মুহূর্ত্ত মধ্যে উপনীত হইলেন। যাহাদের হৃদয় মোহতমসাচ্ছন্ন, তাহারা এই ব্যাপারের মীমাংসা করিতে সক্ষম হইবে না।

দয়ানন্দ পরিণয় স্থলে পদার্পণ করিয়াই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সকলেই ভক্তিবিনম্রচিত্তে দয়ানন্দের চরণে মস্তক অবনত করিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত এইরূপেই অতিবাহিত হইয়া গেল।

আবার দয়ানন্দের হো হো হাস্য রবে দিগন্ত প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। হাস্য অবসানে দয়ানন্দ কয়েক

মুহূর্ত্ত আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এইবার দয়ানন্দ করুণ-ভক্তি-মিশ্রিত 'মা মা' রবে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিলেন,—

"কৃষ্ণমোহন! শুভ সময় সমাগত। তুলসীকে শঙ্করের করে অর্পণ করিবার ইহাই উপযুক্ত মুহূর্ত্ত।

তুলসী শঙ্করের করে অর্পিত হইলে দয়ানন্দ কৃষ্ণ-মোহনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার এই স্থলে আর অধিকক্ষণ অবস্থান করিবার গুরুর আদেশ নাই। মুণ্ডেশ্বরি মাতার সেবা-কার্য্য আমার শেষ হইয়াছে। এক্ষণে গুরুর আদেশক্রমে হিমালয়ের নিভৃত গুহায় তাঁহার চরণ সমীপে উপনীত হইব।"

দয়ানন্দ তুলসী ও শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অদ্য তোমরা দায়ীত্বপূর্ণ ভার স্কন্ধে লইয়া সংসারে প্রবেশ করিতেছ। স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধ অতি গুরুতর। সংসারী মানব যাহারা সহধর্ম্মিণীকে বিলাসের সামগ্রী মনে করে তাহারা দাম্পত্য-সুখের প্রকৃত আস্বাদ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। সহধর্ম্মিণী ভোগ-সুখের জন্য সৃজিত হয় নাই, স্ত্রী কেবল বিলাস-বাসনা চরিতার্থের জন্য নহে। সংসারে ধর্ম্মকার্য্য সাধনের জন্যই স্ত্রীর আবশ্যক, জীবন-সংগ্রামে সহায়তা করিবার জন্যই সহধর্ম্মিণীর প্রয়োজন। তুলসী যেন তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যে সহায় হইয়া সহধর্ম্মিণী নামের

যোগ্যা হইতে পারে। তোমার সবল দৃঢ় হস্ত যখন সংসারে রোগ তাপ ক্লিষ্ট নরনারীর সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবে, তৎপূর্ব্বে যেন সহধর্ম্মিণীর কোমল হস্ত তাপিত নরনারীর মস্তক স্পর্শ করে। নিঃসহায় আত্মায় প্রতিবাসীর বিপদ শ্রবণে যখন তুমি ব্যাকুল অন্তরে দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইবে, তৎপূর্ব্বে অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীকে যেন বিপদাপন্ন প্রতিবাসীর গৃহে দেখিতে পাও। অনশনক্লিষ্ট তাপিত জনের "হা অন্ন" "হা অন্ন" রব নিবৃত্তির জন্য অগ্রসর হইয়া যেন দেখিতে পাও, তোমার অগ্রেই তোমার সহধর্ম্মিণী নিজ অন্ন ক্ষুধাতুরের মুখে তুলিয়া দিতেছে। তোমরা আজ প্রকৃত সংগ্রাম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছ। দেখিও, যেন ভীরু কাপুরুষের ন্যায়,—ভীতা দুর্ব্বলহৃদয়া নারীর ন্যায় জীবন সংগ্রামে অভিভূত হইয়া না পড়। উৎসাহভরে জীবন সংগ্রামের পথে ধাবিত হইও। স্বার্থপরতা ও লোভ-মোহাদি শত্রুগণকে সংসার হইতে দূর করিয়া দাও। আত্মার উন্নতি ও সিদ্ধি লাভের জন্য জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেই দম্পতি-যুগল দেখিতে পাইবে, শত সহস্র প্রতিকূল ঘটনা তোমাদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে;—ভীষণ ঘৃণিত স্বার্থপরতা নানা মূর্ত্তিতে সৈনিক বেশ ধারণ করিয়া তোমাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছে। কপটাচারী মিত্র, নানা প্রকৃতির বন্ধু-বান্ধব,

আত্মীয় প্রতিবাসী তোমাদের জীবন-সংগ্রামের উদ্যম ও সাহসকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ধূলিসাৎ করিয়া দিবার জন্য দণ্ডায়মান হইবে ; তাহাদের ভ্রুকুটি মূর্ত্তিতে কখন ভীত বা সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইও না। সংসারে সহস্র বিঘ্ন ও প্রতিকুল ঘটনায় কখন ভগ্নোদ্যম হইও না। জীবনের কর্ত্তব্য-কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়া কখন সঙ্কল্পচ্যুত হইও না। গৃহাশ্রম মানব-জীবনের সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য পালনের সুরক্ষিত ক্ষেত্র। গৃহাশ্রম সাধনার স্থল, মুক্তিপথের সোপান। উন্নতির পথে উঠিতে হইলে এই স্থল হইতে একটির পর একটি করিয়া সোপান অতিক্রম করিতে হয়। দুটি প্রাণ লইয়া তোমরা যে সংসারে প্রবেশ করিতেছ, সেই সংসারে যেন সর্ব্বক্ষণ পবিত্রতার বায়ু প্রবাহিত হয়, যেন সত্য, ক্ষমা ও ন্যায়ের ভিত্তির উপর তোমাদের সংসার প্রতিষ্ঠিত থাকে। তোমরা যে ব্রহ্মচর্য্য, আত্মসংযম, আত্মশাসন ও কঠোর বিধি-নিষেধের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছ, সেগুলি যেন জীবনে বিস্মৃত না হও। স্নেহ, যত্ন, সেবা, পরোপকার, দয়া, শ্রদ্ধা, প্রেম, বিনয়, ভক্তি, নিঃস্বার্থতা প্রভৃতি সৌরভময় কুসুম যেন তোমাদের সংসারে প্রস্ফুটিত থাকে। মা তুলসী! ভারতের ভাবী বংশধরগণের জননীর আসন অধিকার করিতে যাইতেছ ; দেখিও, যেন কপটতা বা মিথ্যার ছায়া তোমার পবিত্র সংসারে স্পর্শ না করে। সংসারে যাহা

কিছু করিবে ভগবানের আজ্ঞা এবং কর্ত্তব্য বোধেই অনুষ্ঠান করিবে; কখনও আমি এই কার্য্য করিলাম এই ভাব আর যেন মনে উদিত না হয়; কার্য্যের ফলাফলের দিকে দৃক্‌পাত করিবে না।"

"কৃষ্ণমোহন! আমার যাইবার সময় আগত, গুরুদেব আহ্বান করিতেছেন। আমি চলিলাম, তোমরা কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হও।"

সকলে কাতরচিত্তে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, দয়ানন্দকে কেহই আর দেখিতে পাইলেন না!
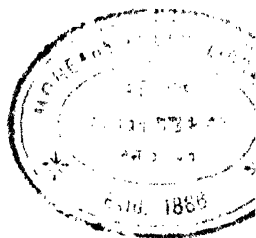
উপসংহার।

আমরা "জীবন-সংগ্রামে" যে সময়ের ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার পর একশত বৎসর অনন্ত কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। যাহা যায়, তাহা আর আসে না, যেমনটি যায়, তেমনটি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিলেও আর পাওয়া যায় না। এই একশত বৎসরের মধ্যে যাহা যাহা হারাইয়াছে, তাহা বুঝি যুগ-যুগান্তর অনুসন্ধান করিলেও মিলিবে না। জগতে স্থায়ী কিছুই নহে, সকলই দুই দিনের জন্য কোথা হইতে কালস্রোতে ভাসিয়া আসিয়া আবার জল-বুদ্বুদের ন্যায় কালস্রোতেই বিলীন হইয়া যায়। জীবন-সংগ্রামে যাহারা জয়লাভ করিতেছে, সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় তাহারা কালস্রোতে ভাসিয়া গেলেও তাহাদের পবিত্র নাম ধরাপৃষ্ঠে চিরদিনের জন্য উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকে। কৃষ্ণমোহন, দুর্গাপ্রসন্ন, রামতনু, শরৎকুমারী সর্ব্বনিয়ন্তার অজানিত বিধানে কোথায়, কোন্ রাজ্যে বাস করিতেছেন, জানি না;—সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া অথবা পুনর্জ্জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক কোথায় কি ভাবে তাঁহারা জগতের মঙ্গল কার্য্য সাধন করিতেছেন, তাহাও

অবগত নহি। কিন্তু তাঁহাদের নাম উজ্জ্বল, স্বর্ণাক্ষরে জীবন-সংগ্রামের প্রতি পৃষ্ঠায় লিখিত রহিয়াছে। তাঁহাদের স্থূল দেহ ত্যাগের বিবরণ যথাক্রমে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া "জীবন-সংগ্রামের" উপসংহার করিব।

একদিন শরৎকুমারী "দেবতার আশ্রমে" নিভৃত ভজনালয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত স্বরে কে যেন তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। শরৎ-কুমারী চাহিয়া দেখিলেন, এক ছায়ামূর্ত্তি! শরৎকুমারী চির আরাধ্য ছায়ামূর্ত্তিকে চিনিতে পারিলেও বিস্ময় হর্ষে নিজেকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সত্যকে স্বপ্ন ভাবিয়া শরৎকুমারী ছায়ামূর্ত্তির দিকে প্রেমভক্তি-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ছায়ামূর্ত্তি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিল ;—

"শরৎ, চল, তোমায় লইতে আসিয়াছি। বহুদিন সূক্ষ্ম দেহে তোমার জন্যই জগতে পরিভ্রমণ করিতেছি। জীবনান্তে এই দেহে আমি পরম সুখে আছি কিন্তু শরৎ, তুমি আমার জন্য বড়ই যাতনা পাইয়াছ, আজ তোমার পার্থিব যাতনার অবসান হইবে। চাহিয়া দেখ, সূক্ষ্ম-দেহী মহাপুরুষগণ তোমায় লইতে আসিয়াছেন।"

"স্বামিন্! দেবতা! এতদিন তবে এখানে ফেলিয়া রাখিয়াছেন কেন?" বলিয়া শরৎকুমারী ছায়ামূর্ত্তির চরণ-

তলে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূৰ্চ্ছা আর ভঙ্গ হইল না। এই মূৰ্চ্ছাই অন্তিম মূৰ্চ্ছায় পরিণত হইল।

নিরক্ষর, সরলপ্রাণ, ধার্ম্মিক, প্রভুভক্ত রামতনুর মৃত্যু-কাহিনী লিখিতে প্রকৃতই হৃদয় অবসন্ন হয়।

অন্ধকার দ্বিপ্রহর রজনী। সকলেই সুষুপ্তির ক্রোড়ে শায়িত। কাহারও সাড়া-শব্দ নাই। এই সুখময় নিস্তব্ধতার সময়ে অনাথ আশ্রমে ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে অগ্নিদেব লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া শতসহস্র জীবকে গ্রাস করিতে লাগিল।

রামতনুর আজ হৃদয় উদ্বিগ্ন অস্থির। সকলেই সুষুপ্তির ক্রোড়ে শায়িত, আজ রামতনুর চক্ষে নিদ্রা নাই। রামতনু এই নিস্তব্ধ রজনীতে "পানার পাড়ের" * শ্মশান-ভুমির চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, শরৎকুমারীর শোকে রামতনুর অস্থি-পঞ্জর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। নিত্যই রামতনু এই শ্মশানক্ষেত্রে শরৎকুমারীর স্মৃতি বুকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। রামতনু শ্মশানের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে

* "পানার পাড়" সারাবাটী মায়াপুর প্রভৃতি গ্রামের প্রসিদ্ধ শ্মশানক্ষেত্র। লেখকের এই "পানার পাড়" আনন্দ এবং দুঃখের স্থান। জননী, ভগ্নি, জায়া পুত্রের পবিত্র স্মৃতি এই "পানার পাড়ের" নামে হৃদয়ে উদিত হয়।

অকস্মাৎ শরৎকুমারীর সূক্ষ্ম দেহ দেখিতে পাইল। একি! শরৎ-কুমারীর সূক্ষ্ম দেহের পশ্চাতে আরও দুই জনের ছায়া মূর্ত্তি!

রামতনু শরৎকুমারীর সূক্ষ্ম দেহ অবলোকন করিয়া আনন্দে "শরৎ, তুই কোথায় আছিস্" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নিমিষে ছায়া মূর্ত্তি অগ্রসর হইয়া বলিল,—

"রামতনু দাদা! শীঘ্র চল, অনাথ আশ্রমের অনাথ বালক-বালিকাগণ দগ্ধ হইয়া গেল! ঐ দেখ, অনলশিখা আকাশ স্পর্শ করিয়াছে! আমি দাদাকে সংবাদ দিই, তুমি শীঘ্র অগ্রসর হও।"

রামতনু চাহিয়া দেখিল, দেবতার আশ্রম হইতে অনল-শিখা আকাশমার্গে উত্থিত হইতেছে। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, শরৎকুমারীর ছায়া মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। রামতনু দেবতার আশ্রম লক্ষ্য করিয়া পবন-বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

রামতনু যখন অনাথ আশ্রমের প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে লম্ফ দিয়া পড়িল, তখন অধিকাংশ গৃহই ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। অনাথ বালক-বালিকাগণ অর্দ্ধ দগ্ধ অবস্থায় কাতরস্বরে চীৎকার করিতেছে। শত শত অনাথ বালক বালিকা অনল-শিখায় জীবন আহুতি প্রদান করিয়াছে। করুণহৃদয় রামতনু, ধার্ম্মিক রামতনু, কৃষ্ণমোহনের উপযুক্ত ভৃত্য রামতনু, দীন-সেবক রামতনু, নিরক্ষর সরলচিত্ত

রামতনু, ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর রামতনু ভীষণ অনল শিখার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই শতাধিক অনাথ শিশু ও বালিকার জীবন রক্ষা করিল। রামতনুর দেহ অর্দ্ধেক দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, কেশ ও লোম-রাজির চিহ্ন মাত্রও নাই, তত্রাচ রামতনুর বিরাম নাই। আবার ভীষণ প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করিয়া দুইটি অর্দ্ধ-দগ্ধ বালককে বাহিরে আনিল। ঐ দেখ, ধর্ম্মপ্রাণ রামতনু নিজ জীবন তুচ্ছ করিয়া আবার অনলে ঝম্প প্রদান করিল। হায়! হায়! আর রামতনু বাহির হইতে পারিল না। রামতনুর পবিত্র জীবন শত শত জীবের জীবন রক্ষা করিয়া অনলে প্রবেশ করিল। রামতনু প্রজ্বলিত অনল মধ্যে ঢলিয়া পড়িল! চতুর্দ্দিক হইতে পুণ্যাত্মাগণের সূক্ষ্ম মূর্ত্তি আসিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। ঐ দেখ, শরৎকুমারী স্বামী সঙ্গে হাসিতে হাসিতে রামতনুকে ক্রোড়ে লইয়া উর্দ্ধে—বহু উর্দ্ধে উঠিয়া অসীম অনন্তে মিশিয়া গেল!

শান্ত, কর্ম্মী, প্রশান্তচিত্ত, সুখ দুঃখে সমভাবাপন্ন, জ্ঞানী, সংসারযোগী, অশেষ শাস্ত্র-পারদর্শী, ধার্ম্মিক কৃষ্ণ-মোহনকে শরৎকুমারী ও রামতনু পরিত্যাগ করিয়া যাই-বার পর হইতে কৃষ্ণমোহন শোকের পরিবর্ত্তে গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। যে শোকে অন্যের হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া

যাইত, সেই দুঃসহ শোক কৃষ্ণমোহন বুক পাতিয়া লইলেন। এই সময় হইতে সংসারের অনিত্যতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণমোহন সর্ব্বক্ষণ ধ্যানযোগে রত থাকিতেন। এই সময় কৃষ্ণমোহনের বয়স একশত আট বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। মাঘী পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন কৃষ্ণমোহন ধ্যানস্থ হইলেন। সেদিন আর তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না। পরদিন ধ্যান ভঙ্গে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"আমার হৃদয়ে আজ আনন্দ ধরিতেছে না। এই পবিত্র মহান্ আনন্দ আমার হৃদয় হইতে যেন চতুর্দ্দিকে উছলিয়া পড়িতেছে। এ আনন্দ বলিবার, বুঝাইবার বা দেখাইবার নহে, নচেৎ তোমাদিগকে এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতাম না। আমার বোধ হয়, আমার শেষ সময় সমাগত। আমি আজ যে দৃশ্য দেখিয়াছি, যে আনন্দ হৃদয়ে উপভোগ করিতেছি, ইহা জীবনে আর কখন ঘটিবে না! ঐ দেখ, অদূরে আমার জনক-জননীর ছায়া মূর্ত্তি স্নেহধারা ও আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিতেছেন। রামতনু ও শরৎকুমারীর সূক্ষ্ম দেহ আমার সম্মুখেই অবস্থিত। আমার পরিচিত মহাপুরুষগণ ছায়া মূর্ত্তিতে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছেন। ভগবৎ-প্রীতি আমার হৃদয়কে যেন উচ্চ হইতে উচ্চ স্থানে লইয়া যাইতেছে।"

কৃষ্ণমোহন মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—

ডাকিলেন, "রামময়!" আকুল কণ্ঠে "বাবা" "বাবা" রবে প্রিয় পুত্র রামময় গিয়া পিতৃদেবের মস্তক নিজ বক্ষঃ-স্থলে স্থাপন করিলেন। কৃষ্ণমোহন বলিলেন "একটী ব্রহ্ম সঙ্গীত গাও,—অন্তিম সময়ে পুত্রের কাজ কর।"

তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রতিপালিত হইল। নাম গানে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। এই শুভ মুহূর্ত্তে কোথা হইতে দয়ানন্দ ও দয়ানন্দের গুরুদেব জাহ্নবী বারিপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে বিভু নাম গান করিতে করিতে কৃষ্ণমোহনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণমোহন একদৃষ্টে দয়ানন্দ ও গুরুদেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হৃদয়ের ভক্তি অশ্রু উথলিয়া উঠিয়া অবিরাম ধারায় নয়নপ্রান্ত দিয়া গড়াইয়া পড়িল। কৃষ্ণমোহন উচ্চৈঃস্বরে ওঁকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া কৃষ্ণমোহনের জীবনবায়ু নির্গত হইয়া গেল। দয়া-নন্দের গুরুদেব কমণ্ডলুর পবিত্রবারি কৃষ্ণমোহনের মস্তকে দিয়া ওঁকার ধ্বনি করিতে করিতে অদৃশ্য হইলেন।

দুর্গাপ্রসন্ন একবার মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া জ্ঞান শূন্য অবস্থায় ভূমে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। দয়ানন্দ দুর্গা-প্রসন্নকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।

পবিত্র চিতার অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

দয়ানন্দ চিতাগ্নির চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে "মা মা" রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। চিতার অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। দয়ানন্দের সহিত দুর্গাপ্রসন্ন কোথায় যে চলিয়া গেলেন, বহু অনুসন্ধানেও তাঁহাদের কেহ সন্ধান পাইল না।

সম্পূর্ণ।